সুন্নাহ্‌র সান্নিধ্যে

ইউসুফ আল-কারযাভী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সুন্নাহ্‌র সান্নিধ্যে

ইউসুফ আল-কারযাভী

ইংরেজি অনুবাদ

জামিল কুরেশী

বাংলা অনুবাদ

প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সুন্নাহ্র সান্নিধ্যে

মূল : ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ : প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

ISBN : 978-984-8471-35-7

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০

ফোন : ০২-৮৯১৭৫০, ০২-৮৯২৪২৫৬

E-mail : *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*

Website : *www.iiitbd.org*

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি : ২০১৫

পৌষ : ১৪২১

রবিউল আওয়াল : ১৪৩৬

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র US $ 10

Sunnah-r-Shanniddah (Approaching The Sunnah : Comprehension & Controversy) originally written by Yusuf Al-Qaradawi. Translated by Professor Hasanuzzman. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, **Website** : *www.iiitbd.org*, Price : BDT 200, U.S $. 10

প্রকাশকের কথা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর ইউসুফ আল-কারযাভী রচিত মূল আরবি গ্রন্থ 'কাইফা নাতা'আমাল মা'আ আল-সুন্নাহ' এর ইংরেজি সংস্করণ 'Approaching the Sunnah' এর বঙ্গানুবাদ **'সুন্নাহ্‌র সান্নিধ্যে'** বইটি বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকদের জন্য প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

সুন্নাহ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা দ্বিতীয় ওহি বা ওহিয়ে গাইর মাতলু। মুসলিম ফিক্‌হ শাস্ত্রে কোনো আইনগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নাহ দ্বিতীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান যুগ পরিচালনায় মুসলমানদের সামনে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধানে সুন্নাহর জ্ঞান অপরিহার্য। কারযাভী তাঁর এ বইতে আধুনিক প্রেক্ষাপটে সুন্নাহর উপস্থাপন ও প্রয়োগ এবং উদ্ভূত বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর সুন্দর সমাধান অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই মুসলিম গবেষক, দ্বীনের প্রচারক, আইনবিদ ও চিন্তাবিদদের কাছে এ বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রসঙ্গত, লেখকের রচিত মূল আরবি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন জামিল কুরেশী 'Approaching the Sunnah : Comprehension & Controversy' শিরোনামে। এরপর এর ইংরেজি সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান। তাঁকে কষ্টসাধ্য এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য জানাই বিশেষ ধন্যবাদ।

এছাড়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে পাঠকের কাছে তুলে দিতে পেরে বিআইআইটি সত্যিই আনন্দিত। গ্রন্থটি পাঠকমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হলেই কেবল আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রয়াস কবুল করুন! আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সূচি

প্রসঙ্গ কথা

ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আইআইআইটি) অতীব আনন্দের সাথে সুন্নাহ্‌র ওপরে লিখিত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকখানি উপহার দিচ্ছে। মূলত, ১৯৯০ সালে এটি 'কাইফা নাতা'আমাল মা'আ আল-সুন্নাহ্' নামে আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ইউসুফ আল কারাযাভী আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।

এ গ্রন্থে তিনি একজন শিক্ষক হিসেবে সুন্নাহ্ উপস্থাপন, এর ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিপূর্ণ প্রকৃতি, এর ভারসাম্য ও আধুনিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদানে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমান যুগের মুসলিমদের জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন ইস্যুতে শরিয়াহর ঐতিহ্যপূর্ণ জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি অখণ্ডনীয় ও সাহসিকতাপূর্ণ। হাদিসের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাকে নিয়ে সৃষ্ট মতপার্থক্য নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, সন্দেহযুক্ত, প্রায়শ ভুল তথ্যসম্পন্ন, যুক্তিসমূহ যা এসবের মধ্যে অন্তর্নিহিত (দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাপক বিস্তৃত) রয়েছে। তিনি দুর্বল (যয়িফ) হাদিসসমূহের সমস্যা পরীক্ষা করেছেন, আইনগত বাধ্যবাধকতার সাথে এগুলো স্পষ্ট করেছেন এবং নৈতিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এসবের প্রাসঙ্গিকতা ও কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ্‌র ব্যবহারকে সহজ করার যুক্তি দেখিয়েছেন; কারণ, যেমনটা তিনি নির্দেশ করেছেন, সুন্নাহ্ হচ্ছে কুরআনের আনুকূল্য লাভের বাহন, যা আশা জাগানিয়া, কষ্টদায়ক নয়। তিনি বলেন, মুসলিমদের অবশ্যই তাদের অবহেলা ও পশ্চাদপদতা দূর করতে হবে সুন্নাহ্‌কে বুঝবার ক্ষেত্রে; এর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও স্বয়ম্ভর হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে; এবং তা তাদের যথার্থ ও জ্ঞানময়তা, আদব, আন্তরিকতা ও আধুনিকতা দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইআইটি ইসলামি দর্শন, মূল্যবোধ ও নীতির ওপর ভিত্তি করে পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা-সহায়ক একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। গবেষণা, সেমিনার ও কনফারেন্স প্রভৃতি কর্মসূচি গত ২৫ বছর ধরে চলে আসছে, যার ফলে ৩০০-এরও অধিক বইপুস্তক ইংরেজি, আরবি এবং অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

একটি নিবিড় ও সযত্ন অনুবাদকর্মে তাঁর প্রতিশ্রুতির জন্য জামিল কুরেশিকে ধন্যবাদ জানাই এবং আরো ধন্যবাদ জানাই আইআইআইটি'র লন্ডন অফিসে কর্মরত টিমকে তাকে প্রদত্ত সহযোগিতার জন্য। অন্য যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই বইটির গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় জড়িত ছিলেন, বিশেষত শিরাজ খান এবং মরিয়ম মাহমুদসহ তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ গ্রন্থকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাদের অবদানের পুরস্কার দান করুন!

এপ্রিল, ২০০৬

আনাস এস. আল-শেখ-আলী
একাডেমিক উপদেষ্টা
আইআইআইটি লন্ডন অফিস, ইউকে

ইংরেজি অনুবাদকের বক্তব্য

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ অনুবাদ কর্মটি হাতেই নেওয়া যেত না, বা নিলেও এর সামান্যই সম্পন্ন হতো, যদি না সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামিক স্টাডিজ অক্সফোর্ড কেন্দ্রে কর্মরত রিসার্চ ফেলো মোহাম্মদ আকরাম নদভী'র তত্ত্বাবধান মিলত। তার উৎসাহ প্রদান এবং অনেক ভুল থেকে আমাকে উদ্ধার করতে তার সহায়তার জন্য আমি সানন্দচিত্তে তার প্রতি আমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এরপরও যেসব প্রমাদ ও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে তার দায়ভার আমারই, তার নয়।

উদ্ধৃতিযুক্ত বিষয়ের অনুবাদ

প্রয়োজনের তাগিদেই ইউসুফ আল কারাযাভীর গ্রন্থখানিতে হাদিস এবং অতীত ও বর্তমানের পণ্ডিত বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত বক্তব্য ও এতদ্‌সংক্রান্ত আলোচনা সন্নিবেশিত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সুন্নাহ্‌র সমসাময়িক প্রয়োগের লক্ষ্যে এ উদ্ধৃতিগুলো নির্দেশনা হিসেবে উপস্থাপিত। এ বিষয়ে উপস্থাপনায় পাঠযোগ্যতার চেয়ে সঠিকতাই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আক্ষরিক অনুবাদ, আরবি শব্দ, শব্দক্রম ও কাঠামোর সীমাবদ্ধতায়, ইংরেজিতে এটা ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অবোধগম্য। সেমতে, উদ্ধৃত বিষয়ের বোধগম্যতার জন্য হুবহু উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। এর অর্থ হলো : যেখানে প্রয়োজন হয়েছে, সর্বনামের স্থলে উপযুক্ত বিশেষ্য আনা হয়েছে; সংযুক্তিগুলোকে বিরতিচিহ্ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে; যৌক্তিক অর্থ অনুযায়ী প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে তা পেশ করা হয়েছে (যেমনটা আমি বুঝেছি সেভাবে), তাই একই সংযুক্তি বিভিন্ন প্যারায় বিভিন্নভাবে অনূদিত হয়ে থাকতে পারে; ক্রিয়াগুলোকে কাল/ভাব অনুযায়ী রাখা হয়েছে যাতে প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিকতম ভাব প্রকাশিত হয়; কিছু ক্ষেত্রে নির্ভরশীল বাক্যাংশগুলোকে বিভক্ত করা হয়েছে ছোট ছোট বাক্যের এককে, যেখানে এমনটা উপযোগী ছিল।

বোধগম্যতার সাথে এত আপোষের পর 'যথার্থতা'র কী অবশিষ্ট থাকে? যা থাকে তা প্রমাণিত হবে তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার দ্বারা যেখানে প্রকৃত বাক্যের বিভক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে বা একটি সর্বনামকে শব্দান্তরে প্রকাশ করা হয়েছে।

জামিল কুরেশী

অক্সফোর্ড, সেপ্টেম্বর, ২০০৫

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের মুখবন্ধ

প্রশংসা ও শুকরিয়া মহান আল্লাহ তায়ালার। তাঁরই অনুগ্রহে পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাঁরই দয়ায় উত্তম ও কল্যাণময় বস্তু আমাদের কাছে পৌছে এবং তাঁরই দেওয়া সামর্থ্যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। যিনি সমস্ত প্রাণিকূলের জন্য আল্লাহ তায়ালার 'রহমত ও সান্ত্বনা', বিশ্বাসীদের জন্য যিনি সদা দয়ার্দ্রচিত্ত এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি যাঁর গভীর যুক্তিবোধ, আমাদের সেই পরিচালক, নেতা ও আদর্শ, আমাদের অতিপ্রিয় ও শিক্ষাদাতা মুহাম্মদ সা.-এর ওপর আল্লাহর আশিস সালাত ও শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সাহাবিগণ, আহলে বায়িত এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা তাঁর পথের পথিক ও তাঁর সুন্নাহ্ দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত, তাদের জন্য রহমত ও শান্তি।

সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় ওহি বা ওহিয়ে গাইর মাতলু। নবি সা. কর্তৃক কুরআনের প্রকাশ। মুসলিমদের জন্য এটা আইনগত সিদ্ধান্তের এবং নৈতিক নির্দেশনার দ্বিতীয় উৎস। তাই মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ উপলব্ধি, প্রত্যয় ও দৃঢ় সংলগ্নতার সাথে সুন্নাহ্কে ধারণ করা, তাদের কাজের মধ্যে, তাদের আচরণের মধ্যে এবং দ্বীনের দাওয়াত ও শিক্ষা দানের মধ্যে। এ বাস্তবতার আলোকে এটা বিশেষভাবে এমন হয়েছে যে, যুগব্যাপী পশ্চাৎপদতার কারণে নবি সা.-এর সুন্নাহ্র প্রতি মুসলিমদের শ্রদ্ধার অবনতি ঘটেছে, ঠিক যেমন তাদের সার্বভৌম প্রভু প্রতিপালকের কুরআন সম্পর্কেও অবনতি হয়েছে। মুসলিম পণ্ডিত, প্রচারক ও চিন্তাবিদ এবং যারা দ্বীনের নবায়ন ও উম্মাতের সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তা করেন এবং তাদের অন্তরে আলো জ্বালাতে এবং হৃদয়ের জাগরণ ও ক্ষমতার সক্রিয়তা চান তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য এ ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্বের সাথে দণ্ডায়মান হওয়া।

এ গ্রন্থটি (এটি ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে লিখেছিলাম) এই ক্ষেত্রে আমার অবদান। এগার বছরেরও বেশি সময় ধরে মিসর ও বৈরুতে-এর এক ডজন বা তার বেশি সংস্করণ দেখা গেছে। এই সময়ের পরে এর পরিমার্জন, উন্নয়ন ও পূর্ণত্ব সাধনে আমার দৃষ্টি দেওয়া উচিত - অন্যান্য দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতির সীমাবদ্ধতায় আমার পক্ষে যদিও এটা সহজ নয়। যাহোক, সৌভাগ্যক্রমে এ বইয়ের জন্য, আমি বিরামহীনভাবেই কাজ করতে পেরেছি, এর সব অংশ যুক্ত করতে পেরেছি এবং অন্যভাবে মূলপাঠ ও টীকা লিখতে, পরিশ্রুত ও পরিমার্জিত করতে পেরেছি যতক্ষণ না বইটি এর প্রকৃত আকারের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি পৌছে। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার দেওয়া সামর্থ্য ও অনুগ্রহ। আমি আশা করি যে, আমার দ্বীনী ভাইয়েরা যারা অন্যান্য ভাষায় বইটি অনুবাদ করেছেন, তারা এ সংস্করণের ওপর নির্ভর করে পূর্বের অনুবাদ সংশোধন করে সেগুলোকে পূর্ণ করতে পারবেন যাতে এ সংস্করণে তারা মূল আরবি থেকে বিচ্যুত না হন।

আমি মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করি ও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। কারণ তিনি আমাকে অনেকগুলো বইয়ের মাধ্যমে সুন্নাহ্র খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : সুন্নাহ্, জ্ঞান (মা'রিফাত) এবং সভ্যতার উৎস; সুন্নাহ্ অধ্যয়নের ভূমিকা, নবি ও জ্ঞান (ইলম); আল-মুনজিরির তারগিব ওয়া আল-তারহিব এর নির্বাচিত অংশ, কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী ইসলামে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব... এবং অন্যান্য বই যা পরোক্ষভাবে সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যেমন- সকল সময় ও স্থানের জন্য ইসলামের শরিয়াহ সঠিক; ইসলামী শরিয়াহ্ অধ্যয়নের ভূমিকা; আধুনিক মুসলিমের জন্য সহজীকৃত ফিকহ্-এর প্রথম অংশ...।

এটা আমার জন্য স্বস্তিদায়ক যে, দার আল-শুরূক এই বিস্তারিত ও সংশোধিত সংস্করণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা, এ বই যেন এর লেখকের জন্য কল্যাণবাহী হয়, এর পাঠক, প্রকাশক এবং অন্য সকলের জন্য যারা এর কল্যাণ গ্রহণে আগ্রহী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সাড়াদানকারী।

সর্বপ্রথমে ও সর্বশেষে সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া মহান আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইউসুফ আল কারাযাভী

কায়রো, জুমাদা ১, ১৪২১ হিজরি

আগস্ট ২০০০

কুরআন থেকে

> নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যধিক অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজনকে রসুল করে প্রেরণ করেছেন, তিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪)।
>
> হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে মেনে চলো এবং মেনে চলো রসুলকে এবং তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীলগণকে। যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হয় তাহলে তা সোপর্দ করো আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে, যদি তোমরা সত্যিকারভাবেই আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাসী হয়ে থাকো (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)।
>
> এবং রসুল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন [তা থেকে] দূরে থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)।

আল্লাহর রসুল সা.-এর বাণী থেকে

আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অস্বীকারকারী ব্যতীত। [লোকদের পক্ষ থেকে] বলা হলো : কে সেই ব্যক্তি যে অস্বীকার করে, হে আল্লাহর রসুল? তিনি বললেন : যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার আনুগত্য করে না - সে [সেই ব্যক্তি যে জান্নাত] অস্বীকার করেছে (আল-বুখারি এটি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন)।

আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ তোমরা দুটি অনুসরণ করবে ততক্ষণ ধ্বংস হবে না : আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ্ (আল-হাকিম এটি আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণনা করেছেন)।

আমি তোমাদেরকে উজ্জ্বল পথের ওপর রেখে যাচ্ছি : [এই পথ এত পরিষ্কার যে] এর রাত্রি এর দিনের মতোই। তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ্ এবং আমার সত্যাশ্রয়ী, সঠিক পথপ্রাপ্ত আমার অনুসরণকারী সাহাবিগণকে অনুসরণ করবে : [এটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে]* (আহমাদ ইবন হাম্বল এবং বিভিন্ন মুসনাদের সংকলকগণ এটি আল-ইরবাদ [ইবনে সারিয়্যা] থেকে)।

---

* আক্ষরিকভাবে : "তোমাদের দাঁতের মাড়ি দিয়ে কামড়ে ধরবে।"

প্রথম অধ্যায়

ইসলামে সুন্নাহ্র মর্যাদা

১. সুন্নাহ্র সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

আল কুরআন সর্বোচ্চ নিদর্শন এবং রসুল সা.-এর সুমহান মোজেযা,[১] সুরক্ষিত কালজয়ী গ্রন্থ, যার মধ্যে কোনো দিক থেকে কোনো মিথ্যা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব এটাকে ইসলামের অন্যান্য উৎসের অনুমোদনকারী প্রাথমিক সুনির্ধারিত উৎসে পরিণত করেছে এবং এর পরবর্তী দ্বিতীয় প্রমাণাদি (হাদিস) এটাকে সর্বপ্রকার বিতর্কের উর্ধ্বে রেখেছে। নবি সা.-এর সুন্নাহ্ কুরআনের পাশাপাশি উৎস হিসেবে এসেছে কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবি সা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> আমরা আপনার প্রতি এই জিকর (কুরআন) নাজিল করেছি যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় (সুরা নাহল, ১৬ : ৪৪)।

নবি সা.-এর কথা, কাজ এবং সম্মতি (তাকরির)[২] সুন্নাহ্ নামে কুরআনের বাস্তব ভাষ্য, বাস্তবে কার্যকরকরণ এবং সেই সাথে ইসলামের আদর্শ হিসেবে প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে, সুন্নাহ্ হচ্ছে উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যাকৃত কুরআন এবং ইসলামের মূর্তরূপ। আয়শা[৩] রা. তাঁর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি এবং নবি সা.-এর পরিবারে বসবাসের কারণে এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং একটি অনুপম বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একে (সুন্নাহ্কে) উপস্থাপন করেছেন। যখন তাঁকে তাঁর রসুল সা.-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, কুরআনই ছিল তাঁর সা. চরিত্র[৪]।

যে ব্যক্তি ইসলামের প্রায়োগিক পদ্ধতি জানতে চায়, এর বিভিন্ন উপাদান ও মূল স্তম্ভ অবগত হতে চায় তার কর্তব্য হবে, রসুল সা.-এর সুন্নাহ্র মধ্যে যা বিন্যস্ত ও পরিব্যাপ্ত তা জানা। সুন্নাহ্ শব্দটির অর্থ হলো পথ বা পদ্ধতি। এটি রসুল সা.-এর জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে যা তাঁর দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত হয়েছে, যা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষ্যে এবং সম্প্রদায়কে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে[৫]।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবির কাছে কিতাব ও সুগভীর জ্ঞান উভয়টিই নাজিল করেছেন এবং তিনি (আল্লাহ তায়ালা) একথা জানিয়েছেন যে, ঐ সুগভীর জ্ঞান উম্মাতের জীবন গঠনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সুবিস্তৃত নমুনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং আমরা আপনার প্রতি নাজিল করেছি এই কিতাব, প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্টকরণের উন্নয়ন হিসেবে (সুরা নাহল, ১৬ : ৮৯)।

সে মতে, সুন্নাহ্ হচ্ছে সেই নকশা বা আদর্শ যার বিস্তৃতি ও পূর্ণাঙ্গতা অনন্য, সমগ্র মানবজীবনের পরিধি তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা অন্তর্ভুক্ত। দৈর্ঘ্য বলতে আমরা বুঝি এর ইহজাগতিক বা উল্লম্ব পরিসীমাকে, জন্ম থেকে মৃত্যু, প্রকৃতপক্ষে ভ্রুণের জীবন পর্যায় থেকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অবধি। প্রস্থ বলতে আমরা বুঝি আদিগন্ত বিস্তারকে, যা জীবনের সকল ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। নবি সা.-এর নির্দেশনা সবকিছুতেই পৌঁছে : গৃহে, বাজারে, মসজিদে, পথে, কাজে, আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের সাথে, পরিবারের সাথে, মুসলিমদের সাথে, অমুসলিমদের সাথে এবং সাধারণভাবে মানবজাতির সাথে, জীবন্ত প্রাণী ও জড় বস্তুর সাথে। গভীরতা বলতে আমরা বুঝি মানবজীবনের গভীরতর পরিসীমাকে। তবে এটি শরীরের সাথে সাথে মন ও আত্মাকে যেমন, তেমনি অন্তঃস্থের পাশাপাশি বহিঃস্থ এবং সর্বোপরি কথা, কাজ এবং অভীপ্সাকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কিছুসংখ্যক মুসলিম দাড়ি বড় করে রাখা এবং পোশাক সংক্ষিপ্ত করা ছাড়া সামান্যই জানেন সুন্নাহ্ সম্পর্কে। সেই সাথে আরাক (arak) গাছের দাঁতন (miswak) দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা পর্যন্তই। তারা নবি সা.-এর আদর্শের ব্যাপকতা ভুলে যান, যার মধ্যে অবস্থা বা পরিবেশের ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই তাদের মডেল প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করতে পারেন।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি

সুন্নাহ্‌কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা যায় এর ভারসাম্য দ্বারা। এ ভারসাম্য হচ্ছে আত্মা ও দেহ; মন ও হৃদয়; এই পৃথিবী ও এর পরবর্তী জীবন; ভাবগত এবং প্রকৃত; তত্ত্ব ও বাস্তব; অদৃশ্য ও দৃশ্যমান; স্বাধীনতা ও দায়িত্ব; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমূহবাদ; সাদৃশ্য ও উদ্ভাবন সামর্থ্য ইত্যাদির মধ্যে। তাই এটাকে হতে হয়েছে একটি মডারেট সমাজের জন্য একটি মডারেট বা উপযোগী আদর্শিক পদ্ধতি - যার মধ্যে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো কিংবা একেবারেই সামান্য কাজের অবকাশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন :

> যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না করো। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত করো এবং ওজনে কম দিও না (সুরা আর রহমান, ৫৫ : ৮-৯)।

নবি করিম সা. যখন তাঁর সাহাবিদের মধ্যে চরম কোনো কিছু লক্ষ্য করতেন, তখন তিনি দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে মিতব্যয়ের দিকে ফেরাতেন এবং বাড়াবাড়ি বা

অপর্যাপ্ততার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তিনি ঐ তিনটি লোকের কাজকে বাতিল করে দিয়েছেন যারা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এমনভাবে যে, তারা এটাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে এবং আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে তাদের তৃষ্ণা মেটেনি। তাদের একজন বলেছিল, সে সারাজীবন সিয়াম পালন করবে এবং তাতে কোনো বিরতি দেবে না; অন্যজনের বক্তব্য ছিল, সে সারা রাত্রি সালাতে দণ্ডায়মান থাকবে, বিশ্রাম নেবে না; তৃতীয়জন বলেছিল, সে স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকবে এবং বিবাহ করবে না। তাদের কথাবার্তা যখন তাঁর কানে পৌঁছাল, তিনি বললেন, সাবধান! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহ তায়ালা-সচেতন; তা সত্ত্বেও আমি সিয়াম পালন করি এবং খাই, আমি সালাত আদায় করি এবং বিশ্রাম নিই এবং স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছি। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাহ্‌কে বাদ দিয়ে (অন্যকিছু) বেছে নিল, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়[৬]। সিয়াম পালনে *আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বাড়াবাড়ি কিংবা রাত্রি জেগে সালাতে কুরআন তেলাওয়াত* দেখে তিনি তাকে পরিমিতির দিকে ফিরিয়ে দেন একথা বলে, প্রকৃতপক্ষে তোমার কাছে তোমার শরীরের হক রয়েছে (তা হচ্ছে বিশ্রাম), তোমার চোখের হক রয়েছে (তা হচ্ছে ঘুম) এবং তোমার অতিথিদের হক রয়েছে (অর্থাৎ তাদের আতিথেয়তা ও সঙ্গ প্রদান)[৭]। অন্য কথায় : প্রত্যেক প্রাপককে তার অধিকার প্রদান করা।

নবি সা. তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁর সুন্নাহ্ ও জীবনেতিহাসের মাধ্যমে ভারসাম্য ও মিতাচারের সর্বোচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেছেন- তাঁর প্রভু পরোয়ারদিগারের সাথে, তাঁর নিজের সাথে, পরিবারের সাথে, সাহাবিগণের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর উম্মাতের লোকদের সাথে লেনদেনের মধ্য দিয়ে।

অধিকাংশ সময় যেজন্য তিনি প্রার্থনা করতেন তা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত হয়ে রয়েছে :

> হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহজীবনের কল্যাণ দান করো এবং কল্যাণ দান করো পরজীবনে এবং আমাদেরকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন হতে (সূরা বাকারা, ২ : ২০১)।

তাঁর প্রার্থনার মধ্যে ছিল, হে মালিক আমার, আমার দ্বীনকে এমন করে দাও, যা আমার আমলের রক্ষাকবচ হবে; আমার পৃথিবীকে আমার অনুকূল করো, যেখানে আমার জীবন ও জীবিকা রয়েছে এবং আমার পরকালীন জীবনকে সুন্দর করো, যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন; প্রতিটি ভালো কাজের দ্বারা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করো এবং আমার মৃত্যুকে করো সকল মন্দ হতে বিরতির বস্তু[৮]।

একটি সংহত পথ

> নবি সা.-এর সুন্নাহ্ হচ্ছে একটি ঐকতানের বা সংহতির পথ। এটি বিশ্বাসের সাথে বুদ্ধিবৃত্তির সংহতি সাধন করে, প্রত্যাদেশের সাথে যুক্তির সমন্বয় করে, যাতে এসব থেকে প্রবাহিত হয় জ্যোতির ওপর জ্যোতি (সুরা নূর, ২৪ : ৩৫)।

এটি আইনের সাথে নৈতিক নির্দেশনা সংযুক্ত করে। সুন্নাহ্ হচ্ছে নির্দেশনার গঠন, ভিত্তি ও পরিচালনা। আইন প্রণয়নে এটি প্রতিরক্ষার সাথে, বল প্রয়োগের সাথে, শৃঙ্খলা ও শান্তির সাথে জড়িত। আইন ব্যতিরেকে নৈতিক নির্দেশনার কার্যকারিতা কমই এবং ঠিক তেমনি নৈতিক নির্দেশনা ছাড়া আইনের বাধ্যবাধকতা সামান্যই। নবি সা. একত্রে এ দুটির জন্যই দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুন্নাহ্‌র মধ্যে শক্তি ও ন্যায়ের সম্মিলন ঘটেছে। রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে কুরআনের, দ্বীনের প্রতি আহ্বানের। কারণ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা সেই কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন যা কুরআনের দ্বারা করেন না। যদি লোকদেরকে তাদের সৎ বিবেক মন্দকাজ থেকে বিরত রাখতে না পারে, তাহলে শক্তি তাদেরকে বিরত রাখতে পারে এবং যে এই আহ্বানের বিরোধিতা করে রাষ্ট্র তাকে শৃঙ্খলায় আনতে সমর্থ। কারণ প্রত্যেক অবস্থার জন্যই সহিষ্ণুতার একটি সীমা রয়েছে, যার বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই, যাতে তা মিথ্যা দ্বারা দলিত না হয়ে যায়। নবি সা. একই সাথে দ্বীনের দিকে আহ্বানও করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি দ্বন্দ্ববিরোধের মীমাংসা করেছেন এবং তাদের নিয়ে প্রশাসন চালিয়েছেন, শান্তির সময়ে এবং যুদ্ধাবস্থায়। তিনি এমন ছিলেন না, যেমনটা বনি ইসরাঈল তাদের অগ্রগতির পর্যায়ে ছিল- একজন নবি যিনি তাদেরকে পরিচালনা করেছেন ও দ্বীনের দাওয়াতে দিকনির্দেশ করেছেন এবং রাজার মতো রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যাবলীতে তাদের প্রশাসন ও পরিচালনে নেতৃত্ব দিয়েছেন-যেমনটা কুরআন আমাদের সামনে বর্ণনা করেছে যে, তাদের নবি ইসরাঈলিদের সামনে বলেছেন,

> আল্লাহ তালুতকে তোমাদের রাজা করেছেন (সুরা বাকারা, ২ : ২৪৭)।

ইসলামি রীতিনীতির ধারাবাহিকতায় নবিগণের ক্ষেত্রে জীবনকে (কর্তব্যকে) আল্লাহ তায়ালা এবং সিজারের মধ্যে বিভক্ত করে নেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই, যেমনটা মসিহ (খ্রিস্টানদের যিশু) সম্পর্কে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয় যে, ধর্ম আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা সিজারের জন্য। বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে (রসুল সা.) একথাই উচ্চারণ করতে বলেছেন,

> আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ- সবই বিশ্বজগতের প্রভু প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই (সাথী নেই)। বরং আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমদের মধ্যে (আল্লাহ কাছে আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে) আমিই প্রথম (সুরা আন'আম, ৬ : ১৬৩-১৬৪)।

এভাবে এ সমাজটি প্রশাসিত হয়েছে এবং এর জীবন সামগ্রিকভাবে পরিচালিত হয়েছে কিতাব ও ন্যায়নীতির ভারসাম্য দ্বারা। যে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সে-ই শৃঙ্খলায় এসেছে, যেমনটা আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

আমি আমার রসুলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (সত্যমিথ্যার) মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ২৫)।

ইবনে তাইমিয়্যাহ্ বলেন, লোকদের হেদায়াতের জন্য কিতাব এবং সমর্থনের জন্য লৌহ (শক্তি) থাকতেই হবে।

> এবং পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট (সুরা ফুরকান, ২৫ : ৩১)।

নেতৃত্ব এবং জনগণকেও একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। নেতা এমন কোনো ফেরেশতা নয় যা আসমানে ঘুরে বেড়াবে, বরং একজন মানব সন্তান যিনি বাস করবেন মাটির পৃথিবীতে। নেতা এমনও হবেন না যিনি বেদুঈনের মতো মনুষ্য বিবর্জিত পরিবেশে থাকবেন। বরং তার জন্য এটা বাধ্যতামূলক যে, তিনি তাদের একজন হয়ে তাদের সাথে থাকবেন, তাদের আনন্দ ও বেদনার ভাগীদার হবেন, তাদের সংকট ও সমস্যায় থাকবেন তাদের পাশেই। এটাই প্রকৃতপক্ষে তেমন, যেমনটা নবি সা. ছিলেন।

খাদ্যাভাব ঘটলে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং সেই ব্যক্তি যিনি সবার পরে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন; যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান হতো সবার শীর্ষে; প্রার্থনায় তিনি মানুষের নেতা এবং আচার ব্যবহারে তাদের আদর্শ। যখন কোনো আগন্তুক আসত, সে লোকজনের মধ্যে নবি সা. কে আলাদা করতে পারত না এবং তাই জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? লোকেরা যখন মসজিদ নির্মাণ করত এবং পাথর বহন করত। তিনিও তাদের সাথে টানতেন, নির্মাণ কাজে তাদের সাথে তাঁর শ্রম যুক্ত করতেন, ফলে তাদের কেউ কেউ বলত : নবি সা. যখন পরিশ্রম করেন, তখন যদি আমরা বসে থাকি, তাহলে আমাদের জন্য তা হবে নিন্দনীয়।

এই আদর্শিক প্যাটার্নের ছায়াতলে বিশ্বাসীগণ তাদের সমাজ যথার্থ গঠনের কাজে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন, এটাকে আদর্শ করার উদ্দেশ্যে, যাতে করে তারা সমগ্র

পৃথিবীর কাছে তাদের বাণী পৌঁছাতে পারেন। তাদের দ্বারা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের দাবি ছিল সংহতি ও পারস্পরিক বুঝাপড়ার মধ্য দিয়ে তা করার, যার যেখানে স্থান এবং যার যেমন সামর্থ্য সে অনুযায়ী। বিদ্বান অবাধে তার বিদ্যা বিতরণ করতেন, ধনী বিলাতেন তার ধন, যশস্বী তার যশ এবং যার যেমন ক্ষমতা বা সামর্থ্য ছিল তারা তা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করতেন। আল্লাহ তায়ালাও তার বান্দার ওপর এমন বোঝা চাপান না যা বহনের সামর্থ্য তাকে তিনি দেননি। লোকদের মধ্যে দুর্বলতর ব্যক্তির দায়িত্বকে সম্মান করা হতো, তাদের মধ্যে শক্তিমানকে টানা হতো অন্যের সাহায্যার্থে এবং একত্রে তারা তাদের বিরোধী কিছুর মোকাবেলায় পরস্পর সহায়ক ছিলেন। সুতরাং তারা ছিলেন পরস্পরের বন্ধু, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করেন (সূরা তাওবা, ৯ : ৭১)।

একটি বাস্তবোচিত পদ্ধতি

সুন্নাহ্ একটি বাস্তবতা সম্পন্ন পদ্ধতিও বটে। এটা মানুষকে এমন মনে করে না যে, তারা ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতা। বরং বিবেচনা করে মানুষ হিসেবেই, যারা খাদ্য গ্রহণ করে এবং হাটে বাজারে থাকে, যাদের রয়েছে রিপু ও আবেগ, তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাদের রয়েছে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা যা তাদেরকে পৌঁছে দিতে পারে জান্নাতের মেজবানের কাছাকাছি। তারা সৃজিত হয়েছিল মৃত্তিকা ও ছাঁচে ঢালা দ্বারা, কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার অধ্যাত্ম নিঃশ্বাসও ছিল। অতঃপর সামান্য বিস্ময় এই যে, মানব সন্তান উন্নত হয় এবং অবনত হয়। তার হয় উন্নতি ও সে হয় অধঃপতিত, অর্থাৎ সে পরিচালিত হয় ও উৎসন্নে যায়, কিংবা সে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে কিংবা পথভ্রান্ত হয়, সে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করে এবং অনুশোচনা করে।

একজন সাহাবি অনুভব করলেন যে, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কারণ যখন বাড়িতে থাকেন তখনকার মনের অবস্থা এবং নবি সা.-এর সাথে থাকাকালীন মনের অবস্থার পার্থক্য ঘটে। তিনি নবি সা.-এর কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি রসূল সা.-এর কাছে তার মুনাফিকী ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, যখন তিনি তাঁর সা. সাথে থাকেন তখন তার হৃদয় দ্রবীভূত ও কোমল থাকে, চক্ষু থাকে অশ্রুসিক্ত এবং তিনি তাঁর প্রভুর জিকিরে রত থাকেন,

তিনি তার সামনে যেন পরকালীন জীবনকে নিজ চোখে দেখতে পান। তারপর যখন তিনি তার পরিবারে ফিরে যান, সন্তান-সন্ততির সাথে কৌতুক করেন, স্ত্রীর সাথে ক্রীড়ায় মত্ত হন, তখন তার মধ্যে পূর্বেকার অবস্থা অবলুপ্ত হয়ে যায়। একথা শুনে রসুল সা. বললেন, ওহে হানযালা! আমার সাথে থাকাকালীন মনের অবস্থা যদি তুমি ধরে রাখতে পারতে, তাহলে রাস্তাঘাটে ফেরেশতারা তোমার সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু হানযালা, এটার জন্য এক রকম সময় এবং ওটার জন্য সময় অন্য রকম[৯]।

এটি একটি সুপরিচিত কথা যে, মানুষ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, অতঃপর তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ঢুলুঢুলু। এতে কোনো ক্ষতি নেই যদি তার সময় এবং জীবন তার জন্য যা কল্যাণকর তাতে এবং তার প্রভুর হক আদায়ের মাঝে ব্যয়িত হয়, অথবা ইহকাল ও পরকালের মধ্যে, যেমনটা বলা হয়েছে এই আপ্ত বাক্যে, এক ঘণ্টা তোমার আত্মার জন্য এবং এক ঘণ্টা তোমার প্রভুর জন্য।

এটার অনুমোদন বা স্বীকৃতিস্বরূপ সুন্নাহ্ মানবীয় দুর্বলতার জন্য অবকাশ দিয়েছে। এটা বৈধ বিষয়বস্তুর সীমা প্রশস্ত করেছে এবং নিষিদ্ধতার সীমা করেছে সংকুচিত, যেমন এই হাদিসে বলা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা হালাল এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হারাম এবং যেই বিষয়ে তিনি নীরব রয়েছেন তা এর (নির্দেশনা থেকে) বাইরে। অতএব আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সীমারেখা গ্রহণ করো। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনই কোনোকিছু সম্পর্কে উদাসীন নন। অতঃপর রসুল সা. তিলাওয়াত করলেন,

> তোমার প্রতিপালক কখনই ভুলে যান না (সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৬৪)[১০]।

মানবীয় দুর্বলতার আরো স্বীকৃতির বিষয়ে সুন্নাহ্ পরিস্থিতি অনুযায়ী সেসব ক্ষেত্র বৈধ করেছে যা সাধারণভাবে অবৈধ। এমনকি প্রয়োজনের পরিপ্রক্ষিতে এমন কিছুকে বৈধ করা হয়েছে যা স্বাভাবিকভাবেই অবৈধ। উদাহরণস্বরূপ, রসুল সা. তাঁর দুজন সাহাবিকে তাঁদের চর্মরোগের কারণে রেশমি বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

মানব জীবনে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহ্ নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে এবং সেই ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হয়েছে যখন সে অবাধ্যতায় পতিত হয়। অনুশোচনার সময়ে এটি দরজা বন্ধ করেনি। বরং তার সামনে উন্মুক্ত করেছে প্রশস্তভাবে, যাতে সে ওই দরজার কড়া নাড়তে পারে প্রভুর সামনে অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে অধোবদনে। যেমনটা হাদিসে বলা হয়েছে : রজনীব্যাপী আল্লাহ তায়ালা তাঁর হস্ত প্রসারিত করেন, যাতে

তিনি দিনের বেলার কৃত অপরাধের অনুশোচনা গ্রহণ করতে পারেন এবং তিনি দিনের বেলায় তাঁর হস্ত প্রসারিত করেন যাতে তিনি রাত্রে কৃত অপরাধের জন্য অনুশোচনা গ্রহণ করতে পারেন- যতদিন পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়[১১]।

অন্য এক হাদিসে এসেছে : যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা যদি পাপকাজ না করো এবং ক্ষমা না চাও, তিনি তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং পরিবর্তে এমন লোকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন যারা অন্যায় করবে ও ক্ষমা চাইবে তাঁর কাছে এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন[১২]।

মানুষের অবস্থাগত ভিন্নতা এবং পারস্পরিক ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নাহ্‌ অবকাশ দিয়েছে, সে ভিন্নতা সহজাতই হোক কিংবা অর্জিতই হোক। এসব ভিন্নতা বিবেচনায় রসুল সা. কয়েকজন লোকের একটি প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন জবাব দিয়েছেন। তাই তিনি ঐ (মুয়ামালাত) ব্যাপারে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এমন নির্দেশ দেননি যা দিয়েছেন একজন যুবককে, অথবা অভাবীকে দেননি এমন নির্দেশ যা প্রাচুর্যের অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথবা যে ব্যক্তি কাজে কর্মে স্বাধীন। একইভাবে, তিনি লোকদের প্রথা ও বৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখেছেন। তাই তিনি সা. আবিসিনীয়দেরকে ঈদের দিনে তাঁর মসজিদে তাদের বর্শা নিয়ে খেলার অনুমতি দিয়েছেন এবং আয়শা রা. কে তাঁর (রসুল সা.) পিছনে দাঁড়িয়ে তা উপভোগের অনুমতি দিয়েছেন। একইভাবে তিনি (রসুল সা.) বালিকাদের আয়শা রা. আনহু-এর সাথে খেলার অনুমতি দিয়েছেন আয়শা রা. আনহু-এর তরুণ বয়সের কথা বিবেচনায়। তাই তিনি বিবাহ শাদিতে বা কারো দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে এবং অন্য এধরনের উপলক্ষকে কেন্দ্র করে মানুষের বিনোদন ও আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত আমোদ প্রমোদের অনুমতি দিয়েছেন।[১৩]

সুন্নাহ্‌র মধ্যে অন্তর্নিহিত এ বাস্তবতা অনেক উদাহরণ দিয়েই বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু এর সবই আল্লাহ তায়ালা-নির্দেশিত রসুল সা.-এর নমুনার মডেল সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করা উদ্দেশ্যে।

একটি সহজীকৃত পথ

সুন্নাহ্‌র পথের আরেকটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আনুকূল্য, এর সুবিধা এবং এর সহিষ্ণুতা। পূর্বতন কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে বর্ণিত নবি সা.-এর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তাদের নির্দেশ দেবেন যা সত্য তা প্রতিপালনের এবং নিষেধ করবেন খারাপ থেকে; তিনি তাদের জন্য উত্তম বস্তুনিচয়কে বৈধ করবেন এবং অধম বস্তুনিচয়কে অবৈধ করবেন এবং তিনি তাদেরকে ভারমুক্ত করবেন এবং বিরাজমান বাধা দূর করবেন” (আল-আরাফ, ৭ : ১৫৭)। সুতরাং রসুল সা.-এর

সুন্নাহ্‌র মধ্যে এমন কিছু নেই যা মানুষের দ্বীনী জীবনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে (দ্বীনকে বাধাগ্রস্ত করা) অথবা তাদেরকে পার্থিব জীবনে (দুনিয়ায়) নির্যাতিত করতে পারে।

বরং, রসুল সা. তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন : প্রকৃতপক্ষে আমাকে তোমাদের জন্য উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়েছে[১৪]। তাঁর এ কথা কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যা:

> এবং আমরা আপনাকে বিশ্বজগতের রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি (সুরা আম্বিয়া, ২১ : ১০৭)।

তিনি (রসুল সা.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্লেশদায়ক করে প্রেরণ করেননি, কারো জন্য কষ্ট বহন করে আনুক এমন কাজেও পাঠাননি; বরং তিনি আমাকে শিক্ষক এবং অন্যের কষ্ট লাঘবের উপায় করে প্রেরণ করেছেন[১৫]।

রসুল সা. আবু মুসা রা. ও মূয়ায রা. কে সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক নির্দেশনা দিয়ে ইয়েমেন যাত্রায় বিদায় জানিয়েছিলেন : মানুষের জন্য সহজ করে দিও, কঠিন করে দিও না; শুভ সংবাদ দিও (যাতে তারা আশান্বিত হয়) এবং তাদের মধ্যে বিরূপ ভাব উস্কে দিও না; পরস্পরের কথা শুনো এবং দূরত্বের বিস্তার ঘটাবে না।[১৬] তাঁর উম্মাতকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সহজতর করো, কঠিনতর করো না ও উত্তম প্রত্যাশা জাগিয়ে দিও, বিচ্ছেদ উস্কে দিও না[১৭]।

এক বেদুঈন যখন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল, তখন সাহাবিরা রা. উত্তেজিত হয়ে উঠলে তিনি (রসুল সা.) বললেন, তোমরা এমন এক জাতিরূপে আবির্ভূত হয়েছ যারা সহজ করে দেবে, কঠিন করবে না[১৮]। তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই আমি একটি সহিষ্ণু সত্য দ্বীন (প্রচার ও প্রতিষ্ঠা) এর দায়িত্ব নিয়ে এসেছি[১৯]। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ওপর ঐ সব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যা তোমরা পালন করার সামর্থ্য রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ক্ষান্ত হও[২০]।

কুরআনের জ্যোতির ধাঁচে রসুল সা. বিষয়াদিকে সহজ করেছিলেন, যাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ করতে চান, কাঠিন্য চান না এবং তিনি দ্বীনের দায়িত্ব পালনে তাদের ওপর কোনো বোঝা চাপাতে চান না। সেমতে, তিনি বিশুদ্ধতা অর্জনমূলক আয়াতের শেষে বলেছেন :

> আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দিতে চান না (সুরা মায়েদা, ৫ : ৬)।

এবং বিবাহে নিষেধাজ্ঞার পর্যায় বর্ণনার পর বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভার হাল্কা করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (সুরা নিসা, ৪ : ২৮)।

তাই বলা যায় যে, রসুল সা. দ্বীনের বিষয়ে অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। এ কারণেই তিনি কৌমার্য অবলম্বন ও সন্ন্যাস অবলম্বন করতে কিংবা জীবনের জন্য হিতকর বিষয়াদি বর্জন করতে নির্দেশ দান করেননি। বরং তিনি সুষমভাবে জীবনকে উপভোগ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন[২১]। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে দেওয়া আনুকূল্যের প্রকাশ দেখতে চান[২২]। তিনি উদার হতে বলেছেন এবং পবিত্রতা অর্জন (ওজু), নামাজ, রোজা ও হজের কর্তব্যকর্মকে হালকা করেছেন। তাই তিনি প্রয়োজনে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করার বিধান দিয়েছেন; সালাতকে সংক্ষিপ্ত ও দুই সালাতকে একত্রিত করতে বলেছেন; অসুস্থতা বা অপারগতার ক্ষেত্রে বসে, শুয়ে বা ইশারায় সালাত আদায় করতে বলেছেন এবং রমজান মাসে অসুস্থ ব্যক্তি, মুসাফির, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও দুগ্ধমাতার জন্য সিয়াম ভাঙার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। সফররত অবস্থায় মাথার ওপর ছায়া দিয়ে রাখা হচ্ছিল এবং গায়ে পানির ঝাপটা দেওয়া হচ্ছিল এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে রসুল সা. বলেছেন, সফরকালে সিয়াম পালনে কোনো পুণ্য নাই[২৩]। অর্থাৎ লম্বা সফরের উদ্দেশে ভ্রমণ কষ্টকর ও ক্লান্তিকর। বৃষ্টির মতো বাধা সৃষ্টিকারী অবস্থায় অনুপস্থিতি বা সফরের অবস্থা ব্যতিরেকেই তিনি মদিনা থাকাকালীন সময়ের জন্য জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদিসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস রা. কে যখন প্রশ্ন করা হলো : এর দ্বারা তিনি কি বুঝিয়েছেন? তিনি বলেছেন, তাঁর মনোভাব ছিল উম্মাহকে কষ্ট না দেওয়া[২৪]। অন্য কথায় তিনি তাঁর উম্মাহর ওপর থেকে বোঝা প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করবে এবং তিনি তাঁর অবাধ্যতাকে ঘৃণা করেন[২৫] এবং আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন তাঁর অভিপ্রায় চরিতার্থ হওয়াকে, যেমন তিনি চান তোমরা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমল করো[২৬]।

একদিন তাঁর কয়েকজন সাহাবি তাঁর কাছে এই বলে অভিযোগ করলেন যে, আমর ইবনুল আস অপবিত্র (বড় ধরনের নাপাকী) হয়েছেন, কিন্তু গোসল না করে কেবল তায়াম্মুম করেই তাদের সাথে সালাত আদায় করেছেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে আমর বললেন, ঐ রাত্রে ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল এবং আমার স্মৃতিতে আল্লাহ্ তায়ালার এই উক্তি জাগরুক ছিল যে,

> মহামহিমান্বিত তিনি এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য পরম দয়ালু (সুরা নিসা, ৪ : ২৯)।

একথা শুনে আল্লাহর রসুল সা. মুচকি হাসলেন–এটা ছিল আমরের ঐ কাজ অনুমোদনের ইঙ্গিত।

অন্য এক ঘটনা : এক লোক জখম হয়েছিল, তারপর সে জুনুবি (নাপাক) হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলল যে, জখম হওয়া সত্ত্বেও তাকে গোসল করাতে হবে, গোসলের পর তার অবস্থার অবনতি হলো এবং শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। এ সংবাদ নবি সা.-এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, ওরা তাকে হত্যা করল! আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হত্যা করুন! তারা যেটা জানে না, সেটা সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা করে না? জ্ঞানহীনতার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে প্রশ্ন করা[২৭]।

২. সুন্নাহ্‌র প্রতি মুসলিমদের কর্তব্য

যেমনটা আমরা বলেছি, মুসলিম ব্যক্তি এবং মুসলিম সমাজজীবনের জন্য সুন্নাহ্ হচ্ছে জীবনযাপনের বিস্তারিত প্যার্টান বা নকশা এবং এটা হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যার প্রতিফলন। ইসলাম জীবন জুড়ে অঙ্গীভূত। মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে : রসুল সা.-এর এই বিস্তারিত প্যাটার্নকে জানা এর স্বতন্ত্র উপাদানসহ, বিশেষত এর ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতা, এর ভারসাম্য, এর বাস্তবতা এবং এর সুবিধা সম্পর্কে জানা। তাদের জানা উচিত মর্মমূলে প্রোথিত দয়ার্দ্রতা, মহান মানবতা এবং নির্ভেজাল গুণাবলী কত স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। তারা তাদের সামগ্রিক জীবনযাপনে তাঁকেই উত্তম আদর্শিক নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে।

> তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ তায়ালাকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রসুল-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ (সুরা আহযাব, ৩৩ : ২১)।
>
> রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো (সুরা হাশর, ৫৯ : ৭)।
>
> বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১)।

এটি এই সুন্নাহ্ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিগত দক্ষতা শিক্ষাকে মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক করে, কিভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে, বুঝাপড়া এবং যথাযথ শিষ্টাচারের সাথে। কারণ এই উম্মাহর সর্বোত্তম প্রজন্ম তা কার্যকর করেছেন, যারা আন্তরিকতার সাথে

শিক্ষালাভ করেছেন হজরত মুহাম্মদ সা.-এর শিক্ষালয়ে। তাঁর সাহাবিগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ (তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ি) তাঁর শিক্ষাগ্রহণে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছেন, তারপর যা তারা শিখেছেন তা কাজে প্রয়োগ করেছেন এবং আমলের ক্ষেত্রেও চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। তারপর তারা শিখিয়েছেন ইসলামের নেতৃবৃন্দকে এবং শিক্ষাদানেও তারা ছিলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের।

সাম্প্রতিককালে যে সংকট মুসলিমগণ মোকাবেলা করছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে চিন্তাগত সংকট। আমার মতে, এটা বিবেকের সংকটের ওপর স্থান নিয়েছে। এটা সর্বদাই সেই চিন্তাধারা গঠনে- যা অন্তরায় সৃষ্টি করে- তার পথ তৈরি করে যাচ্ছে। তারপর আসছে আন্দোলন, এরপর চিন্তার তৈরি নকশার সাথে ধারণার মেলবন্ধন হচ্ছে। চিন্তার সংকটে যা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে তা সুন্নাহ্ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি এবং এর প্রয়োগের সংকট। এটাই ছিল ইসলামি পুনর্জাগরণে কিছু আন্দোলনের বিশেষ প্রপঞ্চ।

অধিকতর লক্ষ্যণীয় হলো, ঐসব আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং এগুলোর ওপর প্রত্যাশা ঝুলিয়ে দেওয়া এবং বিশ্বময় উম্মাহর নেতৃবৃন্দের নিজেদেরকে প্রত্যাশার দিকে নিবদ্ধ করা। প্রায়ই ঐসব আন্দোলন সুন্নাহ্ সম্বন্ধে ভুল বুঝাপড়ার ভিত্তিতে ইস্যু উপস্থাপন করে থাকে। এ সম্বন্ধে তাদের মতামত অপর্যাপ্ত। এটি সুন্নাহ্‌কে বাহ্যিক প্রদর্শনী এবং আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করা ছাড়া কিছুই নয়, যার মধ্যে রসুল সা.-এর নমুনার জ্ঞানের গভীরে অন্তঃপ্রবেশের বালাই ছিল না, যাঁর বিশেষ গুণাবলীর বিবরণ আমরা পূর্বেই প্রদান করেছি।

তিনটি পাপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

রসুল সা. থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নবুওতের জ্ঞান ও রিসালাতের উত্তরাধিকার চরমপন্থীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে এবং লক্ষ্যবস্তু হবে মিথ্যুক ও মূর্খদের। এটা ইবনে জরিরের বর্ণনায় এসেছে তামিম ও তার ফাওয়ায়িদ ইবনে আদি ও অন্যদের কর্তৃক নবি সা. থেকে। তিনি সা. বলেন, প্রত্যেক প্রজন্ম থেকে এর ন্যায়বান ও সৎ লোকেরা এই জ্ঞান বহন করবে, চরমপন্থীদের দ্বারা সার্বিক বিকৃতি, মিথ্যুকদের অনাচার এবং মূর্খদের ব্যাখ্যা থেকে একে পরিশোধন করবে[২৮]। ওরাই প্রকৃতপক্ষে তিনটি ধ্বংসাত্মক আক্রমণকারী এদের প্রত্যেকেই রসুল সা.-এর উত্তরাধিকারের পথে বিপদ।

ক). চরমপন্থীদের বিকৃতি

বিকৃতির জন্ম হয়েছে চরম মতবাদ ও একগুঁয়েমি হতে, দ্বীনের বৈশিষ্ট্যমূলক নমনীয়তা বর্জন থেকে। মিতাচারের প্রতি ঘৃনা হতে যা এ দ্বীনকে বিশেষত্ব দান

করেছে, সহিষ্ণুতা যা এই পুণ্যবান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং সেই সুযোগসুবিধা যা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাকে উৎকীর্ণ করেছে। এটা আমাদের পূর্বেকার সেই চরম মতবাদ, যা আহলে কিতাবকে ধ্বংস করেছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মমত, ইবাদত বন্দেগী বা আচার-আচরণের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা দ্বীনের সুবিধা বিসর্জন দিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যা কখনো বলেননি তার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার ঘোষিত হালালকে হারাম করেছে। এভাবে লোকদেরকে নিয়ম পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার ভারে ন্যুব্জ করেছে যা আল্লাহ তায়ালা কখনো তাদের জন্য আবশ্যকীয় করেননি। কুরআনের ঘোষণাই এসব কিছু তাদের বিরুদ্ধে রেকর্ড করেছে এই বলে :

> বলো, হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না, আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, যারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আর সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে (সুরা মায়েদা, ৫ : ৭৭)।

ইবনে আব্বাস নবি সা. থেকে বর্ণনা করেন : দ্বীনে বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সাবধান থাকবে, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীগণ বাড়াবাড়ির ফলেই ধ্বংস হয়ে গেছে[২৯]। ইবনে মাসউদ তাঁর সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সা. বলেছেন এবং তিনবার বলেছেন : একগুঁয়ে চরমপন্থীরা ধ্বংস হয়ে গেছে[৩০]।

এখানে উল্লেখযোগ্য, এ হাদিস চরমপন্থাকে দ্বীনের জন্য ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করে। কারণ এই যে, এ মতবাদ দ্বীনকে এর সহজতা, সুবিধা ও মধ্যপন্থার বৈশিষ্ট্যগত মেজাজ থেকে অন্য মেজাজের দিকে নিয়ে যায়, লোকদের বাড়াবাড়িতে ভারাক্রান্ত করে এবং তাদের ওপর কষ্টক্লেশ চাপিয়ে দেয়।

খ). মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের বিকৃতি সাধন

বিকৃতি ঐগুলোই যা নবি সা.-এর পদ্ধতি-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়েছে অথচ এগুলো তা নয় এবং কিছু অভিনব ও উদ্ভাবিত বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে যা এর মেজাজ গ্রহণ করে না, এর ধর্মমত ও এর আইন প্রবলভাবে তা বাতিল করে দেয় এবং যা এর মূল ও শাখাপ্রশাখা উপড়ে দিতে চায়। এখন এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা কুরআনের মধ্যে কোনো কিছু অনুপ্রবিষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এর আয়াতসমূহ মানব মনে সংরক্ষিত রয়েছে, লিখিত কপিতে খোদিত রয়েছে এবং ইমানদারদের জিহ্বা তা তেলাওয়াত করে থাকে। সুতরাং তারা ভেবে দেখে যে, সুন্নাহ্‌কে বিকৃত করলে তাদের পথ মসৃণ হবে, তখন তাদের পক্ষে একথা উল্লেখ করা সম্ভব হবে কোনো সাক্ষ্য ছাড়াই যে, আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন।

কিন্তু এই উম্মাতের দোষগুণ বিচারে পারদর্শী বিদ্বান ও অভিভাবকগণ এদের পথের প্রতিটি মোড়ে অপেক্ষা করেন এবং তাদের কৃত প্রতিটি বিকৃতির আবর্জনা পরিষ্কার করেছেন। তারা সনদ (বর্ণনার ধারাবাহিকতা) ব্যতীত একটি হাদিসও এবং এগুলোর বর্ণনাকারীর প্রত্যেককে একে একে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র স্পষ্টভাবে জানা গেছে। তারা তার শিক্ষক, সঙ্গী-সাথী ও ছাত্রদেরকেও খুঁজে বের করেছেন। তারা তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও আল্লাহ্ তায়ালা ভীতি (তাকওয়া) শুনে কোনোকিছু সংরক্ষণে তার নির্ভুলতা, বিশ্বাসযোগ্য সুপরিচিত বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে তার সামঞ্জস্য এবং সুপরিচিত নয় এমন বিষয়াদিতে তার একক বর্ণনার গুণাগুণ বিচার করেছেন।

এ কারণেই আলেমগণ বলেন : সনদসমূহ দ্বীনের অংশ। কারণ, সনদ না থাকলে সে যা ইচ্ছা করবে তাই বলবে! 'অন্ধকারে জ্বালানি কাঠ খোঁজ করার সাথে' তারা ইসনাদ অন্বেষণ ছাড়া জ্ঞান অন্বেষণের তুলনা করেছেন। তাই তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতা না থাকলে কোনো হাদিস গ্রহণ করেননি, বিশ্বস্ততার সাথে এরূপ হয়েছে স্বচ্ছ মনের অধিকারী বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে যারা তাদের কাছে আগত বিষয় সংরক্ষণে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কোনো শূন্যতা রাখেননি, তা স্পষ্ট হোক কিংবা প্রচ্ছন্ন হোক এবং সব ধরনের অনিয়ম, ত্রুটি বা আপত্তিকর হওয়া থেকে নিরাপদ বিবেচিত হলে তবেই তা গ্রহণ করা হয়েছে।

সনদ সংগ্রহে এর উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগত বিশুদ্ধতা মুসলিম উম্মাহর বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। তারা সমসাময়িক সভ্যতার অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন এই অর্থে যে, এরা সেই সব মানুষ যারা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও এটা দুঃখজনক যে, এই সম্প্রদায় সূত্র ও ইসনাদ ছাড়াই আল হাদিস প্রচার করেছে। এটাও দুঃখজনক যে, জ্ঞান সমৃদ্ধ আলেমগণও এগুলো জালকরণ ও মিথ্যাকরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাছাড়া এটা সাধারণ লোকদের মধ্যে অভিন্ন মুদ্রা'য় পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের সম্পর্কে এধরনের হাদিস : কন্যাদের জীবন্ত সমাধিস্থকরণ গৌরবজনক কাজের অন্যতম এবং প্রথমে (নারীদের সাথে) পরামর্শ করো, তারপর তাদের বিরোধিতা করো এবং ওপরের তলার কক্ষ (মহিলাদের) বরাদ্দ দিও না এবং লিখিতভাবে তাদেরকে শিক্ষাদান করো না ইত্যাদি। এসব হাদিসের কোনো কোনোটি তাওহিদের মূল বাণীকেই লঙ্ঘন করেছে। উদাহরণস্বরূপ : তোমাদের কেউ যদি দৃঢ়ভাবে পাথরে বিশ্বাস রাখো,

তাহলে এটি তার উপকার করবে। আবার কিছু মিথ্যা কুসংস্কারও রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রসুল সা.-এর ঘাম থেকে গোলাপ সৃষ্টি হয়েছে।

এ অবস্থা উম্মাহর কিছু আলেমকে জাল হাদিসের গ্রন্থ সংকলনে উদ্যোগী করে, যাতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা যায় এবং বিশেষ করে যেহেতু নৈতিকতার নির্দেশনা সম্বলিত গ্রন্থাদি যা অন্তরকে কোমল করে, তাসাউফ (সুফিবাদ) এবং অন্যান্য, তাদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল- এমনকি তাদের কিছু হাদিসের কিতাবও। এসব পণ্ডিতের মধ্যে ছিলেন : আল-মাগানী, ইবন জাওযী, আল-সুয়ুতী, আল-ক্বারী (মোল্লা আলী ক্বারী), ইবন-আরাক, আল-শাওকানী, আল-লাখনা এবং সাম্প্রতিক কালের আল-আলবানি প্রমুখ। সুতরাং তাদের গ্রন্থাদি ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।

গ). মূর্খদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা

ভুল ব্যাখ্যা এমন কিছু যাতে ইসলামের বাস্তবতা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, এতে যথাযথ প্রসঙ্গ থেকে শব্দাবলী বিকৃত করা হয় এবং এর দ্বারা ইসলামের প্রধান উপাদানসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে এমনভাবে যে, এর মৌলিক ইস্যু ও নির্দেশনা হারিয়ে যায়। মিথ্যাশ্রয়ী লোকেরা এমনভাবে বিকৃতি সাধন করেছে যে, ইসলামের কোনোই অংশ নয় এমন কিছু ইসলামে সংযুক্ত হয়ে গেছে। এগুলো করা হয়েছে এর অগ্রাধিকার বিকৃত করে, যেগুলোর হক অগ্রভাগে আসা উচিত সেগুলোকে পেছনে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলো পেছনে থাকার কথা সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে সম্মুখে আনা হয়েছে।

ভুল ব্যাখ্যা এবং পচনশীল অনুধাবন ঐসব লোকের সর্বাগ্রে করণীয় যারা তাদের দ্বীন সমন্ধে অজ্ঞ, যারা কখনো এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে পারেনি এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কে এদের কোনো গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি নেই। জ্ঞানের গভীরতায় তাদের কোনো প্রকার শেকড় নেই, না সত্যের প্রতি রয়েছে তাদের নিরপেক্ষ মানসিকতা। তারা উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিকৃতি ও বিচ্যুতি পরিহার করে না। তারা কুরআনের আয়াতের স্পষ্ট আদেশ নির্দেশ অর্থাৎ আহকাম পরিহার করে এবং মুতাশাবিহাত আয়াতের পিছনে ছোটে, যেগুলো রূপক বা আলংকারিক। তারা এমনটা করে মতভেদ সৃষ্টির জন্য, যাতে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা মনের মাধুরী মিশিয়ে করে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়।

এটাই প্রকৃতপক্ষে মূর্খদের ব্যাখ্যা, যদিও তাদের অঙ্গে বিদ্বানগণের পোশাক শোভা পায় কিংবা তাদের নিজেদেরকে উপস্থাপন করে জ্ঞানী দার্শনিকদের পদবি ব্যবহার করে। এ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক হওয়া অপরিহার্য, এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ

করা কর্তব্য এবং এর মধ্যে অধঃপতিত হওয়ার আশঙ্কা দূর করার প্রয়োজনে শৃঙ্খলা বিধান জরুরি। বিপর্যস্ত মাজহাব ও উপদলগুলোর অধিকাংশই উম্মাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বিচ্যুত হয়েছে এর দ্বীনী আকিদা হতে ও বিধিবিধান থেকে। যেসব দল সরল পথ থেকে সরে গিয়েছে, তারা ধ্বংস হয়েছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গলদের ফলেই।

এ অবস্থানে এসে আল্লাহর রসুল সা.-এর অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগত প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম'র আলোকিত বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর আর-রূহ নামক গ্রন্থে এটা উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্য থেকেই আমরা উদ্ধৃত করতে পারি : এটা প্রয়োজনীয় যে, রসুল সা.-এর কাছে থেকে একজন কোনো প্রকার অতিশয়োক্তি বা সংক্ষেপন ছাড়াই উপলব্ধি করলেন, কারণ তাঁর সা. কথা এমন কিছু বহন করে না যা ধারণযোগ্য নয়, না এতে তাঁর সা. মনোবৃত্তি বা উদ্দেশ্যের বিষয়ে, নির্দেশনা বা ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কমতি রয়েছে। এটার প্রতি অবহেলা এবং এটাকে পরিত্যাগ করার কারণেই নিশ্চিতভাবে সঠিক পথনির্দেশ থেকে ভ্রান্তির মধ্যে বিপথগামী হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কারো জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সম্বন্ধে ভুল আকিদা প্রত্যেক বিরোধী মত উদ্ভাবন এবং ইসলামে ভুলভ্রান্তির প্রবৃদ্ধির মূল। বরং বলা চলে, এটাই (দ্বীনের) শেকড় ও শাখা প্রশাখার প্রতিটি ব্যর্থতার মূল, যদি তা সৎ উদ্দেশ্যের কারণেও হয়। আহা কী দুর্দশা দ্বীনের এবং এর লোকদের (যা পরিদর্শন করা হয়েছে) এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন! কাদিরিয়া ও মুরজিয়ারা, খারেজি ও মুতাযিলী, জাহমিয়া ও রাফেযিরা এবং অবশিষ্ট বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠীসমূহ আর্বিভূত হয় এবং বিবাদ সৃষ্টি করে কেবল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা. সম্পর্কে ভ্রান্ত আকিদার কারণে। [এই অবস্থা চলতেই থাকে] যতক্ষণ না এই দ্বীন অধিকাংশ লোকের কাছে চলে যায়, যাদের প্রতি এই ভুল ধারণা চালিত হয়েছে। কিন্তু ওটা (দ্বীন) তাই যেভাবে সাহাবিগণ একে বুঝেছিলেন এবং তারা যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছেন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা. হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা দ্বারা, তখন তা পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং ঐসব লোকেরা এদিকে না ফিরে দেখেছেন, না এর প্রতি মনোযোগী হয়েছেন, এতদূর পর্যন্ত যাতে করে যদি আপনি [এসব ব্যক্তির] লেখা শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন এর লেখকের [এমনকি] একটি স্থানও নেই যাতে মনে হতে পারে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা. থেকে তাঁর ভাবধারা যেমনটা প্রয়োজন বুঝতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি কেবল তাই জানেন যা তিনি জেনেছেন জনগণের জানা [অভিমত] হতে এবং রসুল সা.-এর কাছ থেকে যা এসেছে তা সরিয়ে রেখেছেন একপাশে। যে ব্যক্তি এর

বিপরীত করেছেন, এ বিষয়ে এভাবে বিন্যাস করেছেন যা রসুল সা. থেকে আগত অথচ এর আগে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা হয়েছে এবং প্রচারে এসেছে এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয়েছে তার কাছে বেশি আকর্ষণীয় আন্দাজ অনুমানকে। তাই তাকে এবং তার পছন্দকৃত বিষয়কে বাতিল করো এবং তাকে সেই দায়িত্বই প্রদান করো যে দায়িত্ব সে নিজেই গ্রহণ করেছে। তাকে ধন্যবাদ জানাও যে তোমাকে এর দ্বারা নিষ্কলুষ করে রেখেছে।

মূল পাঠ কুরআন কিংবা সুন্নাহ্ যেখানেই হোক-এর বিকৃত ব্যাখ্যা একটি দীর্ঘমেয়াদী পাপ। মুসলিমরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেমন তাদের পূর্বের উম্মাহ্ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এটি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন থেকে বিচ্যুতির দিকে চালিত করেছে। চালিত করেছে তাঁর জ্যোতির্ময় শব্দাবলী বিকৃতকরণের দিকে এবং উদ্দেশ্যকে বিপথে নিয়েছে। সেই সূত্রে তিনি মনস্থ করেছেন মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চালিত করতে।

মুসলিম সম্প্রদায় পরস্পর বিরোধী ফিরকাসমূহের উপস্থাপন দ্বারা ক্ষতির শিকার হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই মূল পাঠকে এমন কৌশলে ব্যাখ্যা করেছে যাতে তাদের মাজহাবী মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে তুলনামূলক নীতিমালা ও সিদ্ধান্তমূলক মৌলিক আইনবিধি বা ভাষা বা যুক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। এসবের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা সর্বপ্রকার সীমারেখার বাইরে চলে গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, বাতেনপন্থীগণ, যারা অর্থ থেকে শব্দকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং এগুলো নিয়ে এমন এক রাস্তায় চলে গিয়েছে যা যুক্তি বা ঐতিহ্যের দ্বারা বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত।

এ অবস্থারই যুক্তিবাদী দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে মুতাজিলাদের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ব্যাখ্যার ঘরানা গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও ফকিহ্দের মধ্যে থেকে যারা মূলপাঠের (কুরআনের) বিশেষত সুন্নাহ্র ব্যাখ্যাকে তাদের ঘরানার মতবাদের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন, তা তারা করেছিল প্রতারণা ও শঠতার মাধ্যমে। তারা তাদের ঘরানার মতবাদকে উৎস এবং মূলপাঠ (কুরআন ও সুন্নাহ্) কে শাখা প্রশাখা হিসেবে গণ্য করেন। এটা ছিল ভয়াবহ অনুপ্রবেশ। কারণ এটা বাধ্যতামূলক যে, ঘরানা বা মতবাদসমূহকে তাদের সমর্থনে মূলপাঠ (কুরআন ও সুন্নাহ্) এর কর্তৃত্ব ও নির্দেশনা উল্লেখ করতে হবে। তার বাইরে কোনো পক্ষ নেই। মূলনীতি হচ্ছে, যা কিছু ভ্রান্ত বা বিরোধপূর্ণ সেসবের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও নির্দেশনার জন্য অভ্রান্ত/অকাট্যকে নির্ভর করতে হবে :

> এবং যদি তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ তায়ালা ও রসুল-এর কাছে সোপর্দ করো, যদি তোমাদের ইমান থাকে আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাত দিবসের প্রতি (সুর নিসা, ৪ : ৫৯)।

ব্যাখ্যা বা স্পষ্টকরণ অবশ্যই অপরিহার্য, কিন্তু এর নিজস্ব স্থান রয়েছে, নিজস্ব শর্তাদি রয়েছে এবং রয়েছে নিয়ম শৃঙ্খলা। আমরা অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি[৩১]।

কিছু ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার কারণ ছিল মূর্খতা বা অসচেতনমনস্কতা কিংবা আন্দাজ অনুমান। অন্য কথায় মানসিক অলসতা বা জ্ঞানের ঘাটতি। আরেক ধরনের খারাপ ব্যাখ্যা রয়েছে, যার কারণ খামখেয়ালীপূর্ণ প্রচেষ্টা। আহমাদ ইবন হাম্বল রা. এর বর্ণনায় এর একটি উদাহরণ দেখা যায় : মুয়াবিয়া রা.-এর কাছে আম্মার বিন ইয়াসার রা. এর একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছিল বিদ্রোহীদের গোষ্ঠী তোমাকে হত্যা করবে। তখন তিনি আমর আবনুল আস-কে বললেন : যে তাকে নিয়ে এসেছিল সেই হত্যা করেছে, এর অর্থ হচ্ছে আলী রা.। এটা এমন এক ব্যাখ্যা যা প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকেই বাতিলযোগ্য। অন্যথায় আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, নবি সা. নিজেই তার সেনাবাহিনীর শহিদদের হত্যাকারী ছিলেন, যেমন তাঁর চাচা হামজা ও মুসআব বিন উমায়ের এবং অন্যান্যের[৩২]। নিঃসন্দেহে এটা এমন একজনের ব্যাখ্যা যার উদ্দেশ্য ও মানসিকতা শঠতা ও প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ।

ধর্মীয় ও ধর্মতাত্ত্বিক দল-উপদলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল পরস্পরবিরোধী। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজ নিজ ঘরানার মতবাদ সমর্থন করা, তা এমনকি ভণ্ডামি ও স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমেও। আমাদের সময় আমরা এমন কিছু লোককে দেখতে পাই যারা সহিহ হাদিস গ্রহণে বিরুদ্ধভাবাপন্ন, এমনকি মহান কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রেও সুতরাং তারা এগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারে, যা তাদের জন্য অভিনব-অচেনা। এটা তারা করে তাদের আত্মার প্রবৃত্তি ও ভণ্ডামির জন্য। ভণ্ডামি অন্ধ ও বধির করে দেয়।

> আল্লাহ তায়ালার পথনির্দেশ ছাড়াই যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে (সুরা কাসাস, ২৮ : ৫০)?

৩. সুন্নাহ্ ব্যবহারের নীতিমালা

যিনি নবি সা.-এর সুন্নাহ্ কাজে লাগাতে চান, তার জন্য প্রয়োজন মিথ্যা প্রয়োগকারীদের বিকৃতি থেকে একে নিষ্কৃতিদান এবং বিকৃতি দূরীভূত করে

চরমপন্থীদের আঘাত থেকে রক্ষা করা এবং মূর্খদের ব্যাখ্যা থেকে বিমুক্ত করা এবং এই ক্ষেত্রে মৌলিক নীতি বলে স্বীকৃত কতগুলো বিষয়কে আঁকড়ে ধরা।

ক). সুন্নাহ্‌র দৃঢ়তা যাচাইকরণ

এ ধরনের প্রথম নীতি হচ্ছে, মানুষ সুন্নাহ্‌র প্রামাণ্যতা ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করবে তুলনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কষ্টসাধ্য বিন্যাসের মাধ্যমে, যা বিদ্বান বিদগ্ধ আলেমগণ এ ধরনের প্রমাণে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে সনদ ও মতন উভয়ই রয়েছে (একাডেমিক উপকরণাদি ও হাদিসের মূল পাঠ) এবং একইভাবে রয়েছে কাওলি, ফেলি বা তাকরিরি হাদিসসমূহ। পরিশ্রমী গবেষককে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। তারা ছিলেন হাদিসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষক, যারা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন এর অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে, কলুষিত থেকে বিশুদ্ধকে পৃথককরণে এবং বাতিল থেকে গ্রহণযোগ্য নির্ণয়ে।

> এবং কেউই তোমাদেরকে সর্বজ্ঞ [একজন] আল্লাহ্ তায়ালার মতো খবর জানাতে পারবে না (সুরা ফাতির, ৩৫ : ১৪)।

আলেমগণ হাদিসের জন্য এর মূলের সাথে সুপ্রোথিত এবং এর শাখা প্রশাখার সাথে সুবিন্যস্ত একটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা হাদিসের নীতি (উসূলে হাদিস) বা হাদিসের বাগধারা ও শব্দকোষ (মুসতালাব আল-হাদিস) এর বিজ্ঞান। এটি হাদিসের জন্য সে ভূমিকা রাখে, যা পালন করে উসূল এর ফিকহ্‌র জন্য ফিকহ্ ক্ষেত্রে ঘটনার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে শৃঙ্খলার সমাহার। ইবন আল-সালাহ্ এগুলোকে ৬৫টি প্রকরণে বিন্যস্ত করেছেন। তারপর অন্যরা এর সাথে যোগ করেছেন যতদিন না আল-সুয়ুতী (তাঁর গ্রন্থ তাদরীব আল-রাবি আলা তাকরীব আল-নবাবী) এগুলোকে কমবেশি ৯৩ প্রকরণে বিভক্ত করেন।

এটি সুবিদিত যে, উসূল আল–হাদিস সংক্রান্ত বিজ্ঞানে কিছুসংখ্যক প্রশ্নে ঐকমত্য হয়েছে এবং কিছু প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণের কর্তব্য হচ্ছে : বিবাদপূর্ণ বিষয়ে নীরব থাকা এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভারসাম্য অনুযায়ী অগ্রাধিকার প্রদান করা।

এক্ষেত্রে উম্মাতের সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়ের দীপ্তিময় যুগে আমাদের পূর্বসূরীগণের উপস্থাপনকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে চাই। এরা অবস্থান করবেন পরবর্তী আলেমগণের ঊর্ধ্বে। এমনটা করব, কেন না পূর্বসূরীগণ হাদিসের দুর্বলতা দূরীকরণে অধিকতর কঠোর ও সাহসী ছিলেন এবং পরবর্তীদের চেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছিলেন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

তারা এই বিজ্ঞানে কয়েকটি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

i. যিয়াদাত আল-ছিকাহ ফি আল-হাদিস : নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক হাদিসের মধ্যে সংযোজন করা। এরকম একজন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত বিষয়ে সংযোজন গ্রহণ করা যাবে কতদূর পর্যন্ত?

ii. তাকভিয়্যাতু আল-হাদিস বি-তা'আদ্দুদি আল-তুরুকি আল-জযায়িফাহ : বর্ণনান্তরের মধ্যে দুর্বল পথ যোগ করে হাদিসকে শক্তিশালী করা। এই সংযোজন দ্বারা কোন হাদিস শক্তিশালী হয়েছে? এক ব্যক্তি এ ধরনের সংযোজনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের দুর্বলকে ব্যবহার করবে?

iii. হাদিস মাওকুফ : যখন বর্ণনার পরম্পরা সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখানেই সমাপ্ত হয়, রসুল সা. পর্যন্ত পৌঁছে না, তখন এটাকে মারফু (যেন এটা খোদ রসুল হতেই) বলে গ্রহণের প্রশ্ন দেখা দেয়, যেখানে এর বিষয়বস্তু এমনই যে, মতামত (রায়) দেওয়ার কেনো সুযোগ নেই[৩৩]। তবে কোনো কোনো আলেম স্বাধীনতা দিয়েছেন এমন হাদিসের ক্ষেত্রে, যেখানে মতামতের সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে[৩৪]।

iv. মাদমূন : হাদিসের বিষয় অধ্যয়ন অথবা (পরিভাষাগতভাবে) এর মতন বা ভাষ্য অথবা এর বর্ণিত বিষয়াদি। এর যতটুকু আমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের সময়কালের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী গ্রহণ করেছিলেন, তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে।

খ). সুন্নাহ্ উপলব্ধিকরণে দক্ষতা

দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে : নবি সা.-এর বাণীকে বুঝতে হলে ব্যক্তির প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে। এটাকে বুঝার অর্থ হচ্ছে : বাণীর ভাষায় যে অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা একীভূত হওয়া। হাদিসের পথনির্দেশ (সাধারণ উদ্দেশ্য), এর বিশেষ পরিস্থিতি ও লক্ষ্য, পর্যায়ক্রমে কুরআন ও রসুল সা.-এর সমর্থন এবং সাধারণ নীতিমালা ও ইসলামের উদ্দেশ্যের সামগ্রিকতার কাঠামো বিচার্য হবে।

ইসলামের মহান বিদ্যাবত্তার অধিকারী, ভারতের আহমাদ ইবন আবদুর রহীম, যিনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ (মুহাদ্দিস) আল দিহলভী (মৃত্যু : ১১৭৬ খ্রি.) নামে অধিক পরিচিত, তার মতানুযায়ী এসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার প্রচারের পথ ধরে যা কিছু

এসেছে এবং এপথে যা কিছু আসেনি, তার পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা যায় (আমাদের শিক্ষক, আল-আযহারের প্রাক্তন শায়খ মাহমুদ শালতুত এর মতে)। এই পার্থক্যেকে ভিন্ন পথে প্রয়োগ করা যায় যা আইন প্রণয়ন কারী সুন্নাহ্‌ এবং যা আইন সংশ্লিষ্ট সুন্নাহ্‌ নয় তার অংশ; আইন বিষয়ক সুন্নাহ্‌র মধ্যে সাধারণ ও স্থায়ী উপাদান রয়েছে এবং বিশেষ ও সময় নিয়ন্ত্রিত গুরুত্ব রয়েছে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, সুন্নাহ্‌ বুঝার ব্যাপারে তারই মধ্যে ত্রুটি রয়েছে (আল-আফাত)।

সুন্নাহ্‌ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফল হিসেবে এসব ত্রুটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু উপলব্ধির ভুলের পরিণাম হিসেবে এটা ইতোমধ্যেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রত্যয়িত হয়েছে। এই ভুল একটি প্রাচীন রোগ, এটা সুন্নাহ্‌কে সেইভাবে স্পর্শ করেছে যেভাবে করেছে কুরআনকে। বিদ্বানগণের মধ্য থেকে সত্যানুসন্ধানীগণকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে বুঝার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

গ). শক্তিশালী বিধায় মূল পাঠই বিরোধমুক্ত

তৃতীয় নীতি হচ্ছে : বিরোধ থেকে আমরা মূল পাঠের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি এর চেয়ে শক্তিশালী কিছু দ্বারা। অনেক শক্তিশালী হলো, কুরআনের মূলপাঠ কিংবা অন্যান্য হাদিস যেগুলোর প্রচুর উৎস রয়েছে কিংবা বিশুদ্ধতার ব্যাপারে অধিকতর স্পষ্ট অথবা প্রকৃত নীতি (উসূল)র সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথবা আইন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহের উদ্দেশ্যের অধিকতর নিকটবর্তী অথবা এটি আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে যা। কারণ এগুলো এক অথবা দুটি টেকসই কিছু হতে উদ্ভূত নয়, বরং তাদের প্রমাণের বিশুদ্ধতাসহ সুনির্দিষ্টতা ও নিশ্চিয়তা অর্জন করেছে।

এটি উসূলে ফিকহ এবং উসূলে হাদিস উভয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনী ইস্যু হিসেবে সম্পৃক্ত (সাক্ষ্য প্রমাণের ভারসাম্যগত বিরোধ ও প্রমাণাদি)। বাহ্যিক রূপে মূলপাঠ কোনো কোনো সময় পরস্পর বিরোধী হয়, কিন্তু তাদের বাস্তবতা পরস্পরবিরোধী নয়। ফকিহ বা আলেম ব্যক্তির জন্য মূলপাঠ একত্রিত করে যেখানে সম্ভব বিরোধী দূরীভূত করা অত্যাবশ্যক। অথবা এতে ব্যর্থ হলে সাক্ষ্যের ভারসাম্য বিচার করা বাঞ্চনীয়।

তাদরীব আর-রাবি গ্রন্থে আল-সুয়ূতী বলেন যে, সাক্ষ্যের ভারসাম্য একশ প্রকারেরও অধিক।

আইন প্রণয়ন ও নির্দেশনার উৎস

ইসলামের আইন প্রণয়ন ও নির্দেশনার ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। ফকিহ্গণ এদিকেই আলোকপাত করেন আইনী আদেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। একইভাবে প্রচারক ও শিক্ষকগণও এমন করেন এর থেকে উৎসাহব্যঞ্জক অর্থ, মূল্যবান নির্দেশনা এবং গভীর জ্ঞান বের করার জন্য। সেই সাথে লোকদেরকে কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং অকল্যাণের কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য।

সুন্নাহ্ যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করতে পারে সেজন্য যে কোনো ব্যক্তি অবশ্যই একে অধিকতর মূল্য দেবে রসুল সা. হতে উৎসারিত বলে প্রমাণিত হলে। এটা হাদিস বিজ্ঞানের বাগধারার মধ্যে সহিহ (বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য) বা হাসান (উত্তম) হাদিসরূপে সত্যায়িত। সহিহ হচ্ছে অতি উত্তম বা খুব ভালো (যেহেতু এমন শব্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য বোধগম্য); হাসান হচ্ছে ভালো যা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের। এর বাইরে হাসান-এর উচ্চতর পর্যায়কে 'সহিহ'র কাছাকাছি গণ্য করা হয়; একইভাবে এর নিম্নতর পর্যায়কে যঈফ (দুর্বল) এর নিকটতর বিবেচনা করা যায়।

সহিহ হাদিস এমন হাদিসকে বলা হয় যার বর্ণনাকারী তার সততার জন্য সুপরিচিত এবং অন্য বর্ণনাকারী থেকে শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তার পূর্ণতার জন্যও। এটা হতে হবে সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এর মধ্যে কোনো শূন্যতা বা বিচ্ছিন্নতা থাকবে না এবং যখন তা রসুল সা.-কে সংযুক্ত করবে। একটি সহিহ হাদিস অনিয়ম ও ত্রুটি থেকেও মুক্ত।

এভাবে কেউ ঐ হাদিসকে গ্রহণ করবে না যা অপরিচিত উৎসের কোনো বর্ণনাকারী বা তার অপরিচিত অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, কিংবা যার সততা বা সংরক্ষণে পূর্ণতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, বা যদি তার সাথে অন্য বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতায় বিচ্ছিন্নতা কিংবা শূন্যতা থাকে। কিংবা তার দ্বারা বর্ণিত হাদিসটি অনিয়মিত হয়, যার ফলে সেটা তার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কারো নির্ভরযোগ্য বর্ণনার বিরোধী হয়, অথবা ঐ হাদিসে যদি ত্রুটির কোনো চিহ্ন থাকে কিংবা অন্যকিছু আপত্তিকর থাকে এর সনদ বা এর মতনে (মূলপাঠের প্রতিবেদন থাকলে)।

যে লোকেরা তা পৌঁছে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কারো যেন এমন ধারণা না থাকে যে, উম্মহের আলেমগণ এমনকিছু গ্রহণ করেছেন, তা তাদের কাছে নিয়ে যেই আসুক না কেন, যেমন কেউ তাদের কাছে এসে বলল 'অমুক এবং অমুক থেকে অমুক এবং অমুক, তারপর আল্লাহর রসুল থেকে এবং তার উত্তর দিলেন : তুমি সত্য বলেছ!

বরং প্রকৃত কথা হচ্ছে, যারাই তাদের কাছে হাদিস নিয়ে এসেছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই তারা অবশ্যই কতকগুলো প্রশ্ন রেখেছেন : (ক) তিনি কোন ঘরানার আলেম বা ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত? (খ) তার শিক্ষক কারা? (গ) তার সহপাঠী ছাত্র কারা, হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় কে তার সাথে ছিলেন? (ঘ) তার শিক্ষক, সঙ্গীসাথী ও ছাত্রদের দৃষ্টিতে তার চরিত্র ও আচরণ কেমন? (ঙ) লোকেরা কি তার সততা ও তার আল্লাহ তায়ালাভীতি (তাকওয়া) সত্যায়ন করে থাকে? (চ) সংরক্ষণে কি ধারাবাহিকতা রয়েছে? (ছ) তিনি কি জীবনভর এটা অব্যাহত রেখেছেন অথবা জীবনের শেষ বছরগুলোতে পরিবর্তন করেছেন? (জ) তার বৃদ্ধ বয়সে তার ছাত্রদের মধ্যে কে কে তার কাছে পড়াশোনা করেছেন এবং (ঝ) তার পরিবর্তনের পূর্বে কে তার অধীনে অধ্যয়ন করেছেন? এবং এভাবে আরো।

উম্মাহর বিশিষ্ট আলেমগণ একমত হয়েছেন, যেসব হাদিস আমলের ক্ষেত্রে আইনী হুকুম হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়, যা ফিকহশাস্ত্রের স্তম্ভ বিশেষ এবং হালাল ও হারামের ভিত্তি, সেগুলোকে অবশ্যই সহিহ বা হাসান হতে হবে। তবে, যেসব হাদিস আমলের উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত বা দোয়া, যা হৃদয়কে নরম করে, তারগিব (আল্লাহ তায়ালার প্রতি স্পৃহা বৃদ্ধি করে) বা তারহিব (আল্লাহ তায়ালার ভয় বৃদ্ধি করে) এবং এধরনের অন্য কিছু, যেগুলো অবিসংবাদিতভাবে আইন প্রণয়নের শিরোনামে আসে না, সেগুলোর ব্যাপারে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রাথমিক যুগের বিদ্বান আলেমগণ (সালাফ) এর মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন, যাদেরকে এই ধরনের বর্ণনার হাদিস থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং এগুলো প্রচারে কোনো ক্ষতি লক্ষ্য গোচর হয়নি। তবে এই অব্যাহতি নিরঙ্কুশ নয়, যেমনটা কেউ কেউ মনে করেন। বরং এর জন্য ক্ষেত্র ও যুক্তি রয়েছে। তবে, অনেকেই এই অব্যাহতির মানের অপব্যবহার করেছেন (কারণ হাদিসগুলো আইন দ্বারা স্থিরীকৃত আমলের সাথে জড়িত নয়), তাই সরল পথের উল্টো এবং দুষ্ট লোকেরা নির্ভেজাল ইসলামের প্রশস্ত পথকে দূষিত করেছে।

বাণী প্রচারের কিতাবাদি যা কিছু অন্তরকে কোমল করে, সুফিবাদের গ্রন্থসমূহে এই সব ধরনের হাদিস প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তবে, আমরা এই মত পোষণ করি যে, এগুলোর অধিকাংশই দুর্বল ও অশুদ্ধ হাদিসে ভারাক্রান্ত। বরং বলা যায়, এসব পুস্তকে এমন উক্তি অনুসরণ করা হয়েছে যার কোনো উৎস বা সনদ নেই, এগুলোর মধ্যে কতকগুলো এমন যা বিরোধপূর্ণ এবং আল্লাহর রসুল সা.-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। মুহাদ্দিসগণ এসব হাদিসের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এবং এমন গ্রন্থ সংকলন করেছেন যা স্পষ্টভাবে ওদের কৃত্রিমতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

মুহাদ্দিসরা এধরনের দুর্বল বা মিথ্যা বর্ণনা নিষিদ্ধকরণে সর্ববাদীসম্মত মতে উপনীত হয়েছেন, তাদের (ব্যক্তিগত) মিথ্যাচার ও অসারতা উন্মুক্ত করা ব্যতীত। তাদের কাজের ফলে সর্বসমক্ষে এগুলোর আর কোনো প্রচার হয়নি।

একই ধরনের অসার ও বাতিল বর্ণনা তাফসিরের অনেক কিতাবেই দেখা যায়, এটা এমন হয়েছে যে, তারা অভ্যাসবশতই এসব কুখ্যাত জাল বর্ণনা কুরআনের নির্দিষ্ট সুরাসমূহের ক্ষেত্রে করেছে। তারা এমনটা করেছে এমনকি 'হাদিস বিশেষজ্ঞ (হুফ্‌ফায) গণ এর দুর্বলতা প্রকাশ এবং অসারতা ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও, যাতে পরবর্তীতে কেউ এসব বর্ণনা করতে কিংবা তার বইয়ের পৃষ্ঠাসমূহ এর দ্বারা মসীলিপ্ত করতে না পারে। এতদসত্ত্বেও আল-যামাখশারী, আল-সা'আলিবী, আল-বায়যাভী, ইসমাঈল হাক্কী প্রমুখ মিথ্যা হাদিস উপস্থাপনের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

জাল হাদিসের পক্ষে প্রদত্ত অপযুক্তি খণ্ডন

এ ধরনের জাল হাদিস উপস্থাপনার চেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে একজন কুরআনের ভাষ্যকার খুঁজে বের করা। উদাহরণস্বরূপ, রূহ আল-বায়ান-এর রচয়িতা হাদিস উদ্ধৃতকরণকে যুক্তিসম্মত করতে এবং তা রক্ষা করতে ইচ্ছুক। এই গ্রন্থকার, সুরা আত-তাওবার তাফসিরের শেষের দিকে বেপরোয়াভাবে বর্ণনায় এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন একথা বলে :

জেনে রাখুন, আল-কাশ্‌শাফ এর গ্রন্থকার এই সুরার শেষে যা উদ্ধৃত করেছেন সেসব হাদিস সম্পর্কে (এবং আল-কাযী আল-বায়যাভী এবং আল-মাওলা আবু আল-সা'উদ তাকে অনুসরণ করেছেন [একাজে], আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে দয়া করুন, যারা কুরআনের ভাষ্যকারদের প্রধান), বিদ্বান আলেমগণ প্রায় আলোচনায় (থাকতেন) [এবং মতবিরোধেও] কোনো কোনো পণ্ডিতের সাথে যারা (ঐসব হাদিস) প্রত্যয়ন করতেন, অন্যরা তা মিথ্যা হওয়ার ভিত্তিতে বাতিল করতেন, ইমাম আল-সাঘানী এবং অন্যদের মতো।

এই হতভাগ্য আল্লাহ্ তায়ালার বান্দার জন্য যা দৃশ্যমান, তার জন্য যা প্রাপ্য তাতে আল্লাহ তায়ালা দয়া করুন, তা হলো ঐ হাদিসসমূহকে হয় বিশুদ্ধ না হয় শক্তিশালী হতেই হবে, অথবা হতে হবে দুর্বলকৃত বা দুর্বল, অথবা মিথ্যা বা বানোয়াট।

যদি ঐগুলো বিশুদ্ধ ও সবল হয়, তাহলে ওগুলোর ব্যাপারে কোনো আলোচনা [যথাযথ ও প্রয়োজনীয়] নয়। কিন্তু যদি ওগুলোর সনদ দুর্বল হয় তখন হাদিসবেত্তাগণ একমত যে, দুর্বল হাদিসের উপর তারগিব ও তারহিবের জন্য কাজ

করা অনুমোদিত, যেমনটা আল-নব্বী'র আল-আযকার, আলী ইব্‌ন বুরহান আল-দীন আল-হালাবী'র ইনসান আল-উয়ূন এবং ইবন ফখর আল-দীন আল-রুমী'র আল-আসরার আল-মুহাম্মাদীয়্যা এবং অন্যান্য (কিতাব)।

ঐগুলো যদি জাল করা হয়, সে ক্ষেত্রে আল-হাকিম ও অন্যরা উল্লেখ করেন যে, সাধকদের মধ্য হতে একজন লোক কুরআন এবং এর সুরাসমূহের পবিত্রতার ওপর কিছু হাদিস রচনার দায় গ্রহণ করেন এবং এরপর তার কাছে বলা হলো : আপনি কেন এটা করেন? সে বলল, আমি দেখলাম লোকদেরকে কুরআন অস্বীকার করতে এবং আমি ইচ্ছা করলাম তাদেরকে এর প্রতি উৎসাহিত করতে। তখন তাকে বলা হলো, নবি সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি কোনো মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল। তারপর সে বলল, আমি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিনি; বরং আমি তাঁর সা. জন্য মিথ্যা বলেছি।

সে ব্যক্তি বুঝাল : তাঁর সা. বিরুদ্ধে ঐ মিথ্যাচার নিয়ে গেছে ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংসের দিকে এবং তুচ্ছ প্রতিপন্ন করেছে হুকুম আহকাম ও বিধিবিধানকে এবং এটা অন্যটির জন্য মিথ্যা বলার মতো নয়। অর্থাৎ তাঁর জন্য মিথ্যা বলা হচ্ছে তাঁর আইন অনুসরণে উৎসাহিতকরণ এবং তাঁর পথে বা তাঁর গতিপথে চলার জন্য। শাইখ 'ইয্‌য আল-দীন ইবন আবদুস সালাম বলেন : কথা বলা হচ্ছে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়। অতঃপর প্রত্যেক প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যে লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে দুটোর যেকোনো একটির সাহায্যে-সত্য [বলা] এবং মিথ্যাচার [করা]। মিথ্যাচার [করা] নিষিদ্ধ। অতঃপর যদি মিথ্যাচার করে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় এবং সত্য বলে তা সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা বৈধ (মুবাহ)। শর্ত, ঐ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অনুমতি থাকতে হবে এবং এটা বাধ্যতামূলক [ওয়াজিব] হবে, যদি লক্ষ্য বাধ্যতামূলক হয়। সুতরাং এটা হচ্ছে এ ধরনের অবস্থার নিয়ন্ত্রক নীতি।

এখানে আমরা সাহায্য করতে পারি না, কিন্তু একথা বলে আমাদের বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারি-লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন : আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কারো কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই এবং আমরা আল্লাহ তায়ালারই জন্য এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ তায়ালার কিতাবের ভাষ্যকার হিসেবে একজন স্বেচ্ছাতালিকাভুক্ত ব্যক্তি থেকে এই প্রবন্ধ পুস্তকের মতোই আরেকটি পুস্তক প্রকাশিত হয় ঔদ্ধত্যের সাথে, নীতিবহির্ভূতভাবে। কোনো কোনো লোক তাকে ফকিহ (আইনবিদ যিনি ইসলামের

আইনকানুন বুঝেন) এবং উসূলী (ফিকহ'র উসূল বা নীতির ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) বলে বর্ণনা করেন! কিন্তু কি ধরনের অভিজ্ঞতা (ফিকহ) এই লোকটির রয়েছে, প্রকৃত আলেমদের মতে, প্রাথমিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই যে অজ্ঞ? এই শেখ (তার একটি সুফি ঝোঁকপ্রবণতা রয়েছে) জানে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা এই দ্বীনকে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং সেহেতু আমাদের ওপর তাঁর নিয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন, সুতরাং আমরা কোনো প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি না যে, কেউ আমাদের জন্য নিজ থেকে হাদিস বানিয়ে এটাকে পরিপূর্ণতা দান করবে। যদি বলা হয় যে, সে স্পর্ধা দেখায় আল্লাহ্ তায়ালাকে সংশোধন অথবা তাঁর রসুল সা. কে শক্তিশালী করার জন্য; ফলত : সে রসুল সা. কে বলে : 'আমি আপনার জন্য মিথ্যা বলি যাতে আপনার দ্বীনের সীমাবদ্ধতা পরিপূরণ করা যায় এবং আমার তৈরি করা হাদিস দ্বারা এর শূন্যতা পূরণ করি।

ইবন আবদুস সালামের বক্তব্য অনুযায়ী এটা গ্রহণ করা হয়েছে পুরাপুরি অপ্রাসঙ্গিকভাবে। যা কিছু এটা অনুমোদন করে তা হলো নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট ধরনের কথা, যেমন, যুদ্ধে চাতুর্য অবলম্বন এবং দুই দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং অত্যাচারীর কাছে থেকে পলায়মান ব্যক্তিকে সহায়তা দেওয়া এবং ঐ ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা যা এ প্রসঙ্গে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেকোনো ক্ষেত্রে ইবন আবদুস সালামের বক্তব্য নিজেই এই দাবিদারের দাবিকে খণ্ডন করে। কারণ ইবন আবদুস সালাম বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক প্রশংসামূলক লক্ষ্য যা সত্য এবং মিথ্যা উভয় ধরনের কথা বলেই অর্জন করা যায়, সেক্ষেত্রে মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ। সুতরাং এখানে এই আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি বলতে পারেন- যদি সব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য যা জাল হাদিস দ্বারা প্ররোচিত এবং সকল অস্বীকৃত লক্ষ্য যা হতে তারা নিবৃত্ত হয়েছে, সেগুলো নিঃসন্দেহে সহিহ ও হাসান হাদিস দ্বারা অর্জনের যোগ্য, তাহলে মিথ্যাচার নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে বিরাট বিরাট পাপের মধ্যে সর্ববৃহৎ।

সহিহকে প্রত্যাখ্যান করা জালকে গ্রহণ করার সমান

বাতিল ও জালকৃত হাদিস গ্রহণ এবং তা রসুল সা.-এর সাথে জুড়ে দেওয়া একটি বড় অপরাধ। সেটা ঘটে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর চেয়ে বেশি জানার উদ্ভট দাবি ও অহংকার থেকে। এমন কাজ একটি মন্দ অনুমানকে উম্মাহর জন্য অনিবার্য করে তোলে; এর আলেমগণ, এর সর্বোত্তম যুগের নেতৃবৃন্দ এবং মহান শীর্ষ ব্যক্তিগণের জন্যও। অতীত কালে জনগণের বৃহদাংশে দুর্বল ও জাল হাদিস গ্রহণের প্রবণতা ছিল। বর্তমান সময়ে, সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই কোনো

জ্ঞান, কোনো নির্দেশনা (হিদায়াত) এবং কোনো আলোকিত গ্রন্থ ছাড়াই প্রমাণিত হাদিসসমূহ বর্জন বা বাতিল করার প্রবণতাসম্পন্ন। আমরা সাধারণ লোকজন বলতে অশিক্ষিত এবং তাদের মতো লোকদের বুঝাচ্ছি না- কারণ তারা (সাধারণ লোকেরা) ঐ লোকদের মতো নয় যারা ঠিকমতো না জেনেই নিজেদের জ্ঞানী বলে জাহির করে। আমরা সাধারণ লোক বলতে বুঝিয়েছি কেবলমাত্র আত্মম্ভর ও প্রতারক লোকদেরকে-যারা কখনও দরজা দিয়ে বাড়ির বাইরে বের হয় না (অর্থাৎ যারা ঘোরপ্যাঁচ ও জটিলতা পছন্দ করে), যারা কখনও সূত্র উল্লেখ করে জ্ঞানকে শক্তিশালী করে না, যারা জ্ঞানের খোসার দিক জানে, মধ্যম পর্যায়ের সূত্র থেকে হাতিয়ে নেয়, অথবা প্রাচ্যবিদ ও মিশনারী বা তাদের মতো লোকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সহিহ হাদিসকে বাতিল করা দ্বীনের মধ্যে বাতিল হাদিসকে গ্রহণ করার মতো।

যা দ্বীনের নয় সেই মিথ্যা হাদিস এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে; বিশুদ্ধ হাদিসকে প্রত্যাখ্যান দ্বীনকে তার মূল থেকে বের করে নেয়। নিঃসন্দেহে, উভয়ই নিন্দনীয় ও একইভাবে তিরস্কারযোগ্য।

সুন্নাহ্‌র পুরাতন শত্রুদের সন্দেহ

প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী ও উদ্ভাবকগণ সুন্নাহ্‌কে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে সন্দেহ ও অভিযোগ উত্থাপন করে আসছে। বিদ্বান আলেমগণ ও সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিগণ তাদেরকে পর্যদস্ত ও হতাশ করার জন্য তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন একজন বিদ্বান আলেম ছিলেন আল-শাতিবী।

ইমাম আল-শাতিবী বলেন : বিরুদ্ধবাদী উদ্ভাবকদের বিদ্রোহের মধ্যে [নির্দিষ্ট] উপদলগুলো একসময় হাদিস প্রত্যাখ্যানকে বৈধতা দেয় [এই যুক্তি দ্বারা] যে, তারা ঐগুলো পেয়েছে তাদের অনুমানের মধ্যে এবং এটাকে কুরআনে ভৎর্সনা করা হয়েছে-যেমন রয়েছে মহীয়ান আল্লাহ তায়ালার কালামে :

> তারা তো অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে (সুরা নাজম, ৫৩ : ২৩)

এবং

> তারা কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করছে এবং প্রকৃত সত্যের মোকাবেলায় অনুমান কোনোই কাজে আসে না (সুরা নাজম, ৫৩ : ২৮)।

এবং [অন্য সুরায়] এর অর্থ এসেছে [তারা যুক্তির এই অবস্থানে এসে অতিশয়োক্তি করে] ঐ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুল সা.-এর জবানে যা নিষিদ্ধ করেছেন,

যদিও কুরআনের মূলপাঠে তা নিষিদ্ধ হয়নি। তাই তারা এর অনুমতি দিয়েছে। তারা তাদের মনের কিছু ধারণাকে গ্রহণীয় করার জন্য এটা করেছে।

এই সব আয়াতে এবং হাদিসেও অনুমান বলতে তাই বুঝানো হয়েছে, যা তাদের ওজর বা দাবি ছিল। আমরা দেখেছি যে, এর তিনটি উপায় আছে :

প্রথমত দ্বীনের উসূল (মূলনীতি বা বুনিয়াদ) সম্বন্ধে অনুমান। আলেমদের মতে এর কোনো প্রয়োগ নেই, কারণ সত্যের সম্ভাব্য বিরোধিতা করা হয়েছে অনুমানকারীর অনুমানে। সংজ্ঞানুযায়ী অনুমান হয় সত্য না হয় মিথ্যা; এর মিথ্যা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা একে আইনের বুনিয়াদ তৈরিতে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। 'ফুরূয়ি' [আইনের শাখা বা আইন থেকে উদ্ভূত বিষয়াদি] ব্যাপারে অনুমান ভিন্ন বিষয়। কারণ, আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সাক্ষ্যদ্বারা প্রদর্শনের ফলে কার্যকর হয়। সুতরাং ফুরূয়ি বিষয় না হলে অনুমান নিন্দনীয় এবং এটা বিদ্বান আলেমগণ উল্লেখ করেছেন [অর্থাৎ তারা আইনের বিশদ আলোচনার ক্ষেত্রে শর্তযুক্তভাবে অনুমানের ভূমিকা অনুমোদন করেছেন, এর মূল বিষয়াদির ক্ষেত্রে নয়]।

দ্বিতীয়ত, দুটি পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনার মধ্যে অনুমান [একটির জন্য] কোনো প্রকার প্রদর্শনী ছাড়াই অন্যটিকে অগ্রাধিকার দেয়। [সেখানে] কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি নিন্দনীয়, কারণ এটি একটি এক তরফা রায়। ঐ কারণে এই আয়াতে অনুমান নিজ প্রবৃত্তি'র অনুসারী বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণী : তারা তাদের অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তারা সংস্কার ও খেয়ালখুশি ছাড়াই কোনো বিষয়ে ঝুঁকে পড়ে। যে অনুমানের পর্যায়গুলো প্রদর্শিত হয় তা ভিন্ন। তারপর তা [ঘটনাসমূহের] সাধারণত্বের ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয়, কারণ এটা নিছক খেয়াল খুশির জন্য বেরিয়ে আসে। ঐ কারণে, এটা নিশ্চিত করা হয় এবং কার্যকর হয়, এর চাহিদামতো, যখন এটা কাজের উপযুক্ত মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফুরূয়ির ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে থাকে।

তৃতীয়ত, অনুমান দুই রকমের হয় : [১] ঐ সমস্ত অনুমান যা সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর নির্ভরশীল। এগুলো হচ্ছে সেই অনুমান, যেগুলো প্রয়োজনমতো আইনের ওপর কাজ করে, কারণ এ ধরনের অনুমান একটি সুপরিচিত নীতির ওপর নির্ভরশীল এবং এটা সেই শ্রেণিভুক্ত যা সুবিদিত এবং [২] এমন অনুমান যা সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটি নীতি ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল এবং এটি নিন্দনীয়। যদি এটা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়, যা এর মতোই অনুমান এবং যদি ঐ অনুমানও সুনির্দিষ্ট নীতির ওপর ভিত্তিশীল হয়, তাহলে তা পূর্বের মতোই।

অন্যদিকে যদি অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে তা হবে নিন্দনীয় বা বর্জনীয়।

সুতরাং পূর্বের সকল সংশ্লিষ্টতা দ্বারা বিশুদ্ধ সনদের অধিকারী একটি এক প্রতিবেদনের জন্য যা আইনে সুনির্দিষ্টতা সম্পন্ন নীতির ওপর নির্ভরশীল, এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং তাই আমরা এটি অবিমিশ্রভাবেই গ্রহণ করি। একইভাবে, যেহেতু অবিশ্বাসীদের অনুমানসমূহ কোনো কিছুর ওপরেই ভিত্তিশীল নয়, তাই মানুষ তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করবে এবং এদের যোগ্যতা অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত হবে। এই শেষ সাড়া ধার নেওয়া হয়েছে একটি প্রকৃত জিনিস থেকে যা কিতাব আল-মুওয়াফাকাত এর মধ্যে রয়েছে এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই জন্য।

ওদের মধ্যে কিছুসংখ্যক নিশ্চিতরূপে এই হাদিস প্রত্যাখ্যানে বিপথগামিতায় বহুদূরে চলে গেছে। তারা তাদের মতামত বাতিল করেছে যারা হাদিসে যা আছে তাতে আস্থাশীল হয়। ততদূর পর্যন্ত অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে যেমন যুক্তির বিরোধিতা এবং সেই ব্যক্তিকে দায়ী করেছে যিনি এটাকে সম্পূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত বলেছেন।

আবু বাকার ইবনুল আরাবি কিছু লোকের বর্ণনা দিয়েছেন, যাদের সাথে তিনি পূর্ব দেশে সাক্ষাৎ করেছেন, যারা রুইয়া (ইমানদারদের জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ লাভ) অস্বীকারকারী। এটা একজন রুইয়া অস্বীকারকারীকে বলা হয়েছিল : যিনি আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে দৃঢ়ভাবে [নিশ্চয়তা সহকারে] বিশ্বাস করে তার ওপরে অবিশ্বাস আরোপ করা যায় কি না? তখন এই অস্বীকারকারী বলল : না! কারণ সে যা বলেছে তা যুক্তির বিচারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং যুক্তির দ্বারা অগ্রহণযোগ্য বিষয় যেই বলুক, সে অবিশ্বাস করেনি। ইবনুল আরাবি বলেন : তাহলে এটাই হচ্ছে তাদের মতে আমাদের মর্যাদা [অর্থাৎ তারা আমাদেরকে পাগল ভাবে]। অতএব ভাগ্যবানদেরকে চিন্তা করতে দেওয়া হোক তারই ওপর, যেদিকে প্রবৃত্তি চালনা করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা এসব থেকে তার দয়া দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করুন[৩৬]।

তা'বীল মুখতালিফ আল-হাদিস নামক গ্রন্থে ইবনে কুতায়বা অনেকগুলো আপাতসত্য সন্দেহ সাধারণভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন, যেগুলোতে সুন্নাহ্‌র শত্রুরা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তিনি ঐগুলো বাতিল করেছেন আপাতসত্য সন্দেহ দ্বারা আপাতসত্য সন্দেহকে, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্ত হননি যতক্ষণ না তাদের আগুন ছাই হয়েছে।

সুন্নাহ্‌র নতুন শত্রুদের সন্দেহ

আমাদের সময়ে সুন্নাহ্‌র নতুন শত্রুদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের কেউ কেউ আমাদের দেশের বাইরের মিশনারী ও প্রাচ্যবিদদের মতো। অন্যরা আমাদের দেশের, যাদেরকে মিশনারী ও প্রাচ্যবিদগণ শিক্ষা দান করেছে অথবা তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এইসব লোক সুন্নাহ্‌র পুরাতন শত্রুদের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করেছে এবং এর সাথে বর্তমান সংস্কৃতির আশীর্বাদধন্য অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত করেছে। তারা এগুলোকে এবং ওগুলোকে সুন্নাহ্ ও এতদ্‌সংক্রান্ত বইপুস্তক, এর বর্ণনাকারীগণ এবং এর পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল ও তাদের পদাতিক সৈন্যবাহিনী বলে অভিহিত করে। এসব ক্ষেত্রে তারা ক্ষমতা ও কূট রাজনীতির স্থান ও প্রতিষ্ঠানকর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে আল্লাহ তায়ালা সমসাময়িক আলেমদের মধ্য থেকে সুন্নাহ্‌র জন্য অবিসংবাদী সত্যতা ও পক্ষাবলম্বনকারী যুক্তি উপস্থাপনকারী এমন ব্যক্তিদের প্রেরণ করেছেন, যারা নাস্তিকদের শোবাহ সন্দেহ এবং তাদের প্রবৃত্তির খামখেয়ালী ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

> অতএব প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল, তারা যা সাজিয়েছিল তা নিষ্ফল হয়ে গেল; তারা সেখানে পরাজিত হলো এবং হীনতা মাথায় নিয়ে ফিরে গেল (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১১৮-১১৯)।

কুরআনের হিদায়াতে তৃপ্ত থাকা

সুন্নাহ্‌র শত্রুদের সন্দেহের মধ্যে, যা তারা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে, অন্যতম হচ্ছে সেই দাবি, যাতে বলা হয় সুন্নাহ্ ছাড়াই কুরআন যথেষ্ট, এই বাস্তবতা বিবেচনায় যে, এতে সবকিছু বিশদ উপস্থাপিত হয়েছে, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> আমি তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯)।

তিনি বলেন :

> এদের কাহিনীতে বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এ কুরআন কোনো বানোয়াট গল্পকাহিনী নয়, বরং তাদের পূর্বে আগত কিতাবের প্রত্যায়নকারী, আর যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে সমৃদ্ধ এবং মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথের দিশারি ও রহমত (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১১১)।

তারা এই দাবিও পেশ করে, কারণ তারা বলে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য কুরআনের হেফাজত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেছেন, কিন্তু সুন্নাহ্ সম্পর্কে তা নেই।

এ দাবির জবাব এই যে, সুন্নাহ্ হচ্ছে নিঃসন্দেহে কুরআনের স্পষ্টকরণ। এটা তাই যা কুরআনে বর্ণিত সংক্ষিপ্তকে বিস্তারিত করে, এর মধ্যে সাধারণকে চিহ্নিত করে এবং এর মধ্যে যা অবিমিশ্র তা বর্ণনা করে। যদি সুন্নাহ্ না থাকত তাহলে আমরা দ্বীনী আচার অনুষ্ঠানের (সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ) ব্যাপারে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারতাম না। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> রসুলকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাব দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হচ্ছে, আর যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (সুরা নাহল, ১৬ : ৪৪)।

অধিকন্তু, কুরআন নিজেই আমাদের জন্য রসুল সা.-এর প্রতি আনুগত্যের আদেশ প্রদান করেছে, যেমন আদেশ করেছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্যের :

> বলো, আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রসুল সা.-এর (সুরা নূর, ২৪ : ৫৪)।

> হে ইমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো রসুল সা.এর ও তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বশীলদের; যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তাহলে তা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.-এর কাছে সোপর্দ করো (সুরা নিসা, ৪ : ৫৯)।

বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সোপর্দ করার অর্থ হচ্ছে তাঁর কিতাবের দিকে সোপর্দ করা এবং রসুল সা.-এর দিকে সোপর্দ করার অর্থ, তাঁর সুন্নাহ্‌র দিকে সোপর্দ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> যারা তাঁর (রসুল সা.-এর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক এ ব্যাপারে যে, তাদের ওপর পরীক্ষা নেমে আসবে, কিংবা তাদের ওপর আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক ভয়াবহ শাস্তি (সুরা নূর, ২৪ : ৬৩)।

আল্লাহ তায়ালা কেবল কুরআনের হেফাজত করেছেন, এই দাবির ব্যাপারে-কেউ কেউ বলেন যে, তিনি এর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং সুন্নাহ্‌র হেফাজতের

নিশ্চয়তা দেননি। কিন্তু এটা ইতোমধ্যেই আল-শাতিবী'র আল-মুওয়াফাকাত থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কুরআনের হেফাজত সুন্নাহ্কে হেফাজতেরই সাক্ষ্য দেয়। কারণ পরবর্তীটি (সুন্নাহ্) হচ্ছে পূর্ববর্তীটির (কুরআনের) প্রকাশ। যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার হেফাজত মানেই হচ্ছে, যে ব্যাখ্যা করেছে তার হেফাজত।

উপলব্ধির অক্ষমতাহেতু হাদিসকে প্রত্যাখান করা

এখানে আমি যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হচ্ছে সুন্নাহ্ ও সহিহ হাদিসকে প্রত্যাখান করা। এটা সেই ব্যক্তির মনে উদয় হয়, যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয় এবং এ বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এটা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে যে, সূচনার সময়ের দাবি হচ্ছে সুন্নাহ্ কিভাবে বুঝতে হবে তা অনুসন্ধান এবং নিবিড়ভাবে সংজ্ঞায়িত গবেষণা, সেই সাথে এর উৎস এবং এর কর্তৃত্ব বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আশ্রয় বা অবলম্বন গ্রহণ করা। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা এ বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

ক্ষীণ উপলব্ধির কারণে সহিহ্কে প্রত্যাখ্যান করা

সুন্নাহ্র জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে যে, কোনো হঠকারী ব্যক্তি একটি হাদিস পাঠ করে, এর জন্য তার নিজস্ব একটা অর্থ অনুমান করে এবং তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। ঐ অর্থ তার কাছে অগ্রহণযোগ্য হলে তখন সে হাদিসকে এর প্রত্যাখ্যাত অর্থসহ বাতিল করে দেয়। কিন্তু যদি সে সৎ হতো, মনোযোগ দিয়ে দেখত ও অনুসন্ধান করত, তাহলে বুঝত, সে যেভাবে বুঝেছে, হাদিসের অর্থ তেমন নয়। সে জানতে পারত, এর জন্য যে ব্যবস্থা সে দিয়েছে তার বিচারবোধ ও পছন্দের সাথে সংগতি রেখে, তা এমন এক অর্থ প্রকাশ করে যার অস্তিত্ব না কুরআনে আছে, আর না আছে সুন্নাহ্তে, যার সাথে আরবদের ভাষার সংগতি নেই এবং যার পক্ষে তার পূর্বেকার বিদগ্ধ বিদ্বান আলেমদের সমর্থন নেই।

আয়শা রা. বর্ণিত হাদিস : তিনি আমাকে ইজার (অন্তর্বাস) পরার নির্দেশ দিতেন, তারপর আমার সাথে ঘনিষ্ট হতেন আমার ঋতুকালীন সময়ে।

এই হাদিসটি একটি উদাহরণ। আল-বুখারি ও অন্যান্যদের থেকে আয়শা রা. কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি বলেন : আল্লাহর রসুল আমাকে আমার মাসিকের সময় ইজার (অন্তর্বাস) পরিধান করার নির্দেশ দিতেন, তারপর তিনি আমার সাথে ঘনিষ্ট হতেন।

এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি পূর্বে কুয়েতী জার্নাল আল-আরাবি তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এক ব্যক্তি এই হাদিসটিকে বাতিল করে দেন। তার যুক্তি কুরআনের এই আয়াতের দাবির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল :

> লোকেরা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, তা অশুচি। কাজেই ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকো এবং যে পর্যন্ত না পবিত্র হয়, তাদের নিকটবর্তী হয়ো না (সুরা বাকারা, ২ : ২২২)।

লেখক বলেন, কুরআন ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পৃথক থাকতে আদেশ দিচ্ছে, অথচ হাদিসে বলা হচ্ছে যে, রসুল সা. ইজারের ওপর তাঁর স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ট হতেন।

আমরা অন্যত্র বিশদভাবে এই যুক্তি খণ্ডন করেছি[৩৮]। মূলকথা হচ্ছে এখানে হাদিস ও কুরআনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, যেমনটা এই লেখক বুঝেছেন। বরং হাদিসটি কুরআনের ভাষ্য প্রদান করেছে; এটা ইনতিজাল (পৃথক থাকা) এর অর্থ স্পষ্ট করেছে নির্দেশ বিষয়ে। এখানে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা (ইজতিনাব) অভিপ্রায় নয়- যেমনটা ইহুদিরা করে, যারা স্ত্রীর এমন সময়ে তার সাথে রাত্রি যাপন করে না। ইনতিজাল সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকেরা যৌন সহবাসের শারীরিক ঘনিষ্ঠতা হতে বিরত থাকবে। পারস্পরিক আনন্দলাভ হচ্ছে এর থেকে পৃথক কিছু, এটা ঐ বিষয়ের অংশ নয় যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৩৯]।

হাদিস : হে আল্লাহ তায়ালা, আমাকে ভিখারির জীবন দাও...

আরেকটি উদাহরণ রয়েছে ইবনে মাজাহ কিতাবে আবু সাঈদ আল-খুদরি রা. এবং আল-তাবারানি গ্রন্থে উবাদা ইবনে সাবিত রা. থেকে : হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে মিসকিন (গরিব ভিখারি) হয়ে বাঁচতে এবং মিসকিন হয়ে মরতে দাও এবং পরকালে মিসকিনদের সঙ্গী করো[৪০]। কোনো কোনো লোক হাদিসটি পাঠ করে এবং আল-মাসকানাহ (দারিদ্র্য) বলতে বুঝে বস্তুগত সম্পদের অভাবকে, অন্য মানুষের সামনে আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে। এখন, অর্থের এই উপলব্ধি নবি সা.-এর দোয়া যা তিনি করতেন দারিদ্র্য জনিত[৪১] কষ্ট ক্লেশ দূর করে আল্লাহ তায়ালার কাছে নেকি ও সমৃদ্ধ কামনায়[৪২] তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং সাদ রা. এর জন্য তাঁর সা. উক্তি : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে ভালোবাসেন (যে) সমৃদ্ধিশালী, তাকওয়াসম্পন্ন এবং আড়ম্বরহীন[৪৩] এবং আমর ইবনুল আস রা. এর প্রতি তাঁর সা. উক্তি : একজন পুণ্যবান লোকের হালাল সম্পদ নিঃসন্দেহে অতি উত্তম[৪৪]।

আপাত মতপার্থক্যের কারণে, এ ব্যক্তি উল্লিখিত হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, এখানে আল-মাসকানাহ বলতে ঐ অর্থে দারিদ্র্য বুঝায় না। এটা কিভাবে মনে হতে পারে যে, তিনি সা.-এর থেকে পরিত্রাণের জন্য দোয়া

করছেন এবং কিভাবে একই সাথে তা অবিশ্বাসের সাথে একত্রে উল্লেখ করছেন হে আল্লাহ্ তায়ালা, আমি তোমার কাছে অবিশ্বাস ও দারিদ্র্য হতে আশ্রয় চাই[৪৫]।

> তাঁর প্রভু তাঁকে সমৃদ্ধি দ্বারা পূর্ণ করেছেন : এবং তিনি তোমাকে নিঃস্ব পেয়েছেন, অতঃপর ধনশালী করেছেন (সূরা দুহা, ৯৩ : ৮)।

আল-মাসকানাহ বলতে তাই বুঝায় যা ইবন আল-আসীর বলেছেন : এর দ্বারা তিনি আল্লাহ তায়ালার সামনে নীচতা এবং হীনতা বুঝিয়েছেন, যাতে মানুষ নির্যাতনকারী ও বেপরোয়া না হয়।

এই হচ্ছে রসুল সা.-এর জীবনযাপন পদ্ধতি- উদ্ধত বেপরোয়াদের জীবন থেকে বহুদূরে। তিনি ক্রীতদাস ও গরিবদের মতো পোশাক পরতেন, তারা যা খেত সেটাই খেতেন এবং যখন কোনো আগন্তুক আসত সে (আগন্তুক) তাঁকে সা. তাঁর সা. সাহাবিগণ থেকে পৃথক করতে পারত না। কারণ তিনি সা. তাদের (সাহাবিদের) সাথে এমনভাবে থাকতেন যে, তাঁকে আলাদা করা যেত না এবং বাড়িতে তিনি সা. নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন; তিনি তাঁর আলখাল্লা জড়াতেন; তাঁর ভেড়ার দুধ দোহন করতেন এবং তিনি সা. তাঁর মহিলা প্রতিবেশী ও দাসের যাঁতা ঘুরিয়ে শস্য পিষে দিতেন।

যখন কোনো লোক তাঁর কাছে আসত, তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপতে থাকত। তিনি সা. বলতেন, সহজ হও, কারণ আমি রাজা বাদশাহ নই। বরং আমি কুরাইশ বংশের সেই মহিলার সন্তান, যিনি মক্কায় অবস্থানকালে শুকনো গোশত খেতেন।

প্রত্যেক শতাব্দীতে দ্বীনের সংস্কার সম্পর্কিত হাদিস

আরেকটি উদাহরণ সেই হাদিস যাতে আবু দাউদ ও আল হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং একাধিক মুহাদ্দিস প্রত্যায়ন করেছেন। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন : প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ তায়ালা এ উম্মাহর কাছে একজনকে প্রেরণ করবেন যিনি এই দ্বীনকে সংস্কার করবেন (পুনর্জীবন দান করবেন)[৪৬]। কেউ কেউ এই হাদিসটি পাঠ করেন এবং সংস্কার (তাজদিদ) বলতে বোঝেন এমন কিছু যাতে সংস্কারক দ্বীনের উন্নয়ন সাধন এবং একে সময়োপযোগী করার জন্য পরিবর্তন করবেন। তিনি যুক্তি দেন : 'কিন্তু দ্বীন নবায়নের বিষয় নয়, এটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এর পরিবর্তন ঘটে না। উন্নয়নের সাথে খাপ খাওয়ানো দ্বীনের দায়িত্ব নয়; বরং উন্নয়নেরই দায়িত্ব হচ্ছে দ্বীনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

এখন যদি নবায়ন বলতে এমনই বুঝায় যে, প্রত্যেক যুগে (বলতে গেলে) আমাদেরকে দ্বীনের একটি নতুন সংস্করণ-এর নীতিগত ও শিক্ষাগত, পাশাপাশি

জনগণের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং উন্নয়নের যাত্রাপথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এবং এটা দ্বীনের সত্যতাকে উল্টিয়ে দেবে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের আবেদনপূর্ণ হাদিসকে বাস্তবিকপক্ষেই প্রত্যাখ্যান করা বিধেয়। এই ব্যক্তি সঠিক হতো, যদি আল-তাজদিদ সম্পর্কে তার অভিপ্রায়ের সাথে ব্যাখ্যার মিল থাকত। কিন্তু তা হয়নি। যেমনটা আমি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি[৪৭]। নবায়ন বা সংস্কারের অর্থ হচ্ছে দ্বীনকে এর আকিদা ও আমলসহ উপলব্ধি করা। কোনো কিছুর নবায়ন বা সংস্কারের অর্থ, এমন এক কার্যক্রম গ্রহণ করা, যা দ্বারা সেই জিনিসকে এর উৎপত্তিলাভের চেহারায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং অতঃপর এটা এর প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এটা অর্জন করা যাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া অংশগুলোকে সবল করে এবং সময়ের বিবর্তনে অবনতিশীল বিষয়গুলোকে মেরামত করে এবং ক্ষয়ে যাওয়া স্থানে তালি দিয়ে এমনভাবে, যেন এটি প্রকৃত রূপে ফিরে আসে। অতএব নবায়ন মানে এই নয় যে, প্রাচীন প্রকৃতির পরিবর্তন বা অন্যকিছু দ্বারা স্থানান্তর করা যা অভিনব ও নতুনভাবে সৃষ্ট। নবায়নের ব্যাপারে এভাবে কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।

এখন আমরা অনুভবযোগ্য বিষয়ের উদাহরণ নিতে পারি। আমরা যদি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক কাঠামোর নবায়ন করতে চাইতাম, তার অর্থ হতো : এর মালমসলা, এর বৈশিষ্ট্য, ঐসব স্থান মেরামত করতাম যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এর প্রবেশমুখ উন্নত করে, এর সূচনাস্থলের সুবিধা বাড়িয়ে, এর বিশেষত্ব বিস্তারিত করে, ইত্যাদিসহ নবায়ন করতাম। যা আমাদের ধ্বংস করা উচিত তাতে নবায়নের কিছু নেই, বরং তদস্থলে সর্বশেষ স্টাইলের একটি জাঁকজমকপূর্ণ দালান নির্মাণ করাই সংগত।

দ্বীন সম্বন্ধেও একই কথা। এর নবায়ন মানে এর কোনো নতুন সংস্করণ বের করা নয়। বরং এর অর্থ হলো রসুল সা. ও তাঁর সাহাবিগণের সময় দ্বীনের যে রূপ ও ব্যঞ্জনা ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া এবং তাদের মতো করে যাঁরা [নবি ও সাহাবাদের] অনুসরণ করতেন পূর্ণ আন্তরিকতা সহযোগে। এর অর্থ হচ্ছে এর মধ্যে ইজতিহাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ এবং এর প্রকৃত ধারায় ফিরিয়ে দেওয়া, গোঁড়ামি ও সাদৃশ্য (তাকলিদ) হতে মুক্ত করা, এর উত্তরাধিকারকে সমালোচনার চোখ দিয়ে পরীক্ষা করা, যাতে এর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এর সীমাবদ্ধতার স্থানগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া যায়। চিন্তাধারায় নবায়ন/সংস্কার হচ্ছে আরেক ধরনের সংস্কার এবং তা হচ্ছে দ্বীনী আকিদার সংস্কার, এর মহামূল্যবান মূল্যবোধের ও নীতিমালার প্রতি উৎসর্গিত হওয়া, এর প্রতি দাওয়াতকে যুগের অবস্থা ও চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ করা, যেমন এসেছে হাদিসে : ইমান তোমাদের অন্তরে জীর্ণ হয়ে যায়, যেমন বহির্বাস ছিঁড়ে যায় (তোমাদের বাইরে)।

অতএব, আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করো, যাতে তিনি তোমাদের ইমানকে নবায়ন করে দেন[৪৮]।

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত

অপর্যাপ্ত বুঝের ফলে আমাদের সময়ে সহিহ্ হাদিস প্রত্যাখ্যানের সবচেয়ে শক্তিশালী উদাহরণ এই যে, কিছু লোক অত্যন্ত মশহুর হাদিস প্রত্যাখ্যান করেছে- এর একটি মুসলিম যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কগণ, সাধারণ ও এলিট সম্প্রদায় মনে রেখেছে এবং এটা হচ্ছে ইবনু উমার ও অন্যান্যের (বর্ণিত) হাদিস : ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত-এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসুল; সালাত কায়েম করা; জাকাত প্রদান করা; রামজানের সিয়াম পালন এবং যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার ঘরে [কাবায়] হজ করা।

এ হাদিসটি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে দুঃসাহসী হঠকারিতার কারণ হচ্ছে, এই হাদিসে জিহাদের উল্লেখ নেই, ইসলামে এর (জিহাদের) বিশাল গুরুত্ব সত্ত্বেও এবং এটিই হচ্ছে এ হাদিসটি প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি।

এই দৃষ্টিভঙ্গি এই অপরিহার্য সত্যতা সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু যে, জিহাদ কিছু সংখ্যক লোকের জন্য অবশ্য কর্তব্য, অন্যদের জন্য নয়; এটা বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয় অধিকাংশ নির্দিষ্ট বিবেচনায়। এটি পাঁচটি ভিত্তির থেকে খুবই ভিন্ন।

হাদিসটি প্রত্যাখ্যানকারীদের কারো যুক্তি যদি শুদ্ধ হতো, তাহলে তা কুরআনের ঐ সমস্ত আয়াতকে প্রত্যাখ্যান/বাতিল করা অনিবার্য করে তুলত, যেগুলোতে ইমানদারদের উত্তম বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে : যারা আল্লাহভীরু, দয়ালু মেহেরবানের দাসানুদাস, পুণ্যবান ও সৎ, উত্তম আমলকারী, যাদের আধ্যাত্মিক দীপ্তি রয়েছে এবং রয়েছে অন্যান্য গুনা যা নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর গ্রন্থে সবিশেষ প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য প্রভূত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এসব উত্তম গুণাবলীর মধ্যে তিনি জিহাদকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

এসবের ওপরে পাঠ করুন সুরা বাকারার প্রথম দিকের আয়াতসমূহে (সুরা বাকারা, ২ : ২-৫) আল্লাহ তায়ালা ভীরুদের গুণাবলী, পূণ্যবান ও সত্যনিষ্ঠদের সম্পর্কে এতে কোনো কল্যাণ নেই... (সুরা বাকারা, ২ : ১৭৭); সুরা আল-আনফালের শুরুতে (৮ : ২-৪) ইমানদারদের গুণাবলী; ঐ সমস্ত ব্যক্তির গুণাবলী যাদের রয়েছে আত্মিক উৎকর্ষ, সুরা আর-রা'দে (১৩ : ২০-২২); বিশ্বাসী ও ফেরদাউস

(জান্নাতের) এর উত্তরাধিকারীগণ সম্পর্কে সূরা মুমিনের প্রারম্ভে (২৩ : ১-১০); সুরা ফুরকানের শেষদিকে (২৫ : ৬৩-৭৭) দয়াময়ের দাসদের গুণাবলী সম্পর্কে; আল্লাহভীরু ও নেক আমলকারীদের সম্পর্কে সুরা আয্-যারিআতে (৫১ : ১৫-২৩); আল্লাহর জান্নাতে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সুরা আল-মাআরিজে (৭০ : ২২-৩৫)।

এসবের কোনো আয়াতে জিহাদের উল্লেখ নেই। তাহলে যে ব্যাপক অজ্ঞতার ফলে হাদিসটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তা কি কুরআন থেকে এসব আয়াতকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ উল্লিখিত পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যায় কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং কেন অন্যান্য মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ করা হয়নি, যেমন জিহাদ অথবা পিতামাতার প্রতি যত্ন আত্তির পূণ্য, নিকটাত্মীয়দের হক এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তা এই : আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি যেগুলো ফরজ করেছেন সেই বাহ্যিক আমলসমূহের সংখ্যা যদি পাঁচ-এর অধিক হয়, তিনি কেন এটা বলেছেন : ইসলাম কি এই পাঁচটি? কিছু লোক উত্তর দিয়েছে যে, এগুলো [পাঁচটি] হচ্ছে ইসলামের অধিকতর দৃশ্যমান এবং অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতীক এবং বান্দা কর্তৃক এগুলো সম্পাদিত হলে তার ইসলাম পরিপূর্ণ হলো এবং এগুলো পরিত্যাগ করার অর্থ হলো, ইসলামে তার বাধ্যবাধকতার সীমা হতে বিচ্যুত হওয়া।

আরো সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো : রসুল সা. সেই দ্বীন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যা বান্দাকে পুরোপুরি তার প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পিত করবে, যথা আল্লাহ্ তায়ালার হক বান্দার উপর, তা হচ্ছে বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। সুতরাং তিনি প্রত্যেকের জন্য এই কর্তব্য স্থির করেছেন যে, সামর্থ্য অনুসারে সে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করবে এবং দ্বীনকে পুরোপরি তাঁরই জন্য খালেস করবে।

বরং এই সব ভিন্ন ফরয গঠিত হয় যৌথ দায়িত্ব সাপেক্ষে - যেমন জিহাদ এবং ভালোকাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরতকরণে এবং যা (প্রয়োজনে) কর্তৃত্বের মাধ্যমে এবং শাসন ও আইনগত তথ্য প্রদান [পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা দার্শনিক], অনুসন্ধান এবং হাদিসের প্রচার এবং অন্যান্য এমন ধরনের কর্তব্য দ্বারা।

অথবা ঐসব কর্তব্য যেগুলো ব্যক্তির হক সংক্রান্ত বিষয়ে আবশ্যকীয়। ঐ হক দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়, যার ওপর এটা পালন করা ফরয। যেমন এক ব্যক্তির হক অন্য ব্যক্তির হককে নির্ধারণ করে, যার জন্য ঐ হক কর্তব্যে পরিণত হয়।

তারপর রয়েছে আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের অধিকারসমূহ। উদাহরণস্বরূপ : ঋণ সাব্যস্তকরণ, অন্যায় দখল থেকে [বস্তু] পুনরুদ্ধার এবং ঋণের বিষয় এবং নিরাপদ রক্ষণের গ্যারান্টি এবং রক্ত সম্পর্ক, সম্পদ ও জমিজমা সঠিকভাবে পুনরুদ্ধার করা। বাস্তবিকপক্ষে এগুলো ব্যক্তিমানুষের অধিকার এবং যখন তারা তাদের থেকে এসব অধিকার অবমুক্ত করে, এই অধিকারসমূহ বাতিল হয়ে যায়, এক জনের বাধ্যবাধকতায় থাকে, অন্যের নয়। একটা পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অন্যটি নয়। এগুলো প্রতিটিই প্রত্যেক বান্দার জন্য বাধ্যতামূলক নয়, যেমনটা আল্লাহ তায়ালার নির্ভেজাল ইবাদত। এ কারণেই মুসলিমরা এসব ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অংশীদার হয়। এই পাঁচটি স্তম্ভ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বাধ্যবাধকতা, কারণ প্রকৃতই এগুলো মুসলিমদের পার্থক্যকারী।

একইভাবে রক্ত সম্পর্কের বন্ধনকে সম্মান করা। স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী এবং ব্যবসায় অংশীদার ও গরিবদের অধিকারকে সম্মান জানানো বাধ্যতামূলক এবং প্রশংসা বর্ণনাকে সম্মান দেখানো অবশ্য করণীয় এবং আইনী নির্দেশ জারি করা; রায় প্রদান করা; শাসন করা এবং ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দকাজ থেকে বিরত করা এবং জিহাদ : এগুলো সবই শর্তযুক্ত ঘটনাক্রমে অবশ্যই পালনীয় কিছু সংখ্যকের ওপর ও সবার জন্য নয়। এই ধরনের কর্তব্য বিরাজ করে উপকার প্রাপ্তি আকর্ষণ করতে বা ক্ষতি এড়াতে; যদি এ লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয় এক ব্যক্তির কাজের মাধ্যমে, তাহলে এগুলো বাধ্যতামূলক থাকবে না। এজন্য যা লোকদের মধ্যে ভাগাভাগি করা যায় তা সম্মিলিতভাবে বাধ্যতামূলক এবং যা একক তা একজন বিশেষ ব্যক্তি, যেমন : জায়িদের জন্য বাধ্যতামূলক, অন্য ব্যক্তি আমর'র জন্য নয়।

প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য কর্তব্য পালনে সকলের অংশগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন, ঐ পাঁচটি ব্যতীত। কারণ বাস্তবেই যায়িদ এবং তার নিকটাত্মীয়গণ আমরের স্ত্রী ও তার নিকটাত্মীয় নয়, সুতরাং এটা এই একটির জন্য বাধ্যতামূলক নয় যেমন এই অন্যটির জন্য বাধ্যতামূলক। পৃথক হচ্ছে রামাজানে সিয়াম এবং কাবায় হজ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জাকাত। বাস্তবিকপক্ষে জাকাত, যদিও সম্পত্তির ওপর অধিকার, তথাপি এটা আল্লাহ তায়ালার প্রাপ্য এবং আট প্রকার [গ্রাহক] মাত্র হচ্ছে এর আইনসম্মত ব্যয়ের খাত। এ কারণেই এখানে নিয়াত বাধ্যতামূলক এবং এটা অনুমতিযোগ্য নয় এজন্য যে অন্য ব্যক্তি এটা করে [যেমন জাকাতের কর্তব্য পালন করা] তার অনুমতি ব্যতিরেকে এবং কেন এটা অবিশ্বাসীগণ দাবি করেন[৪১]।

সহিহ প্রত্যাখ্যানে হঠকারী ত্রস্ততা এবং এ ক্ষেত্রে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া

সহিহ ও প্রত্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো করে কোনো হাদিস প্রত্যাখান আমাদের মতে সন্দেহপূর্ণভাবে হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা কখনই সহিহ হাদিস বাতিলকরণে হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। বরং তারা উম্মাহ্‌র পূর্ববর্তী প্রজন্মের (সালাফ) মতামত সমর্থন করবেন। কারণ যখন এটা প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁরা কোন হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং কোনো বিশিষ্ট নেতা তার নিন্দা করেননি, তাহলে অবশ্যই তারা অনিয়মের অজুহাতে কোনো সমালোচনা অনুমোদন করেননি বা এর প্রতি আপত্তির কোনো কারণ দেখাননি।

একজন পক্ষপাতশূন্য মনের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই এই হাদিসটিকে সমর্থন করবেন এবং বোধগম্য অর্থ বুঝে দেখবেন অথবা যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। এটাই হচ্ছে মুতা'জিলা (যুক্তিবাদী) ও আহলুস সুন্নাহ্‌দের (সুন্নীগণ যারা সুন্নাহ্‌ অনুসরণ করেন) মধ্যে বিভাজনের ক্ষেত্র। প্রথম দল ধর্ম ও জ্ঞানের যে নীতিমালা গ্রহণ করেছেন, তার আলোকে কোনো হাদিসে কোনো অসামঞ্জস্য দৃষ্টি হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ্‌গণ জটিল হাদিস ব্যাখ্যায় তাদের মনন ব্যবহার করেন এবং বাহ্যিকদৃষ্টিতে প্রতীয়মান, এমন ভিন্নতাগুলোকে একত্রিত করে বিরোধিতা নিরসনের প্রয়াস গ্রহণ করেন।

এ উদ্দেশ্যে আবু মুহাম্মদ ইবনে কুতায়বা (মৃত্যু : ২৬৭ হি.) তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ তা'বীল মুখতালাফ আল-হাদিস রচনা করেন। এতে কিছু সংখ্যক হাদিসকে ঘিরে মুতাজিলাদের ঝড়ো আঘাতের মোকাবিলা করেন, যাকে তারা কুরআন ও যুক্তির বিরোধী বলে অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণার আলোকে মিথ্যা বা অন্য হাদিসের বিরোধী বলে অভিহিত করেছিল। ইবনে কুতায়বার পরে, হানাফি মাজহাবের হাদিসবেত্তা আবু জাফর আত-তাহাবী (মৃত্যু : ৩২১ হি.) মুশকিল আল-আসার নামক গ্রন্থ রচনা করেন[৫০]। তিনি এসব হাদিসে জটিলতার স্থান নির্দেশ করেন, এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রহণযোগ্য করেন এবং এগুলোকে যুক্তির পক্ষে সুবিধাদায়ক অবস্থান প্রদান করেন।

যখন নবি সা. থেকে কোনো হাদিসের সাক্ষ্য নিশ্চিত হয়, তখন এর অভ্যন্তরে একটি সুদূরপ্রসারী, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে একে বুঝে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে এবং এটাকে বাতিলকরণ প্রতিরোধে যথাযথ সাবধানতা থাকবে সম্প্রসারিত যুক্তির দাবি পূরণার্থে, যেগুলোতে লুকায়িত ভুলের সম্ভাবনা আছে সেগুলোর জন্য।

কিছু নির্ধারিত হাদিস বিষয়ে আয়শা রা. এর অবস্থান

এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে সেটাই, যা আয়শা রা. থেকে এসেছে। তিনি কতকগুলো হাদিসের ব্যাপারে নিন্দা প্রকাশ করেছেন, সেগুলো কুরআনের বিরোধী

হওয়ায় তৎকর্তৃক বাতিল বা ইসলামের প্রতিষ্ঠিত নীতির বিরোধী হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে। একসময় এমনও ব্যাপার ছিল যে, সাহাবিদের দ্বারা বর্ণিত আরেক হাদিসকে তিনি বাতিল করেছেন, যদিও তাদের সত্যনিষ্ঠতা ছিল কিংবা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের সঠিকতা ছিল কিংবা হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত সাধারণ গুরুত্বও যথেষ্ট ছিল।

বিড়াল সম্পর্কিত একটি হাদিস উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এর ওপর নির্যাতনের শাস্তি সম্বন্ধে যা এসেছে। আহমাদ ইবনে হাম্বল র. আলকামা (রহ.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

> আমরা আয়শা রা. এর সাথে ছিলাম। তখন আবু হুরায়রা এলো। তখন তিনি (আয়শা) বললেন, তুমিই কি সেই ব্যক্তি যে ঐ হাদিসটি বর্ণনা করেছে যে, এক মহিলা একটা বিড়ালকে বন্দী করে নির্যাতন করেছিল, একে খেতে দেয়নি, পানি পান করায়নি? তখন সে (আবু হুরায়রা) বলল, আমি এটা তাঁর [নবি সা.] কাছে হতে শুনেছি। তখন তিনি (আয়শা রা.) বললেন, তুমি কি জান ঐ মহিলাটি কে ছিল? সে সময় তিনি মনে করেছিলেন যে, সে ছিল একজন অবিশ্বাসিনী। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তায়ালার কাছে বিশ্বাসী অধিক সম্মানিত, যিনি সর্বশক্তিমান এবং মহীয়ান ও গরীয়ান। এ অবস্থায় একটি বিড়ালের জন্য তিনি তাকে শাস্তি দেবেন! অতএব যখন তুমি আল্লাহর রসুল সা. থেকে হাদিস বর্ণনা করো, তখন খেয়াল রেখো কিভাবে তুমি তা করছ![৫১]

বর্ণনার মধ্যে আবু হুরায়রা কর্তৃক নিজস্ব ভঙ্গিমার কারণে আয়শা রা. তা বাতিল করেছেন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি (আবু হুরায়রা) রসুল সা. থেকে শ্রুত শব্দাবলী স্মরণ রাখতে পারেননি। তাঁর সা. যুক্তি এই যে, তিনি এটা খুব বেশি করে বিবেচনা করেছেন যে, একজন বিশ্বাসী মানুষ একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি পাবে; আল্লাহ তায়ালার কাছে অধিক সম্মানিত একজন লোককে তিনি একটি নির্বোধ প্রাণীর জন্য আগুনে প্রবেশ করাবেন! আল্লাহ তায়ালা আয়শাকে ক্ষমা করুন, কারণ এ বিষয়ে তিনি একটি জিনিস ভুলে গিয়েছেন, যা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে এই ঐ স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে যা প্রদর্শন করা হচ্ছে, তা তার কাজ অর্থাৎ অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বিড়ালটি বন্দী ছিল। এটা হচ্ছে ঐ মহিলার হৃদয়ের কাঠিন্য এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট দুর্বল প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রমাণ এবং তাই সহানুভূতি বা দয়ার রশ্মি তার অন্তঃকরণে প্রবেশ করেনি। সহানুভূতি সম্পন্নগণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ

করবে না এবং যারা দয়া দেখায় তাদের ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা দয়া দেখান না। ঐ স্ত্রীলোকটি যদি পৃথিবীতে কারো প্রতি দয়া দেখাত, তাহলে আসমানের প্রভুও তার প্রতি দয়া দেখাতেন।

এই হাদিস এবং একই ধরনের অন্য হাদিসগুলোকে ইসলামের গৌরবসহ দয়াগুণসম্পন্ন মূল্যবোধের পরিসীমায় গণনা করা উচিত, যা প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকে সম্মান করে। কারণ ইসলাম প্রত্যেক কোমল যকৃতধারী প্রজাতির প্রাণীকে দয়া প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার স্থির করেছে। অর্থপূর্ণ হচ্ছে তা-ই যা অন্য হাদিসে এসেছে, যা ইমাম বুখারিও বর্ণনা করেছেন এভাবে : একটি লোক এক কুকুরকে পানি দিয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা এটা তার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন এবং আরেকটি হচ্ছে : এক গণিকা একটি কুকুরকে পানি দিয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করেছেন।

সর্বোপরি প্রকৃত কথা হচ্ছে যে, আবু হুরায়রা রা. একাই এ হাদিসের বর্ণনাকারী, যাতে মনে হতে পারে যে, তিনি এর শব্দগুলো ঠিকমতো ধরে রাখতে পারেননি-এটা কিভাবে হতে পারে, যখন তিনি কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই সাহাবিদের রা. মধ্যে স্মৃতিধারণে সবচেয়ে শক্তিশালী? তাছাড়া আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল-বুখারি ও মুসলিম ইবনে উমার রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল যাতে সে অনাহারে মারা যায়। অতঃপর সে ঐ [বিড়ালটির] কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : তুমি তাকে খেতে দাওনি এবং তাকে পানি দাওনি, যখন তুমি তাকে শক্ত করে ধরে বেঁধে রেখেছিলে। তুমি তাকে চলে যেতেও দাওনি, যাতে সে মাটিতে চলেফিরে কীটপতঙ্গ খেতে পারে"[৫২]। আহমাদও জাবির রা. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে নির্যাতন করেছিল মারা না যাওয়া পর্যন্ত এবং ওটাকে চলে যেতে দেয়নি, যাতে সে মাটির ওপর চলাফেরা করে কীটপতঙ্গ খেতে পারে[৫৩]।

সুতরাং এই হাদিসটির বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রা. একাই নন। তবে তিনি যদি একাও হতেন, তাহলেও এই বর্ণনার গুণাগুণ বা অর্থ কিছুতেই বিনষ্ট হতো না।

টীকা

০১. সা. (আল্লাহর সালাত ও আশীস তাঁর ওপর এবং শান্তি) : পাঠকের জন্য স্মর্তব্য যে, মুসলিমগণ যতবার রসুল সা.-এর নাম উল্লেখ করে ততবারই এমন শব্দসমূহ কিংবা একই রকম শব্দ উচ্চারণ করে। -অনুবাদক

০২. 'স্বীকৃতি' হচ্ছে তাকবির শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ। রসুল সা. হিদায়াত প্রদানে তাঁর কর্তব্যে বাধা ছিলেন, কোনো ত্রুটি দেখলে তাঁর অসম্মতি প্রকাশে। তিনি কোনো কিছু দেখে অসম্মতি জ্ঞাপন না করলে বুঝতে হবে এতে তাঁর সম্মতি/ স্বীকৃতি/সমর্থন রয়েছে। -অনুবাদক

০৩. রা. (আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর খুশি থাকুন) : পাঠকদের জন্য স্মর্তব্য যে, মুসলিমগণ রসুল সা.এর সাহাবিগণের নাম উল্লেখ করলে এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে এরূপ অর্থবোধক শব্দাবলী উচ্চারণ করে থাকে। -অনুবাদক

০৪. মুসলিম (রহ.) এটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। আহমাদ ইবন হাম্বল, আবু দাউদ এবং আল-নাসায়ি এটা বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ করা হয়েছে ইবন কাসিবের সুরা নূন-এর তাফসিরে।

০৫. যেমন এই আয়াতে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছেন, যখন তাদের কাছে তাদের একজনকে রসুল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনায়, তাদের পরিশোধন করে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদেয়, যদিও ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে ছিল (৩ : ১৬৪) এবং রসুল সা.-এর সহধর্মিনীগণ রা. কে সম্বোধন করে : তোমাদের গৃহে আল্লাহ তায়ালার আয়াত ও হিকমাত থেকে যা পাঠ করা হয় তার চর্চা করো (৩৩ : ৩৪)। অন্য এমন কেউ নেই, আরো অধিকারসহ যে কু কুরআনের ব্যাখ্যা ও ইলমের শিক্ষাকে একত্রে ব্যাখ্যা করতে পারে সেই ব্যক্তি সা. ছাড়া যাঁর ওপর কুরআন নাজিল হয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা এটা লোকদের কাছে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যাঁকে দিয়েছিলেন সেই একব্যক্তি হচ্ছেন তাঁর রসুল সা.।

০৬. আল-বুখারি ও মুসলিম এটা আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

০৭. আল-বুখারি কিতাব আল-সাওমে এটা বর্ণনা করেছেন।

০৮. মুসলিম এটি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

০৯. মুসলিম ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন।

১০. আল-হাকিম (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭৫) এটা বর্ণনা ও প্রত্যায়ন করেছেন এবং আল-যাহাবি এটাকে দৃঢ় করেছেন। আল-হায়সামি আল-মাজমু'আ (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭১) বলেছেন : আল-বাযযার এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-তাবারানি আল-কবীর'র মধ্যে এবং এর ইসনাদ (বর্ণনার পরম্পরা সূত্র) উত্তম এবং এর রাবিগণ (রিজাল) বিশ্বাসযোগ্য।

১১. মুসলিম ও আহমদ ইবন হাম্বল এটা আবু মুসা হতে বর্ণনা করেছেন।

১২. মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন।

১৩. দেখুন আমাদের গ্রন্থ মালামিহ আল-মুজতামা 'আল-মুসলিম (মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য) অধ্যায় আল-লাহউ ওয়া আল-ফুনূন (বিনোদন ও কলা)। আরো দেখুন আমাদের প্রবন্ধ আল-ইসলাম ওয়া আল-ফান্ন (ইসলাম ও কলা)

১৪. ইবন সা'দ এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-হাকিম আল-তিরমিজি মুরসাল (সনদ বিচ্ছিন্ন) হাদিসে আবু সালিহ হতে। আল-হাকিম এটা তার কাছে হতেও বর্ণনা করেছেন এবং আবু হুরায়রা হতে মাউসূল (সংযুক্ত) হাদিস রূপে, শাইখাইনের (আল-বুখারি ও মুসলিম) নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যয়িত করে, আল-যাহাবি ওর সাথে একমত। আল-আলবানি এটা সত্যায়ন করেছেন। দেখুন আমাদের গ্রন্থে, আল-হালাল ওয়া আল-হারাম, হাদিস নম্বর -১।

১৫. কিতাব আল-তালাক গ্রন্থে ১৪৭৮ নম্বর হাদিসে এটা বর্ণনা করেছেন।

১৬. আবু মুসা ও মু'আয-এর সর্বসম্মত হাদিস : আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, হাদিস নম্বর ২১৩০।

১৭. সর্বসম্মত, আনাস-এর হাদিস হতে, আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, হাদিস নম্বর ১১৩১।

১৮. আল-বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন, আল-নাসায়ি এবং আল-তিরমিজিও বর্ণনা করেছেন, কিতাব আল-তাহারাত-এ আবু হুরায়রা হতে।

১৯. আল-তাবারানি আবু উমামাহ হতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে একজন দুর্বল রাবি আছেন, যেমনটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে মাজমা 'আল-যাওয়াইদে (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০২)। জাবির হতে দুর্বল সূত্রে আল-খাতিব এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন। ফয়েয আল-কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে : কিন্তু এর তিনটি সূত্র রয়েছে, সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, [ওর] কারণে এটাকে হাসান স্তর হতে বঞ্চিত করা যাবে না। দেখুন, আল-আলবানিকৃত গাইয়াত আল-মারাম, হাদিস নম্বর ৮। ইবন হাজার আল-ফাতহ (খণ্ড ২, ১৪৪ পৃষ্ঠায়)

এটা বর্ণনা করেছেন আল-সাররাজ হতে আবু যিনাদ হতে, অতঃপর উরওয়াহ আয়িশারা. হতে মসজিদে আবিসিনিয়ার লোকদের খেলা সংক্রান্ত গল্পে এবং সেখানে রয়েছে : ইহুদিদের জানা উচিত যে, আমাদের দ্বীনে স্থান [মহাবিস্তার] রয়েছে। [তিনি বলেন] প্রকৃত পক্ষে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছিল একটি সহিষ্ণু সত্য-দ্বীন সহকারে। আহমদ (ইবন হাম্বল) ইবন'আব্বাস হতে যা বর্ণনা করেছেন তা [ওটা] প্রমাণ করে। আল্লাহর রসুল সা.-এর কাছে বলা হলো : কোন দ্বীন আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি সা. বললেন : সহিষ্ণু সত্য-দ্বীন। আল-হায়সামি বলেন, আহমদ ইবন হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-তাবারানি আল-কাবির ও আল-আওসাত মধ্যে এবং আল-বাযযার, যেখানে [বলা হয়েছে] : ইবন ইসহাক [ছিলেন] একজন মুদাল্লিস [যিনি তার শিক্ষকের নাম বলেননি, এর পরিবর্তে তার শিক্ষকের শিক্ষক হতে সরাসরি বর্ণনার দাবি করেছেন] (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০)। আল-বুখারি তার সহিহ গ্রন্থে এর একটা নোট লিখেছেন।

২০. সর্বসম্মতভাবে, আয়িশা হতে, সহিহ্ আল-জামি আল-সাগির, হাদিস নম্বর ৭৮৮৭।

২১. মুসলিম এটা ইবন মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন।

২২. ইবন'আমর হতে আল-তিরমিজি এবং আল-হাকিম বর্ণনা করেছেন। সহিহ্ আল-জামি গ্রন্থে আল-তিরমিজি এটাকে সহিহ্ বলেছেন।

২৩. সর্বসম্মত।

২৪. মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন।

২৫. আহমদ ইবন হাম্বল এবং ইবন হিব্বান এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-বায়হাকি আল-সুনান গ্রন্থে ইবন উমার হতে। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ্ আল-জামি'আল-সাগির গ্রন্থে, হাদিস নম্বর ১৭৭৫।

২৬. আহমদ ইবন হাম্বল এবং আল-বায়হাকি এটা ইবন 'উমার হতে বর্ণনা করেছেন এবং আল-তাবারানি ইবন'আব্বাস ও ইবন মাসউদ হতে। প্রাগুক্ত, হাদিস নম্বর ১৭৭৫।

২৭. আবু দাউদ এটা জাবির হতে বর্ণনা করেছেন। এটাতেও নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা রয়েছে : তার জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল।

২৮. ইবন আল-কাইয়িম হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন মিফতাহ দার আল-সা'দাহ গ্রন্থে (বৈরুত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিইয়াহ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা- ১৬৩-৬৪ এবং শক্তিশালী বলেছেন এর বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনার কারণে। একইভাবে ইবন আল-ওয়াজির এটিকে সহিহ্ বা হাসান বলে চিহ্নিত করেছেন এর বহুসংখ্যক বর্ণনা সূত্র দ্বারা, উল্লেখ করেছেন তিনি আহমদ ইবন হাম্বল ও আব্দুল বার কর্তৃক এর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করণ এবং প্রত্যয়িত করেছেন এবং এর সনদে মাত্রা (ওজন) যুক্ত করেছেন আল-উকায়লী কর্তৃক এবং তাদের পূর্বাপর অনুসন্ধান ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশস্ততার সন্নিবেশ করেছেন। এ সব কিছুই এর যথার্থতা দাবি করে। দেখুন, আল-রাউয আল-বাসিম ফি আল-যাব্বী'আস সুন্নাহ্ আবী আল-কাসিম (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১-২৩)। আরো দেখুন, আল-রাউয আল-বাসিম আল-আলবানির তাখরিজ (ভাষ্য) ফাওয়ায়িদ তাম্মাম গ্রন্থে।

২৯. আহমদ ইবন হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন, নাসায়ি, ইবন মাজাহ, আল-হাকিম, ইবন খুযায়মাহ এবং ইবন হিব্বান ইবন'আব্বাস হতে। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ্ আল-জামি'আল-সাগির এবং এর সম্পূরক কিতাবে, হাদিস নম্বর ২৬৮০।

৩০. মুসলিম তাঁর সহিহ্ গ্রন্থে কিতাব আল-ইলম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

৩১. দেখুন সূ' আল-তা'বিল ('খারাপ ব্যাখ্যা') অধ্যায় আমাদের গ্রন্থ আল-মুরজি 'ইয়্যাহ আল- 'উলিয়া ফি আল-ইসলাম-এ পৃষ্ঠা ২৯৭-৩৩০।

৩২. দেখুন প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৮-৯৯।

৩৩. [এখানে যুক্তি যা তা এই যে, যদি কোনো সাহাবি বর্ণনা করেন (মনে করুন) পরকালের কোনো বিষয়ে, যে সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত কোনো জ্ঞান ছিল না এবং তাই কোনো

ব্যক্তিগত অভিমতও নয়, তাহলে তিনি যা বর্ণনা করছেন তা নবি সা.-এর বর্ণনা বলে গ্রহণ করতে হবে, এমনকি যদি ঐ সাহাবি কর্তৃক রসুল সা. হতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না-ও হয়। অন্যদিকে, যে বিষয় একজন বিশ্বাসীর জন্য সঠিক বা পছন্দসই, সে ব্যাপারে সাহাবি একটি ব্যক্তিগত অভিমত ধারণ করতে পারেন, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের বিশ্বাসীদের এই বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকবে, যেমনটা তাদের থাকে কোনো প্রখ্যাত ব্যক্তির ব্যাপারে, যেমনভাবে তা ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরামর্শ বা অগ্রাধিকার হতে পারে। -অনুবাদক

৩৪. দেখুন, যেমনটা আমরা সুন্নাহ্ সম্বন্ধে লিখেছি 'ফিকহকে সহজীকরণের নীতি নামক প্রবন্ধে। আমাদের প্রণীত গ্রন্থ তাইসীর আল-ফিকহ্ লি আল-মুসলিম আল-মু'আসির (সমসাময়িক মুসলিমের জন্য ফিকহ সহজীকরণ), ১ম অংশ (কায়রো : মাকতাব ওয়াহাবা)।

৩৫. শাইখ'আবদ আল-ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ ওটা উদ্ধৃত করেছেন তিরস্কার ও অপমানজনকভাবে লক্ষ্মৌভীর আল- আজউইবাহ আল-ফাজিলাহ গ্রন্থের ভাষ্যে, (২য় সংস্করণ, কায়রো, ১৯৮৪) পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৪।

৩৬. আল-শাতিবী'র আল-ই'তিসাম (রক্ষাকবচ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৫ - ৩৭।

৩৭. আমরা ঐসব আলেমদের মধ্যে আইনবিদ, প্রচারক ও মুজতাহিদদের মধ্যে শায়খ মুস্তাফা আল-সিবা'ই (রহ.)কে গণ্য করি, তাঁর মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ আল-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতু-হা ফি আল-তাশরি'আল-ইসলামি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর সম্মানজনক মর্যাদা ও অবস্থান দান করুন। তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন, মুহাম্মদ মুস্তাফা আল-আ'যামি যিনি শাখতকে প্রতিহত করেছেন, শায়খ আবদ আল-রাহমান ইবন ইয়াহ্‌য়া আল-মু'আল্লিমী আল-ইয়ামানি, আল-আন্ওয়ার আল-কাশিফাহ'র গ্রন্থকার শাইখ মুহাম্মদ আবদ আল-রাযযাক হামযাহ, জুলুমাত আবি রাইয়াহ'র প্রণেতা 'আজ্জাজ আল-খাতিব এবং অন্যরা। এখানে সবার নাম উল্লেখ করার মতো পর্যাপ্ত স্থান নেই।

৩৮. এই প্রত্যাখ্যানের বিষয় ঐ সময় পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় এবং আমাদের গ্রন্থ ফাত্ওয়াও মু'আসিরাহ (সমসাময়িক ফতোয়া)'র মধ্যে, ১ম অংশ।

৩৯. প্রাগুক্তে সহিহ আল-বুখারির পক্ষে আমাদের ফতোয়া দেখুন।

৪০. দেখুন সহিহ আল-জামি'আল সাগির, নম্বর ১২৬১। কিছু আলেম অভিযোগ করেছেন যে, এই হাদিসটি যঈফ (দুর্বল)। কিন্তু এটা আয়িশাহ রা. হতে একইভাবে এবং এটা দুটি মাত্র উৎস হতে উদ্ধৃত হয়নি।

৪১. আল-বুখারি ও মুসলিম এটা আয়িশাহ রা. হতে বর্ণনা করেছেন। প্রাগুক্ত নম্বর ১২৮৮

৪২. মুসলিম, আল-তিরমিজি ও ইবন মাজাহ এটা ইবন মাস'উদ হতে বর্ণনা করেছেন। প্রাগুক্ত নম্বর ১২৭৫।

৪৩. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এবং মুসলিম এটা সা'দ ইবন আবী ওয়াক্‌কাস হতে বর্ণনা করেছেন। প্রাগুক্ত নম্বর ১৮৮২

৪৪. আহমাদ ইবন হাম্বল এবং আল-হাকিম এটা বর্ণনা করেছেন, আল-যাহাবী এটাকে সত্যায়ন ও সমর্থন করেছেন।

৪৫. আল-হাকিম ও আল-বায়হাকি এটা বর্ণনা করেছেন আনাস-এর দোয়া হতে। সহিহ আল-জামি'আল-সাগির, নম্বর ১২৮৫।

৪৬. কিতাব আল-মালাহিম (যুদ্ধ) অধ্যায়ে তার সুনানে আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন, নম্বর ৪২৭০, আল-হাকিম আল-মুসতাদরাক মধ্যে (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২২); আল-বায়হাকি মা'রিফাত আল-সুনান ওয়া আল-আসার গ্রন্থে এবং অন্যরা। আল-ইরাকী এর সত্যায়ন করেছেন এবং আল-সুয়ূতি এটি ফায়িদ আল-কাদির খণ্ড ২, ২৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

৪৭. দেখুন, আমাদের গবেষণা; তাজদিদ আল-দীন ফি দাঅ'আল-সুন্নাহ্‌ (২য় সংস্করণ, কাতার : মারকাজ বুহুত আল-সুন্নাহ্‌ ওয়া আল-সিরাহ), পৃষ্ঠা-২৯। আমার বই : মিন আজলি সাহ্‌ওয়া রাশিদা (বৈরুত : আল-মাকতাব আল-ইসলামি) তেও মুদ্রিত হয়েছে।

৪৮. আল-তাবারানি ও আল-হাকিম ইবন'আমর হতে এটা বর্ণনা করেছেন। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি'আল-সাগির'র মধ্যে।

৪৯. ইবন তাইমিইয়াহ'র মাজমু'আল-ফাতাওয়া কিতাবের খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪-১৬ তে কিতাব আল-ইমান অধ্যায় হতে।

৫০. পরবর্তীতে মু'আস্‌সাত আল-রিসালাহ কর্তৃক ৮ খণ্ডে মুদ্রিত, সম্পাদনা করেছেন শু'আইব আল-আরনা'উত।

৫১. আল-হায়সামি এটা উদ্ধৃত করেছেন মাজমা আল-যাওয়া'ইদ (খণ্ড ১০, ১৯০ পৃষ্ঠা)-এ এবং বলেছেন : আহমদ [ইবন হাম্বল] এটা বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ খাঁটি ব্যক্তি। ঐ স্ত্রীলোকটির জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হচ্ছে বিড়ালটির প্রতি তার নিষ্ঠুরতা, এটা এভাবেই শাইখাইন আবু হুরাইরা হতে এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন। দেখুন সহিহ আল-জামি' আল-সাগির, হাদিস, নম্বর ৩৩৭৪।

৫২. দেখুন প্রাগুক্ত, দুটি হাদিস, নম্বর ৩৯৯৫, ৩৯৯৬।

৫৩. প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আইন ও প্রচারের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্

১. ব্যবহারশাস্ত্র এবং আইন প্রণয়নে সুন্নাহ্

কুরআনের পর ব্যবহারশাস্ত্র ও আইন প্রণয়নের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ্। সকল চিন্তাঘরানার লিখিত ব্যবহারশাস্ত্রের নীতিমালা সংক্রান্ত সকল বইপুস্তকে এ সম্পর্কে উপযুক্ত ও সুপরিসর আলোচনা হয়েছে। আল-আওজা'ঈ (মৃত্যু : ১৫৭ হি.) বলেন: এই বইটি সুন্নাহ্র জন্য অধিক প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন বইটির সুন্নাহ্কে[১]। তিনি এরকম বলেছেন, কারণ সুন্নাহ্ কুরআনে বর্ণিত সারাংশকে বিস্তারিত করে, এর মধ্যে মৌলিকত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এবং এর মধ্যকার সাধারণকে বিশেষায়িত করে থাকে। কিছু লোক বলতে গিয়ে এতটাই অগ্রসর হয়েছেন যে, সুন্নাহ্ হচ্ছে কিতাবের চূড়ান্ত নির্দেশক[২]। কিন্তু আহমাদ ইবনে হাম্বল এ জাতীয় মন্তব্য অনুমোদন করেননি : আমি এমনটা বলার দুঃসাহস রাখি না। বরং আমি বলি, সুন্নাহ্ হচ্ছে কিতাবের ব্যাখ্যা[৩]। কুরআন ও সুন্নাহ্র সম্পর্ক সম্বন্ধে ঐ প্রকাশভঙ্গি আহমাদ ইবনে হাম্বলের উপলব্ধি ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসার সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। এটি একটি সুষম অবস্থান। কারণ এক হিসেবে সুন্নাহ্ কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা স্পষ্ট করে; কিন্তু তারপর এমনকি যেসব বিষয় সরাসরি কিতাবে নেই, সেখানেও সুন্নাহ্ এত দৃঢ়ভাবে তার কক্ষপথে থাকে যে, তারপরেও এর শিক্ষা কুরআনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে কাজ করে।

ইবাদতের নিয়মপদ্ধতি এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে আইন প্রণয়নের উৎস হিসেবে সুন্নাহ্ সম্বন্ধে কোনো মতপার্থক্য নেই। আল-শাওকানী বলেন : শেষ কথা হচ্ছে এই যে, সুন্নাহ্র প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত এবং [উৎস হিসেবে] নির্দেশনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে এর স্বাধীনতা দ্বীনী দাবি। এতে কেউ দ্বিমত করবে না সেই ব্যক্তি ব্যতীত, দ্বীন ইসলামে যার কোনো অংশ নেই[৪]।

ইসলামি আইনশাস্ত্র বিষয়ক যেকোনো ঘরানার বইপুস্তকেই কাওলি, ফে'লি ও তাকরিরি সুন্নাহ্র সমর্থনে অজস্র প্রমাণ রয়েছে। ফিকহ'র ইতিহাসে আহলূল হাদিস (হাদিসপন্থী) ও আহলূর রায় (মতামতপন্থী) বলে পরিচিত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রশ্নে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় গোষ্ঠীই মৌলিক নীতিমালার সমর্থন করে, বিশদকরণের ক্ষেত্রে এবং বাস্তব প্রয়োগের বেলায়ই কেবল মতপার্থক্য এসেছে, তাদের মধ্যে হাদিস গ্রহণ এবং তদনুযায়ী কাজ করার মান নির্ণয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

হানাফি মাজহাবের (যাকে রায় মাজহাব বলে চিহ্নিত করা হয়) বইপুস্তকের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক হাদিস রয়েছে, যেগুলো গবেষকগণ প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করেন। এধরনের একটি আদর্শ গ্রন্থ হচ্ছে ইবন্ মাওদূদ আল-হানাফী আল-মাওসিলী (মৃত্যুঃ ৬৮৩ হি.) রচিত আল-ইখতিয়ার শারহ আল-মুখতার। আল-আজহারের সাথে সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের অধ্যয়নে (আমি হানাফি ছাত্রদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি) এই গ্রন্থ পাঠ করতে বলা হয়। আরেকটি হচ্ছে আল-মারগীনানী রচিত আল-হাদিদ, যা আল-আজহারে সুপ্রতিষ্ঠিত শারিয়াহ অনুষদের হানাফি ছাত্রদের পাঠ্য এবং এর ভাষ্য, ফাতহুল কাদীর, যার লেখক হচ্ছেন সুপ্রতিষ্ঠিত হানাফি আলেম কামালউদ্দিন ইবনুল হুমাম। এসব গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদিসসমূহ সযত্নে পাঠ করলে যথেষ্ট নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে যে, আহ্লুর রায়গণ সুন্নাহ্কে দেখেছেন সমর্থনকারী হিসেবে, যেমনটা দেখেছেন আহ্লুল আছারগণ (ঐতিহ্যপন্থী)।

এতদ্সত্ত্বেও, আমাদের যুগের কিছু লোক বলেন যে, আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদিসের বিশুদ্ধতা প্রত্যায়ন করেছেন। এই অভিমত কারো কাছেই কোনো অর্থ বহন করবে না, যারা ঐ যুগের জ্ঞান ঘরানার মেজাজ সম্বন্ধে অবহিত এবং তাদের আলেমগণের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত। আবু হানীফা জ্ঞানের কূফী ঘরানা হতে এসেছিলেন, যার মধ্যে একত্রিত হয়েছিল ব্যবহারশাস্ত্র ও হাদিস, মহান সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। এই ঘরানা খলিফা আলী ইবন আবু তালিব রা.-এ জ্ঞান ও আশীর্বাদ নিয়ে গড়ে ওঠে। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি বলেন : আল্লাহ্ তায়ালা ইবনে উম্ম আবদকে (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ) দয়া করুন, কারণ তিনি নিঃসন্দেহে এই শহরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছেন।

এটা বিশেষভাবে অভিনব যে, যারা আবু হানীফা সম্বন্ধে যারা ঐরূপ মত দিয়েছেন, তারা এটা আরোপ করেছেন বিশিষ্ট বিদ্বান ইবনে খালদুন-এর প্রতি। এমনটা এই প্রবণতার কারণে তারা সংশ্লিষ্ট সমগ্র অনুচ্ছেদ অথবা তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গেও না জেনে বা এ ব্যাপারে অবহিত না হয়ে এমন ধরনের শব্দগুচ্ছ প্রকাশ করেন। আমরা যদি ইবনে খালদূনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখি যে, ভাববাচ্যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে (একটা সার্বজনীন পদ্ধতি যার সাহায্যে উল্লেখিত অভিমতে দুর্বলতার ইঙ্গিত করা হয়), তিনি এটাকে তাঁর নিজ অভিমত বলে তুলে ধরেননি (বা অবলম্বন করেননি); তাছাড়া তিনি এটা বলেছেন তা বাতিল হওয়ার পর।

> প্রশ্নাধীন এই পথ তার মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থে উলূমুলহাদিস (হাদিস বিজ্ঞান) অধ্যায়ে রয়েছে। নেতৃস্থানীয় মুজতাহিদগণ মতপার্থক্য করেছেন এই বস্তুর/বিষয়ের কতটুকু ও কত অল্প, সে প্রসঙ্গে অর্থাৎ হাদিস, যা তারা

সমর্থন/গ্রহণ করেছেন ও প্রচার করেছেন। এখন আবু হানীফা সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি সতেরটি হাদিসের কিংবা কাছাকাছি (পঞ্চাশ পর্যন্ত) বর্ণনা প্রচার করেছেন এবং ইমাম মালিক - আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়া করুন-মালিকের মতে বিশুদ্ধ যা কেবল তাই তার গ্রন্থের (আল-মুয়াত্তা) মধ্যে স্থান পেয়েছে। এদের সংখ্যা ৩০০ কিংবা এর কাছাকাছি। যেখানে আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার মুসনাদ গ্রন্থে গ্রহণ করেছেন ৩০,০০০ হাদিস। এঁদের প্রত্যেকেই তাঁদের কাছে বর্ণিত বিষয়সমূহের নিজ নিজ ন্যায়নীতি প্রয়োগ করেছেন।

এরপরেও কিছুসংখ্যক ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোঁড়া লোক বলে : তাদের মধ্যে একজনের [অর্থাৎ আবু হানীফা] হাদিস বিষয়ে সামান্যই জ্ঞান ছিল এবং এজন্য এর বর্ণনায় সামান্যই অবদান ছিল। কিন্তু মহামতি ইমামগণের ক্ষেত্রে এই মত প্রদানের কোনো অবকাশ নেই। কারণ বিধিবিধান বা হুকুম আহকাম চয়ন করা হয়েছে কেবল কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে এবং হাদিসের সম্পদে যার সামান্য অংশও আছে তিনি তা অন্বেষণ ও বর্ণনায় বাধ্য এবং তাতে অধ্যবসায়ী ও উদ্যমী, যাতে তিনি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে দ্বীনকে উদ্ধৃত করতে পারেন এবং নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন সেই লোকদের কাছ থেকে, যাদের এগুলো ছিল, যারা [পর্যায়ক্রমে] তা পৌছিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার কাছে থেকে। মহামতি ইমামদের মধ্য থেকে যারা হাদিস বর্ণনা কম করে ছিলেন, তাঁরা এমন ছিলেন বর্ণনা বিরোধীদের [বর্ণনাকরণে] কটাক্ষের কারণে এবং সেইসব ত্রুটি যা এর বর্ণনা পরম্পরাকে বাধাগ্রস্ত করেছে, বিশেষত যখন উৎসকে চ্যালেঞ্জ ও প্রশ্নবিদ্ধ করে, সমালোচনা অনেকের জন্য সেই সময় অগ্রাধিকার লাভ করে। অতঃপর ব্যক্তিগত রায় তাকে কোনো কোনো হাদিসের গ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখে এর প্রতি ঐ ধরনের বিরোধিতার কারণে, হাদিস ও এর সনদের সাথে যা সংশ্লিষ্ট। সেই সময় এর একটি বড় পরিমাণ ছিল। এতদ্সত্ত্বেও হিজাযের লোকেরা ইরাকের লোকদের চেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন, কারণ মদিনা ছিল হিজরতের পাদপ্রদীপ এবং সাহাবিদের আশ্রয়স্থল। তাদের মধ্যে যারা ইরাকে পুনঃবসতি স্থাপন করেন, তারা প্রায়ই জিহাদে ব্যস্ত থাকতেন। ইমাম আবু হানীফার হাদিস বর্ণনা এত স্বল্প ছিল, কারণ তিনি হাদিসের বর্ণনা ও বিশুদ্ধতার [পরিমাপে] শর্তাদির ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর এবং তিনি হাদিসকে দুর্বল ঘোষণা করতেন যদি

প্রতিষ্ঠিত যুক্তি এর বিরোধী হতো এবং তাই তিনি এটাকে জটিল বিবেচনা করতেন।

তিনি একারণে তার হাদিসের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করতেন এবং তাই তার হাদিস সংখ্যা কম হয়েছে। এটা এমন নয় যে, হাদিস বর্ণনা ছেড়ে দেওয়া তার পরিকল্পিত নীতি ছিল। কারণ এই যে, তার ঘরানায় যাদের সম্মতিতে এবং তার ওপরে যাদের নির্ভরতায় হাদিস উপস্থাপিত হতো তিনি ছিলেন হাদিস বিজ্ঞানের সেইসব মুজতাহিদের অন্যতম। হাদিস বর্জনে বা গ্রহণে তার রায় গ্রহণ করা হতো। এমন হাদিস বিশেষজ্ঞগণ [মুহাদ্দিসীন] ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা হাদিস গ্রহণের শর্ত শিথিল করে তাদের হাদিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সকলেই তাদের ব্যক্তিগত রায়ের ভিত্তিতে এমন করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর পরবর্তীতে তাঁর সহকর্মীগণ [ইরাকের আলেমগণের মধ্যে তার ছাত্র ও সহযোগীগণ] হাদিস গ্রহণের শর্ত শিথিল করে তাদের বর্ণনার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আল-তাহাবী [উদাহরণস্বরূপ] বিশাল আকারে এমন করে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার মুসনাদ রচনা করেছেন। দুটি সহিহ্‌'র মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ভুক্তদের একজন। তিনি এটা করার কারণ এই যে, সহিহ্‌করণে আল-বুখারি ও মুসলিম যেসব শর্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা উম্মাতের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে, ঠিক যেমনটা তারা [মুহাদ্দিসগণ] বলেছেন, আল-তাহাবী প্রদত্ত শর্তাদির বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি হাদিসের বিষয়[৫]।

এটাই হচ্ছে তাঁরা যা ইবনে খালদুন আবু হানীফা ও তার মাজহাব সম্পর্কে বলেছেন। এটাই হচ্ছে জ্ঞানসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক, যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ ও স্বচ্ছ অন্তরবিশিষ্টদের ভাষ্য।

সকল আইনবিদই সুন্নাহ্‌র সূত্র উল্লেখ করেন

আমরা পূর্ণাঙ্গ নিশ্চয়তা সহকারে বর্ণনা করতে পারি যে, বিভিন্ন ঘরানা, বিভিন্ন শহরের মুসলিম সম্প্রদায়ের আইনবিদগণ, যাদের মতবাদ টিকে রয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে, যারা অনুসৃত হন বা অনুসৃত হন না-তারা সুন্নাহ্‌ গ্রহণে এবং নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সুন্নাহ্‌'র সমর্থন গ্রহণের ব্যাপারে একমত ছিলেন। এই ক্ষেত্রে [যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে] রায়পন্থীগণ এবং হাদিসপন্থীগণ ছিলেন অভিন্ন। আল-বাইহাকী'র নিম্নে বর্ণিত প্রতিবেদনে এরই বিস্তারিত বর্ণনা মেলে :

উসমান ইবন উমার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একটি লোক মালিকের কাছে এল এবং তাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তখন মালিক তাকে বললেন : আল্লাহর রসুল এমন এমন বলেছেন। তখন লোকটি বলল :

> এটাই কি আপনার অভিমত? একথা শুনে মালিক উদ্বৃত করলেন : ঐসব লোক সতর্ক হওয়া উচিত যারা তাঁর [রসুল] নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসুক কিংবা আপতিত হোক কঠিন শাস্তি (সুরা নূর, ২৪ : ৬৩)।

ইবনে ওয়াহাব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

মালিক বলেছেন : কখনই লোকদের মধ্যে ফতোয়া প্রদানকারী এমন একজন ছিলেন না যে একজন [লোকদেরকে] বললেন, আমি কেন ওটা বলেছি? লোকেরা এ বর্ণনায় সন্তুষ্ট হলো[৬]।

ইয়াহইয়া ইবনে যুরাইজ বলেন :

আমি দেখেছি একটি লোক সুফিয়ানের কাছে এলো এবং বলল : আবু হানীফার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কী রয়েছে? তিনি বললেন : তার কাছে কি ভুল মনে হয়? আমি তাকে বলতে শুনেছি : আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব থেকে নিই এবং যদি আমি না পাই [যা আমি খুঁজেছি] আল্লাহ তায়ালার কিতাবে বা তাঁর রসুল সা.-এর সুন্নাহ্য়, আমি তাঁর সাহাবিদের বর্ণনা গ্রহণ করি। আমি যাকে পছন্দ করি তার কথা নিই যাকে করি না এবং তার কথা বাদ দিই। কিন্তু তাদের অন্যদের কথায় আমি সায় দিই না। অতঃপর বিষয়টি ইবরাহীম অথবা আল-শা'বী ও ইব্ন সীরীন, আল হাসান ও আতা এবং ইবনুল মুসাইয়্যিব'র কাছে পৌছে - এবং তিনি লোকটিকে পরিমাপ করেন একথা বলে লোকেরা ইজতিহাদ করে এবং যেহেতু তারা করে আমিও ইজতিহাদ করি।

আল-রাবি থেকে, তিনি বলেন :

একদিন আল-শাফিঈ একটি হাদিস বর্ণনা করলেন এবং একটি লোক তাকে বলল : এটি কি গ্রহণ করবেন, হে আবু আবদুল্লাহ?" তারপর [আল-শাফিঈ] বললেন : যখন আমি আল্লাহর রসুল থেকে একটি সহিহ হাদিস বর্ণনা করি এবং তা' গ্রহণ না করি, তখন আমি তোমাদের কাছে প্রত্যায়ন করি যে, নিশ্চিতই আমার মন চলে গেছে!

আল-রাবি থেকে, তিনি বলেছেন :

যদি তুমি আমার গ্রন্থে আল্লাহর রসুল সা.-এর সুন্নাহ্বিরোধী কিছু পাও, তাহলে সুন্নাহ্ অনুযায়ী অভিমত পোষণ করো এবং আমার কথা পরিত্যাগ করো[৭]।

হাদিস ও ফিকহ-কে যুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা

যেহেতু সুন্নাহ্ হচ্ছে ফিকহ্'র মৌলিক উৎস, এক্ষেত্রে আইনবিদগণের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে হাদিস বিজ্ঞানে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। একইভাবে হাদিস বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য হচ্ছে ফিকহ্‌বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা। এই দুটির মধ্যে বিরাজমান জ্ঞানের ব্যবধান পূরণ করা উচিত। এটা এমন বিষয় যা বেশ কয়েক বছর পূর্বেই বলেছিলাম।

ফিকহশাস্ত্রের সর্বোত্তম গবেষকগণ হাদিসের নিয়মকানুন আয়ত্ত করেন না অথবা এর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের গভীরে যান না। বিশেষ করে তারা জারহ ও তা'দিল (গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদেরকে আনুপুঙ্খিক নিরীক্ষা) শাস্ত্রে প্রবেশ করেন না এবং তাই বর্ণনাকারীদেরকে নির্ভরযোগ্য বা দুর্বল হিসেবে শ্রেণিকরণের পরিস্থিতি উপলব্ধিতে ব্যর্থ হন। এর ফলে, নেতৃস্থানীয় হাদিস বিশ্লেষকদের পর্যালোচনায় যে হাদিস প্রতিষ্ঠিত বিবেচিত হয়নি, তা তাদের কাছে অভিন্ন মুদ্রা'য় পরিণত হয়। তাছাড়া এ ধরনের হাদিসগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বা বাধ্যতামূলক ও অনুকূলতার আইনী শ্রেণিতে নির্দেশনারূপে উদ্ধৃত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসময় এমনকি হাদিস হতে যুক্তি পেশ করেন ফেলে এমন হাদিস যার উৎস ও সনদ অজানা। মুহাদ্দিসগণের মধ্য থেকে একটি কথা ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়েছে : এটা আইনবিদদের হাদিস থেকে - যার দ্বারা তারা বুঝান যে, এর কোনো সুপরিচিত উৎস নেই।

অন্যদিকে, হাদিসের সর্বোত্তম চর্চাকারীগণ ফিকহ বা এর নীতিমালার জ্ঞানের উত্তম অধিকারী নন। এর বিধানাবলী আবিষ্কার এবং এর অমূল্য ভাণ্ডার ও সুক্ষ্মতা চয়নে তাদের কোনো দক্ষতা নেই। তারা এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, তাদের শাস্ত্রীয় বহুমুখিতা এবং তাদের লক্ষ্য অথবা তাদের ব্যক্তিগত বিচারবোধের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জ্ঞাত নন।

ফিকহ ও হাদিসের বিশেষজ্ঞগণের উভয় পক্ষই একটি অন্যটির জ্ঞানের অর্জনের ওপর জোর দিতে হবে, যাতে তাদের জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়। আইনবিদগণকে অবশ্যই হাদিস জানতে হবে, কারণ ফিকহ্'র অধিকাংশ সিদ্ধান্তই সুন্নাহ্ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। মুহাদ্দিসগণেরও ফিকহ জানা অপরিহার্য, যা জানা হচ্ছে তা বুঝার জন্য, একজন সামান্য বাহক মাত্র (নাকূল) না হওয়ার জন্য এবং যা জানা হচ্ছে তা বেঠিক পথে উপলব্ধিকে এড়াবার জন্য।

প্রাথমিক যুগের আলেমগণ এ চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর অসম্মানকে তারা নিন্দা করেছেন, এই সীমা পর্যন্ত যে, তাদের মধ্যকার সর্বোচ্চ শিক্ষিত, দৃষ্টান্ত

হিসেবে, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় : যদি এই ব্যাপারটি আমাদের হাতে থাকত তাহলে আমরা খেজুর ডাল (জারিদ) দ্বারা এমন প্রত্যেক মুহাদ্দিসকে আঘাত করতাম যারা ফিকহ নিয়ে ব্যস্ত নন এবং এমন প্রত্যেক ফকিহকে (আইনবিদ) তা করতাম, যারা নিজেরা হাদিস চর্চায় নিয়োজিত নন।

অবাক ব্যাপার হলো ফিকহ'র গ্রন্থসমূহে অনেক দুর্বল হাদিস রয়েছে। এখন অনেকেই কোনো কোনো আমলের (ফজিলত) শিক্ষাদানে অথবা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে দীর্ঘসময় অতিবাহনে (তারগিব) এবং তাঁর ভয় সৃষ্টিতে (তারহিব) এইসব দুর্বল হাদিসের ব্যবহার সমর্থন করেন। কিন্তু সাধারণ ঐকমত্য এই যে, অনুশাসন চয়নে দুর্বল হাদিস ব্যবহার করা যাবে না। এতদ্‌সত্ত্বেও, ফিকহ গ্রন্থসমূহে দুর্বল হাদিসের দেখা মেলে, অতিশয় দুর্বল ও মিথ্যা এবং কিছু এমন, যেগুলোর আসলেই কোনো উৎস নেই। এটা মহৎ হাদিস বিশেষজ্ঞকে হাদিসের উৎস সম্বন্ধীয় ঐসব সমালোচনা প্রবন্ধ (তাখরিজ উল হাদিস) সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছে, যা আইনবিদগণ তাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করে থাকেন। এই হাদিসগুলো মু'আল্লাক (ঝুলন্ত, অসমর্থিত) হিসেবে উদ্ধৃত অর্থাৎ এর কোনো সনদ নেই। আল-জাওযী উৎস-বিচারমূলক এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, 'আল-তাহকিক ফি তাখরিজ আল-তা'আলিক নামে, যা তার পরবর্তীতে, ইবন আবদুল হাদী তাঁর তানকিহ আল-তাহকিক গ্রন্থে পরিমার্জন করেছেন।

কতিপয় হুফ্‌ফায সেইসব হাদিসের উৎসবিচার সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলো প্রশংসিত ও বিখ্যাত ফিকহ লেখনীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে নাস্‌ব আল-রায়াহ লি-আহাদিস আল-হিদায়া নামক গ্রন্থ, গ্রন্থকার হচ্ছেন আল-হাফিয জামিল আল-দীন আল-যায়লায়ী (মৃত্যু : ৭৬২ হি.)। এটা বিভিন্ন সময়ে চার খণ্ডে ছাপা হয়েছে। আল-হাফিয ইবনে হাজার তাঁর গ্রন্থ আল-দিরায়াহ ফি তাখরিজ আহাদিস আল-হিদায়াতে-এর সারসংক্ষেপ করেছেন। এতে তিনি কিছু তথ্যমূলক ও নির্দেশনামূলক নোট সংযোজন করেছেন। এটা একক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। হিদায়া হচ্ছে হানাফি ফিকহ'র অন্যতম মূল গ্রন্থ। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ইবনে হাজারের হাদিসের উৎস বিচারমূলক গ্রন্থ ফতহুল আযিয ফী শারহ আল-ওয়াজিয। শারহ আল-ওয়াজিয হচ্ছে আল-গাজ্জালির আল-ওয়াজিয এর ওপর আল-রাফিঈ লিখিত বিশাল ভাষ্যগ্রন্থ। ইবনে হাজারসহ একদল আলেম তাঁর বিখ্যাত তালখিসুল হাবির গ্রন্থে এর উৎস উন্মোচন করেন। আল-রাফিঈর ভাষ্য হচ্ছে শাফিঈ ফিকহ'র প্রধান মূল পাঠের অন্যতম।

কিছু আইনবিদ নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের পরবর্তীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুর্বল শ্রেণির হাদিসের ওপর আস্থাশীল হয়েছেন। সুতরাং তাদের ওপর আস্থাশীল হওয়ায়

ক্ষমা করা যেতে পারে। কিন্তু যাদের কাছে তাদের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে তাদের জন্য তাদের প্রতি নির্ভর করা ক্ষমার্হ নয়। দুর্বল বা যঈফ বলে প্রতিষ্ঠিত হাদিসের ভিত্তিতে নির্দেশনার অধিকার পরিত্যক্ত হয়েছে, যতক্ষণ ঐ নির্দেশনার অন্য আইনের মূলগ্রন্থ বা এর সাধারণ নীতিমালা বা সামগ্রিকভাবে এর লক্ষ্য বিষয়ে প্রমাণ (দলিল) না থাকে। এমনটা করার অধিকার সম্বন্ধে সহজেই দেখা যেতে পারে প্রচলিত ঘরানাগুলোর উৎসবিচার সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ফিকহ্ গ্রন্থাদিতে। উদাহরণস্বরূপ, আল-যায়লায়ী লিখিত নাসব আল-রায়াহ লি-আহাদিস আল-হিদায়া; ইবনে হাজার লিখিত তালখিসুল হাবির ফি তাখরিজ আহাদিস শারহ আল-রাফি' আল-কাবির; আল-আলবানি লিখিত ইরওয়া আল-গালিল ফি তাখরিজ আহাদিস মানার আল-সাবিল (মানার আল-সাবিল হাম্বলি ফিকহ্ গ্রন্থাদির অন্যতম) এবং আহমাদ ইবনে সিদ্দীক আল-গামারী লিখিত আল-হিদায়া ফি তাখরিজ আহাদিস আল-বিদায়াহ (আল-বিদায়াহ ইবনে রুশদ এর বিদায়াত আল-মুজতাহিদ হতে নিঃসৃত)।

জাকাতের ফিকহ্ নিয়ে গবেষণাকালে আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, ফিকহপন্থী ঘরানার বিদ্বানগণ কিছুসংখ্যক হাদিসের ওপর নির্ভর করেন এবং এগুলো হাদিসের নেতৃস্থানীয় বিদ্বানগণ চ্যালেঞ্জ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ :

শাকসবজির ওপর কোনো সদকাহ নেই।

উশর ও খারাজ একত্র করবে না।

জাকাত ব্যতীত সম্পদের ওপর কোনো কর [হক] নেই।

শেষ হাদিসটি আইনবিদদের নিকট সুপরিচিত। এদের মধ্যে কিছু মহৎ ব্যক্তি এটা উদ্ধৃত করেন। উদাহরণস্বরূপ আল-আহকাম আল-সুলতানিয়া গ্রন্থে আল-মাওয়ার্দি, আল-মুহায্যাব গ্রন্থে আল-শিরাযী এবং আল-মুগনী গ্রন্থে ইবনে কুদামাহ। আল-মাজুমাআ গ্রন্থে আল-নাবাবী এ সম্পর্কে বলেন : এটা অত্যন্ত দুর্বল হাদিস; এটা অপরিচিত। তার পূর্বে আল-সুনান গ্রন্থে আল-বায়হাকি বলেন : আমাদের সহকর্মীগণ তাদের ভাষ্যে এটা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি এর কোনো ইসনাদ স্মরণ করতে পারি না। ইবনে মাজাহ, তিরমিজি ও আল-তাবারির তাফসির অনুযায়ী এই হাদিসটির প্রকৃত রূপ হচ্ছে : জাকাত ছাড়াও সম্পদের হক [অধিকার] রয়েছে। আসলে ইবনে মাজাহ'র বিশেষ প্রতিলিপিতে একটি সুপরিচিত নকল প্রমাদ ঘটেছে এবং লাইসা শব্দটি হাদিসের শুরুতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই প্রমাদই ছড়িয়ে গেছে এবং স্থায়ী হয়েছে। আবু যারাহ ইবনুল হাফিজ যাইনুদ্দীন আল-ইরাকী তারহ আল-তাশরিব ফি শারহ আল-তাকরিব (চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্টা ১৮) নামক গ্রন্থে এই ভুলটি ধরিয়ে দেন। আহমদ শাকীর আল-তাবারীর তাফসির (প্রতিবেদন নম্বর

২৫২৭) এর উৎস বিচারমূলক গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি এর বিপক্ষে কতকগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করেন যা মন ও হৃদয়কে স্থিত করে।

ফিকহ এবং এর বিভিন্ন বিভাগের (আবওয়াব) ওপর লিখিত অনেক গ্রন্থে এই ধরনের হাদিস রয়েছে অর্থাৎ এমন হাদিস যার সনদ হুফ্ফাযগণের কাছে অপরিচিত। নাস্ব আল-রায়াহ গ্রন্থে আল-যায়লায়ী এসব হাদিসকে গারিব (অজানা) বলে চিহ্নিত করেন। এটা তার কাছে একটা অদ্ভুত শব্দ, এমন নির্দেশক যে, তিনি এ হাদিসের জন্য কোনো সনদ দেখতে পাননি। একই বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে হাজার দিরায়াহ গ্রন্থে এমনভাব প্রকাশ করেন আমি এটা দেখিনি বা এটাকে আমি মারফূ মনে করি না কিংবা এধরনের শব্দাবলী। ফিকহ'র কিছু বিভাগে এমন অনেক হাদিস রয়েছে, বাস্তবিকই এত বেশি, যে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কুরবানির জবাই বিষয়ের ওপর হাদিস অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমি আল-দিরায়াহ গ্রন্থে কুড়িটিরও বেশি হাদিস দেখেছি, এর কিছু সহিহ ও কিছু যঈফ এবং কিছু সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, তিনি এটা জানতেন না বা দেখেননি। কিছু দৃষ্টান্ত :

হাদিস

তাদের [পারসিক পুরোহিতদের] সাথে এমন সম্পর্ক রক্ষা করো যা একইভাবে [সুন্নাহ্] আহলে কিতাবের সাথে রক্ষা করা হয়, তাদের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা এবং তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া ব্যতীত। (ইবনে হাজার বলেন : আমি এসব শব্দে এটা পাইনি। তিনি বুঝাতে চান : স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা ইত্যাদি শব্দগুলো যুক্ত করা হয়েছে)।

হাদিস

মুসলিমগণ আল্লাহ তায়ালার নাম নিয়ে জবাই করে, তাতে তারা আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করে থাকুক অথবা না করে থাকুক (ইবনে হাজার বলেন : আমি এসব শব্দে এটা দেখিনি)।

ইবনে মাসউদ এর হাদিস :

সাদৃশ্যপূর্ণকে বঞ্চিত করো [প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ (তাসমিয়্যাহ) বলো]

(ইবনে হাজার বলেন : আমি এসব শব্দে এটাকে পাইনি)।

হাদিস

উৎসর্গ [অর্থাৎ কর্তন] হবে ঐস্থানে যেটা বুকের ওপরে এবং চিবুকের নিচে (ইবনে হাজার বলেন : আমি এটা পাইনি)।

হাদিস

যা দিয়ে ইচ্ছা শিরা কেটে দাও (ইবনে হাজার বলেন : আমি এটা পাইনি)।

হাদিস

নবি সা. তোমাদেরকে ছাগলের শ্লেষ্মা ফেলে দিতে বলেছেন যখন তোমরা জবাই করবে (গ্রন্থকার বলেন : অর্থাৎ [যখন] ছুরি নিয়ে শ্লেষ্মার কাছে পৌঁছাবে) (ইবনে হাজার বলেন : আমি এটা দেখিনি)।

হাদিস

রসুল সা. আয়িশাকে টিকটিকি খেতে নিষেধ করলেন যখন তিনি (আয়িশা) এটা (খাওয়া যাবে কিনা) জানতে চান (ইবনে হাজার বলেন : আমি এমনটা দেখিনি)।

হাদিস

রসুল সা. বাগদা চিংড়ি বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন (ইবনে হাজার বলেন : "আমি এটা দেখিনি)।

এমনি একই রকম অন্যান্য হাদিস পাওয়া যায়[৮]।

যেমনটা বলা হয়, দুর্বল হাদিস উদ্ধৃতকরণে শৈথিল্য আহলুর রায় এর গ্রন্থাদিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে কেউ সাধারণভাবে বিদ্যমান আইনের ঘরানাসমূহের পুস্ত-কাদিতে দুর্বল হাদিস, এমনকি সূত্রবিহীন হাদিসও দেখতে পাবে। তবে, শৈথিল্য আরোপের ক্ষেত্রে ঘরানা হতে ঘরানার পার্থক্য রয়েছে।

তালখিসুল হাবির এর মধ্যে ইবনে হাজার আল-রাফী কর্তৃক লিখিত আল-গাজ্জালির আল-ওয়াজিয (এরা দুজনেই নেতৃস্থানীয় শাফিঈ) গ্রন্থের ভাষ্যের হাদিসগুলো খুঁজে পেয়েছেন। যে যুক্তির ওপর গ্রন্থটি দাঁড়িয়ে আছে তার ওপরে তিনি অনেকগুলো দুর্বল হাদিস সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাজার নিজে একজন শাফিঈ ছিলেন। কিন্তু কারো নিজ ঘরানার চাইতে সত্যকে অনুসরণ করাই অধিক শ্রেয়। একইভাবে, আল-হাফিয আবু বাকর আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আল-বায়হাকি (মৃত্যু : ৪৫৭ হি.) আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আল-জুওয়াইনি (মৃত্যু : ৪৩৮ হি.; ইমাম আল-হারামাঈনের পিতা) এর কাছে একটি শালীন

সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। এতে কিছু ভ্রান্তিপূর্ণ হাদিস ও অনুমান সম্পর্কিত আলোচনা ছিল যা তার গ্রন্থ আল-মুহিতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই গ্রন্থের একেবারে প্রথম হাদিসটি সূর্যালোকের দিকে উন্মুক্ত পানি দ্বারা গোসল নিষিদ্ধ করা সম্পর্কিত। এটা একটা উদাহরণ। এটা একটা হাদিস যা সহিহ্ বলে প্রত্যায়িত নয়।

আল-বায়হাকির স্বচ্ছ অন্তঃকরণের প্রতি শ্রদ্ধা যে, তিনি তার শাফিঈ সহকর্মীদের মধ্যকার হাদিস বিশেষজ্ঞদেরও সমালোচনা করেছেন। তিনি তাদের শৈথিল্যকে সমালোচনা করেছেন। কারণ যুক্তিপ্রদর্শনের ভিত্তি হিসেবে শুদ্ধ বর্ণনা এবং এমন সব বর্ণনা যা শুদ্ধ নয়-তার মধ্যে তারা কোনো প্রকার পার্থক্য পরিহার করেছেন। তিনি দুর্বল ও অপরিচিত বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণনার জন্য এবং অন্যান্য দুর্বলতার জন্য তাদেরকে সমালোচনাবিদ্ধ করেছেন তাঁর আল-রাসিনাহ আল-রাকিনাহ নামক গ্রন্থে[৯]।

বাস্তবিকভাবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, ব্যবহারশাস্ত্রের নীতিমালা (উসূলে ফিকহ্) বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে দুর্বল ও জাল এবং উৎসহীন হাদিসের অভাব নেই। এই হাদিসটি একটি উদাহরণ : আমার সাহাবিরা নক্ষত্রের মতো; তাদের মধ্যে যার দ্বারাই পরিচালিত হও না কেন, সে-ই তোমাদেরকে পথ দেখাবে। এটা অত্যন্ত দুর্বল হাদিস। প্রকৃতকথা এই যে, শায়খ আল-আলবানি এটাকে জাল হাদিস বলে প্রমাণ করেছেন। আরেকটি হচ্ছে : একজন মুসলিমের চোখে যা উত্তম, তা আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতেও উত্তম। আসলে এসব ইবনে মাসউদের উক্তি, মারফু হাদিস নয়, যাতে তা রসুল সা.-এর সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। আরও একটি এরকম : আমার উম্মাতের ইখতিলাফ হচ্ছে রহমাত[১০]। এছাড়া আরো অনেক এমন হাদিস রয়েছে যা উসূলে ফিকহ্‌র গ্রন্থাদিতে মশহুর এবং ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত।

ফিকহ্'র উত্তরাধিকারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংশোধনের দায়িত্ব

আমাদের সময়ের বিদ্বান সম্প্রদায়ের, আলেমগণের একটি কর্তব্য হলো ফিকহ্'র উত্তরাধিকারের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তা হতে হবে ফিকহ্ ও এর নীতিমালার সাথে সংযুক্ত হাদিসের জ্ঞানের আলোকে, অন্তঃপ্রবিষ্ট ও ধারণাগত যুক্তি সহযোগে এবং দুর্বল হাদিসমূলে প্রবর্তিত অনুশাসনসমূহ অনুসন্ধান করে। কারণ এটা স্বীকৃত যে, দুর্বল হাদিসের সহায়তাপূর্ণ কোন হুকুম সমর্থিত হবে না। কেউ হালাল ও হারামের বাধ্যবাধকতা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে না। এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ঐসব হুকুমআহকাম (যা আইনী আদেশ ও সম্মিলিত কর্তব্যের সাথে যুক্ত) যার দুর্বল হাদিস ব্যতীত কোনো কর্তৃত্বশীল ভিত্তি নেই, সেগুলো বেরিয়ে আসবে। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

অমুসলিমের জন্য রক্ত পণ

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফৌজদারি বিধিমতে, কিভাবে আইনসম্মতভাবে জিম্মিদের রক্তপণ নির্ধারণ করা হবে? অধিকাংশ আইনবিদ মনে করেন যে, আহলে কিতাবের জন্য জিম্মির জিযয়া, আরো সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলামি শাসনের আওতাধীন (দারুল ইসলাম, যেভাবে আইনবিদগণ এটাকে উপস্থাপন করেন) লোকদের জন্য মুসলিমের রক্তপণের অর্ধেক[১১]। এ ব্যাপারে তাদের পক্ষে কতকগুলো হাদিস মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে দেখা যায়। উভয় গ্রন্থের একটিতেও সহিহ হাদিস নেই। বরং এগুলো এমন হাদিস যা আলেমদের একদল সহিহ দাবি করলেও অন্যরা বাতিল করেছেন। উদাহরণ হিসেবে, তার পিতা ও দাদা থেকে আমর বিন শুয়াইব বর্ণিত হাদিস যে, নবি সা. বলেন : মুসলিমের রক্তপণ হচ্ছে অবিশ্বাসীদের রক্তপণের অর্ধেক। আহমদ বিন হাম্বল এর বর্ণনাকারী, যেমন আল-নাসায়ি ও আল-তিরমিজি। পুনরায় আহমদ ও আল-নাসায়ি এবং ইবনে মাজাহ্‌ও ভিন্নভাবে বর্ণনা করেন : তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, দুই কিতাবের অনুসারীদের (ইহুদি ও খ্রিস্টানদের) রক্তপণ হচ্ছে মুসলিমের রক্তপণের অর্ধেক। [এখানে রক্তমূল্য (bloodwit) ও রক্তপণ (blood money) একই অর্থ বহন করে]।

অন্যান্য আলেম মনে করেন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রক্তপণ হচ্ছে মুসলিমের এক-তৃতীয়াংশ। তাদের এ ধরনের বর্ণনায় দেখা যায়, তাদের মত অনুযায়ী উদ্ধৃত হাদিস প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অন্যদিকে, আল-ছওরী, আল-যুহরী, যায়ীদ ইবনে আলী ও আবু হানীফা এবং তার প্রভাবশালী অনুসারীগণ মনে করেন যে, মুসলিমের রক্তপণ জিম্মির সমানই। তারা হাদিস ও আসারসহ উল্লেখ করেন যে, নবি সা. ও মুসলিমের নিয়ন্ত্রিত বন্দির রক্তপণ মুসলিমের সমান করেছেন এবং তিনি মুসলিমের জন্য রক্তপণ ঐ রকম দিয়েছেন যা একজন জিম্মির জন্য প্রাপ্য ছিল। কিন্তু যেসব আলেম এ হাদিসের সাথে একমত নন তারা এটাকে যঈফ গণ্য করেছেন।

বাস্তবতা হলো এই যে, দুই বিরোধী মতবাদের কোনোটিই সহিহ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি এবং এর কোনোটিই আহকাম হিসেবে গণ্য হয়নি। তাই, আইনের মূল পাঠ এবং সামগ্রিকভাবে এর লক্ষ্যসমূহ অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন যদি আমরা কুরআনের দিকে দৃষ্টি ফেরাই, আমরা দেখি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে এটা অভিন্ন, তা সে মুসলিমই হোক অথবা মুসলিমের সাথে চুক্তিবদ্ধ লোকজনই হোক। উভয় ক্ষেত্রেই দায় হচ্ছে :

> রক্তপণ তার লোকদেরকে দিতে হবে এবং মুমিন গোলাম (দাস) আজাদ হবে (সূরা নিসা, ৪ : ৯২)।

এবং এটা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য করে না। এটা মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে রক্তপাতের ক্ষেত্রে অভিন্ন এবং মহান মানবতার আবেগ ধারণকারী লোকদের প্রতি সমান আচরণের ক্ষেত্রে, বিশেষত স্বদেশের লোকদের মধ্যে, ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে, একটি একক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সহযোগী-নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা সেই মতবাদ যা অনুযায়ী কয়েক শতাব্দীব্যাপী ইসলামি সরকারসমূহ শাসন করেছে আব্বাসীয় ও উসমানী খিলাফতের আমলে। তবে, বর্তমানের পরাশক্তিসমূহ অমুসলিম সংখ্যালঘুদের আইনগত মর্যাদাকে ব্যবহার করতে চায়, এই অভিযোগে যে, তারা দলিত এবং তাদের জন্য সমান আচরণ ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্রের ফৌজদারী বিধিমালায় নেই।

স্ত্রীলোকের জন্য রক্তপণ

স্ত্রীলোকের জন্য রক্তপণের ক্ষেত্রে মহান আইনবিদগণের অধিকাংশই মনে করেন যে, এটা পুরুষের অর্ধেক। তারা তাদের বিষয়টিকে মুয়াজ হতে মারফূ হাদিসের ওপর ন্যস্ত করেন এই বলে যে, নবি সা. বলেন : একজন স্ত্রীলোকের রক্তপণ একজন পুরুষের অর্ধেক। আল-বায়হাকি এর সনদের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বলেন: এর সনদ প্রতিষ্ঠিত (সমর্থিত) নয়। তিনি আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আলী) বলেন, স্ত্রীলোকদের রক্তপণ (হিসাবমতে) পুরুষের রক্তপণের অর্ধেক। এটা আলী থেকে ইবরাহীম আল-নাখয়ীর একটা বর্ণনা। ইবনে আবী শুয়াইবও এটা বর্ণনা করেন, যিনি ইবরাহীম হতে শা'বীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এটা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মৌকুফ (সাহাবি পর্যন্ত এসে সমাপ্ত) এবং আইনে অ-মারফূ [অর্থাৎ খোদ নবি সা. হতে নয়] সাব্যস্তকরণে জোরদার নয়। পুরুষলোকের ও স্ত্রীলোকের জরিমানা সম্পর্কে বিশদ নেই অর্থাৎ আঘাত কিংবা একই ধরনের কোনোকিছুর জন্য একটিমাত্র হাদিসও প্রতিষ্ঠিত নেই।

সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে তারা তাদের বিষয়কে ইজমা বা ঐকমত্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এখন ইজমা একটি প্রমাণ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে ইজমা প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ লোকেরা বর্ণনা করেছে যে, এই বিষয়ের ওপরে সালাফ (পূর্ববর্তী) আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ দুজন হচ্ছেন আল-আসিম ও ইবন আল-আলবাহ। তাঁদের মতে, রক্তপণ স্ত্রীলোকের জন্য তেমনই যেমন পুরুষের জন্য[12]।

ইসলামের মনোভাবের ব্যাখ্যা

একটি সহিহ হাদিস খোঁজ করা হয় ইবাদতের বিষয়াদি, প্রতিদিনের কার্যাবলী এবং বৈধ-অবৈধ সংক্রান্ত সমাধানের জন্য, খোঁজ করা হয় ইসলামের মনোভাব উপলব্ধিতে ভাব, শিক্ষা, উত্তম আচরণ ও অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্য। যদি উদাহরণস্বরূপ, আমরা পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামের মনোভাব ব্যাখ্যার ইচ্ছা করি এ জীবনে অস্বীকৃতি অথবা উত্তম বস্তুসমূহ আত্মস্থ করার জন্য, সেক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসসমূহ যথেষ্ট হবে না। একই ধরনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি নির্ভরতায় ইসলামের মনোভাব (তথাকথিত প্রাকৃতিক অথবা মাধ্যমিক); প্রতিষেধক ঔষধাদি বা আরোগ্যকর ঔষধাদি; জন্তুজানোয়ার ও গাছপালার সংরক্ষণ; বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিদর্শনাদি; অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও মোজেজা বিয়য়ে ইসলামের মনোভাব।

এসব বিষয় এবং এগুলোর মতো অন্যান্য বিষয়ে মতানৈক্যপূর্ণ হাদিসগুলো উদ্ধৃত করা যথেষ্ট নয়। বরং ঐসকল হাদিসকে অবলম্বন করা আবশ্যক যেগুলো প্রমাণের দিক থেকে মজবুত ও প্রত্যায়িত এবং উপস্থাপনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তাছাড়া কারো উচিত নয় প্রাসঙ্গিক একক হাদিসে সন্তুষ্ট থাকা। বরং নীতি এমন হবে যাতে অনেক হাদিস ঐ ছবির ওপর আলোকপাত করে এবং এই অথবা ঐ বিষয়ে ইসলামের মনোভাবকে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করে। অবশ্য এটা ব্যতীত, যখন তা কুরআনের আয়াত হবে এবং অতঃপর তা হবে উৎস ও উদ্ধৃতির ক্ষেত্র।

২. প্রচার ও নিদের্শনায়

কুরআনের পর নবি সা.-এর সুন্নাহ্ হচ্ছে অক্ষয় উৎস ও ধনাগার, যার ওপর ধর্মীয় শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক ও পরিচালকগণ তাদের পাঠ ও বক্তৃতা সংগ্রহ করতে পারেন। কারণ, যেহেতু সুন্নাহ্ হচ্ছে আদেশ নিষেধের বিধিমালা তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনের ও ইবাদতের নিয়মাবলী নির্ধারণে ফিকহ'র সর্বসম্মত উৎস, তাই এটাই আত্মা শুদ্ধিকরণের সর্বসম্মত উৎসও। একারণেই উম্মাতের মধ্যে সম্মানপ্রাপ্ত প্রাথমিক যুগের তাসাউফপন্থী মহান ব্যক্তিগণসহ আত্মা সংক্রান্ত শিক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাকে সুন্নাহ্‌র অপরিহার্য বন্ধনে আবদ্ধ করতে অবিসংবাদিতভাবে একমত। ইমাম আল-জুনায়েদ (রহ.) বলেন : যারা আল্লাহর রসুল সা.-এর পথ অনুসরণ করে, তাদের গৃহীত পথ ব্যতীত অন্য সকল পথই রুদ্ধ এবং যে ব্যক্তি কুরআন হিফয করল না এবং হাদিস লিপিবদ্ধ করল না এক্ষেত্রে তাকে [সুফিবাদ] অনুসরণ করা যাবেনা, কারণ আমাদের এই জ্ঞান কিতাব ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুফিদের পথ অনুসরণকারীদের অন্যতম নেতা

আবু হাফস বলেন : যে ব্যক্তি তার কার্যাবলী ও অবস্থানকে কুরআন ও সুন্নাহ্র দ্বারা বিচার করে না, যে তার প্রবৃত্তিকে ভৎর্সনা করেনি, তাকে মানুষের খাতায় গণনা করা হয়নি। আবু সুলায়মান আল-দারানী বলেন : জনগণের কাহিনীর মধ্যে কোন কাহিনী আমাদের অন্তরে কয়েক দিনের জন্য প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু আমি কোনো কিছু গ্রহণ করি না ঠিক দুটো সাক্ষী ছাড়া : কিতাব ও সুন্নাহ্। আহমাদ বিন আবী আল-হাওয়ারী বলেন : যে ব্যক্তি সুন্নাহ্ অনুসরণ না করে আমল করে, তার আমল বিনষ্ট হয়েছে।

সুতরাং ফিকহ্'র ছাত্র ও ব্যবহারকারীদের মতোই শিক্ষক ও প্রচারকগণ সুন্নাহ্র চাহিদাসম্পন্ন। সুন্নাহ্র মধ্যে তারা উজ্জ্বল নির্দেশনা পান, অকাট্য যুক্তি পান এবং বাগ্মিতাপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন, সংক্ষিপ্তসার (চুম্বক শব্দাবলী) ও সূত্র পান, পান প্রভাবক পরামর্শ, নীরব দৃষ্টান্তসমূহ এবং উপদেশপূর্ণ কাহিনী; বিচিত্র ধরনের আদেশ ও নিষেধ, আল্লাহ তায়ালার জন্য দীর্ঘ কিয়ামের প্রেরণা ও ভয়ের সতর্কতা, কঠোর হৃদয়কে কোমল করতে, ক্ষয়িষ্ণুকে জীবনদান করতে ও বিস্মৃতিপ্রবণ মনকে জাগাতে পান অনুপ্রেরণা। কুরআনের কাঠামোর মধ্যে বিস্তৃত সুন্নাহ্ সমস্তকিছুকে উদ্দেশ্য করে মন, হৃদয় ও বিবেককে, পরিপূর্ণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনে সাধনাকে সহায়তা করে- এমন একটি মন তৈরি করে যা সতর্ক, একটি হৃদয় যা বিশুদ্ধ, এমন সংকল্প যা সবল এবং এমন শরীর যা সামর্থ্যবান।

এর ওপর নির্ভরশীল বিষয়সমূহের সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ্ থেকে এর উৎস গ্রহণ করা। সর্বপ্রথমে বলতে হয়, সহিহ আল-বুখারি এবং সহিহ মুসলিম-এদুটোই উম্মাতের কাছে অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত। এ দুটোর কোনোটিই সমালোচিত নয়, মাত্র গুটিকতক হাদিস ব্যতীত। এ দুই গ্রন্থের পরে সুন্নাহ্র অন্যান্য গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত গ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে চারখানি সুন্নাহ্ গ্রন্থ (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি ও ইবনে মাজা), মালিকের মুয়াত্তা, আহমাদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ, দারিমী'র সুনান, ইবনে খুযায়মাহ্র সহিহ, সহিহ ইবনে হিববান, মুস্তাদরাক আল-হাকিম, আবু ইয়ালা ও বায্যারের মুসনাদদ্বয়, তাবারানির আল-মা'আজিম এবং আল-বায়হাকির শু'আব আল-ইমান। এরপর অন্যান্য গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর হাদিস সমূহকে বিশেষজ্ঞগণ সহিহ কিংবা হাসান বলে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেক দাওয়াতদাতারই কর্তব্য হচ্ছে ঐসব হাদিসের ওপর নির্ভর না করা, যেগুলো যঈফ বা প্রত্যাখ্যাত কিংবা জাল বলে চিহ্নিত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এধরনের হাদিসগুলোই খতিব ও ধর্মীয় পরামর্শকদের সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে এইসব গ্রন্থের মূলপাঠ ইতোমধ্যেই মুদ্রিত সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। সুন্নাহ্র সেবক মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকীকে ধন্যবাদ, আল্লাহ

তায়ালা তাকে দয়া করুন, মুয়াত্তা মালিক, সহিহ্ মুসলিম এবং সুনান ইবনে মাজাহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এর হাদিসগুলোকে ক্রমিক নম্বর প্রদান করে ইনডেক্সভুক্ত করা হয়েছে।

একইভাবে সুনান আবু দাউদ এবং সুনান তিরমিজিও প্রকাশিত হয়েছে ইয্যত উবায়িদ আল-দা'স কর্তৃক। আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহকে আল্লাহ তায়ালা দয়া করুন, তিনি নাসায়ি'র কিতাব সম্পাদনা করেছেন আল-মু'জাম আল-মাফারিস লি আল-আলফাজ আল-হাদিস-এর রীতি অনুযায়ী।

এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রিজাল এবং হাদিসের স্তর নির্ধারণ, সহিহ্ ও দূষণযুক্ত হাদিস পৃথক করা। এক্ষেত্রে শায়খ নাসির আল-দীন আল-আলবানি, হাদিস বিশেষজ্ঞ, নিম্নবর্ণিত সমালোচনা গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন : সহিহ্ ইবনে মাজাহ, সহিহ্ আল-তিরমিজি এবং সহিহ্ আল-নাসায়ি। তার সহিহ্ আবী দাউদ যন্ত্রস্থ। এভাবে আরো সমাপ্তির পথে রয়েছে সহিহ্ ইবনে হিববান'র অংশবিশেষ, সনদ পর্যালোচনাসহ সম্পাদনা করেছেন শু'আইব আল-আরনা'উত। এর পূর্বে, মুস্তফা আল-আ'যামী সহিহ্ ইবনে খুযায়মাহ সম্পাদনা এবং আল-আলবানির সাথে একত্রে উৎস-বিচার করে প্রকাশ করেছেন।

এর পূর্বে, মুসনাদ আহমদ এর পনেরটি খণ্ড পাওয়া যায়, সনদ বিচারসহ সম্পাদনা করেন আহমাদ মুহাম্মাদ শাকীর, এর সম্পূর্ণটা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। শায়খ আহমাদ আবদুর রহমান পূর্বেই মুসনাদকে বিষয়ে বিন্যস্ত করেছেন, এর ওপর ভাষ্য লিখেছেন এবং এটা তেইশ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এটাকে তিনি ফাতহুর রাব্বানী নাম দিয়েছেন এবং এর ভাষ্য হচ্ছে বালাগুল আ-মা-নি। শায়খ শাকীর ইবনে কাসীরের তাফসিরের ওপর কিছু প্রচেষ্টা চালান, নির্বাচন করেন, শুদ্ধ করেন, উৎস বিচার করেন। তিনি এটার নাম দেন 'উমদাত আল-তাফসির, তিনি এর পাঁচটি অংশ প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ করতে অসমর্থ হন। তিনি এবং তার সবচেয়ে শিক্ষিত ভাই, মাহমুদ মুহাম্মদ শাকীর ইমাম আল-তাহাবী (মৃত্যু : ৩১০ হি.)-এর দশ অংশেরও বেশি বের করেন এর মধ্যকার হাদিস ও আসার সমূহের সম্পাদনা ও উৎস-বিচারসহ। জ্যেষ্ঠ ভাই শায়খ আহমদের মৃত্যুর পর প্রফেসর মাহমুদ তার নিজেরটার পর আরো দু'খণ্ড বের করেন। তারপর এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ থেমে যায়।

আবদুর রায্যাক আল-সানা'আনী (মৃত্যু : ২১১ হি.)-এর আল-মুসান্নাফ এগার অংশে বের হয়, সম্পাদিত হয় ভারতীয় হাদিস বিশেষজ্ঞ শায়খ হাবিবুর রহমান আল আ'যামী কর্তৃক; ভারতীয় আল-দার আল-সালাফিয়্যাহ হতে শায়খ মুখতার আল-নাদভী কর্তৃক সম্পাদিত মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা (মৃত্যু : ২২৫ হি.) প্রকাশিত হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহও বের হয়। মিশকাতউল মাসাবিহ্, লেখক শায়খ আল-খাতীব আল-তাবরিযী (মৃত্যু : ৭৩২ হি.), সংক্ষিপ্ত উৎস-বিচারসহ আল-আলবানি কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আল-আলবানি আল-সুয়ূতীর সহিহ্ আল-জামী আল-সাগির এবং এর সম্পূরক গ্রন্থের সহিহ্ হাদিসগুলোকে যঈফ হতে পৃথক করেন এবং সেগুলোকে দুটো পৃথক খণ্ডে প্রকাশ করেন। আবদুল কাদীর আল-আরনা'উত ইবনুল আসীরের (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) জামীউল উসূল সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

নূর আল-দীন আল-হায়সামির (মৃত্যু : ৮০৭ হি.) মাজমা আল-জাওয়ায়িদ কিছু পূর্বেই বের হয়, কিন্তু সম্পাদিত হয়নি-এর বৈশিষ্ট্য পার্থক্য হচ্ছে, গ্রন্থটি সহিহ্ ও যঈফ হাদিস বিচার করে এবং হাদিসের ছয়টি গ্রন্থ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে : মুসনাদ আহমাদ ও মুসনাদ আল-বায্যার ও মুসনাদ আবু ইয়ালা এবং মা'আজিম আল-তাবারানির তিনখণ্ড। আমার মনে হয় এ তিনটি গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে, যদিও আমি আমাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি সম্পর্কে বর্তমান সময়ের সম্পাদনাকারীদের ব্যাপারে শঙ্কিত। তারা ভাষ্যের আধিক্য যুক্ত করে বই সম্পাদনা করে থাকেন, যার মাত্র সামান্যই প্রয়োজন রয়েছে এবং যা তারা প্রতিটি বইতেই পুনরাবৃত্তি করেন, গরিব পাঠকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার মানসে কেবল আকার বৃদ্ধি করেন।

যেসব বই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু সম্পাদিত হয়নি বা উৎস যাচাই করা হয়নি সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : মুসতাদরাক আল-হাকিম (মৃত্যু : ৪০৫ হি.) এবং আয্-যাহাবী (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.) কর্তৃক এর সারসংক্ষেপন। গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে উদাহরণ রয়েছে সেগুলোর যেগুলো সম্পাদিত ও উৎসযাচাইকৃত। এর মধ্যে রয়েছে : যাদ আল-মা'আদ, লেখক ইবনুল কাইয়্যিম (মৃত্যু : ৭৫১ হি.), সম্পাদনা করেছেন শু'আইব আল-আরনাউত, আল-রিসালাহ পাঁচ খণ্ডে এটি প্রকাশ করেন পরিশিষ্ট সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ খণ্ডসহ এবং রয়েছে আল-নববী (মৃত্যু : ৬৭৬ হি.)-এর রিয়াদুস সালেহীন। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্শীবাদধন্য ও অপূর্ব। শু'আইব আল-আরুনাউত ও আল-আলবানি এর সম্পাদনা করেন এবং এর সকল উৎস যাচাই করেন।

আল-ইহ্সান ফি তাকরিব সহিহ্ ইবন্ হিব্বান এর উৎসে সমালোচনা এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। শাইখ শু'আইব আরনাউত ষোল খণ্ডে, পরিশিষ্টের জন্য আরো দুটি খণ্ডসহ, এটিকে সম্পাদনা করেছেন। তিনি আল-রিসালাহ'রও সম্পাদনা করেন।

একই ধরনের হাদিসের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঐটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মুসনাদ ইমাম আহমাদ, চল্লিশেরও বেশি খণ্ডে প্রকাশিত, শায়খ শু'আইব কর্তৃক সম্পাদিত। তার

সাথে ছিলেন তার পাঁচজন বিশিষ্ট বিদ্বান সহকর্মী। সৌদি সরকারের সহায়তায় আল-রিসালা-এর প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে।

এখানে কারো কর্তব্য হচ্ছে পুরাতন উৎস-পরীক্ষা গ্রন্থাদির সূত্রে উপকৃত হওয়া। উদাহরণস্বরূপ, যইন আল-দীন আল-ইরাকী কর্তৃক (মৃত্যু : ৮০৭ হি.) আল-গাযালীর (মৃত্যু : ৫০৫ হি.) আল-ইহ্‌য়া গ্রন্থের হাদিসসমূহ বিশ্লেষণ, যিনি এটাকে আল-মুগনী 'আন হামল আল-আফসার ফি তাখরিজ মা-ফী আল-ইহ্‌য়া মিন আল-আখবার নামে অভিহিত করেছেন। ইহ্‌য়া সম্পর্কে প্রান্তিক নোটসহ এটা মুদ্রিত হয়। আল-ইহ্‌য়া পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, এটার উদ্ধৃতি দেওয়া। মানুষ জানে গাযালী কর্তৃক উদ্ধৃত হাদিসের অবস্থান। কতগুলো অত্যন্ত দুর্বল হাদিস এতে রয়েছে, অন্যগুলোর কোনো উৎসই নেই এবং অন্যগুলো জাল বলে ঘোষিত! আরেকটি হচ্ছে ইবনে হাজার আল-আসকালানীকৃত তাফসির আল-কাশ্‌শাফ-এর মধ্যকার হাদিসের উৎস-বিচারি গ্রন্থ। এটা কুরআনের ভাষ্যকারগণ কর্তৃক উদ্ধৃত অনেক হাদিসের দৃষ্টিকোণ হতে প্রয়োজনীয় এবং এগুলো পরবর্তী ভাষ্যকারগণ নকল করেছেন।

প্রচার ও সতর্কীকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর অন্যতম হচ্ছে আল-মুনযিরীকৃত আল-তারগিব ওয়া আল-তারহিব। আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দয়া করুন। এই গ্রন্থের দুর্বলতা হলো-এর মধ্যে অনেক যঈফ হাদিস রয়েছে এবং এর কতকগুলো অতিমাত্রায় দুর্বল। এমনও হতে পারে যে, এগুলো এমনকি জাল হাদিসেরও নিম্নস্তরে, ঐ পর্যন্ত যে এটা আল-মুনযিরীরই নিজের মন্তব্য। কিন্তু অনেক সতর্ককারী ও খতিব আল-মুনযিরীর ভূমিকা পাঠ করেননি, যাতে তারা তাঁর কৌশল ও পরিভাষা জানতে পারেন। এ কারণই আমাকে পেছনে চালিত করে এবং এর জটিল বিষয়গুলো নির্বাচন করে (মুনতাফা) বইটির উৎকর্ষ সাধন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে এর অন্তর্ভুক্ত সহিহ ও হাসান পর্যায়েরগুলো, এর মধ্যে দুর্বোধ্যগুলো সম্বন্ধে নোট, এর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা এবং এর মধ্যে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব। সংক্ষেপে এটি সন্দেহ দূর করে এবং ভুল বুঝাকে শুদ্ধ করে। এর শিরোনাম হচ্ছে আল-মুনতাকা মিন আল-তারগিব ওয়া আল-তারহিব।

সুপরিচিত গ্রন্থাদির ভাষ্য সম্পর্কে বলতে গেলে, এগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ফাতহ আল-বারি ফি শারহ আল-বুখারি, লেখক ইবন হাজার। এটা সেই বই যার সম্পর্কে আল-শাওকানী (সুপরিচিত কথার মধ্যে মারপ্যাঁচসহ) বলেন : বিজয়ের পর হিজরত (বিজয়ের পর হিজরত নেই।) এর পূর্বেকার আল-বুখারির সমসাময়িক, এর পরবর্তী ভাষ্য রয়েছে। এর সবগুলোর ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণ হচ্ছে : আল-কিরমানী (মৃত্যু : ৬৭৫ হি.), আল-আইনী (মৃত্যু : ৮৫৫ হি.) এবং আল-কাস্তালানী (মৃত্যু : ৯২৩ হি.)।

সহিহ মুসলিমের ভাষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে শারহ্ আল-নববী, আল-ইয়্যাদ, আল-আরাবি ও আল-সানূসীর লিখিত গ্রন্থ। সাম্প্রতিক কালে একজন ভারতীয় আলেম, মাওলানা শাব্বীর আহমদ আল-উসমানী, ফাতহুল মুসলিম বি-শারহ সহিহ্ মুসলিম নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তিনি এটাকে চার অংশে বিন্যস্ত করেছেন, কিন্তু সমাপ্ত করেননি। আমাদের বন্ধু শাইখ মুহাম্মাদ তাকী আল-উসমানী এর সমাপ্তিকরণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এই ভাষ্যের সাথে সময়ের কিছু জ্ঞান এবং এর অসুবিধার ব্যাপারে সমাধান যুক্ত করেছেন, যা এই ভাষ্য গ্রন্থকে বিভাগগুলো (ফি বা-বিহি) সহ অতুলনীয় করেছে। তিনি এর ছয় খণ্ড বের করেছেন।

মুয়াত্তা'র ভাষ্যসমূহের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি আবু ওয়ালিদ আল-রাজী'র (মৃত্যু : ৪৭৪ হি.) আল-মুনতাকা এবং আল-সুয়ূতীর তানভীর আল-হাওয়ালিক।

আবু দাউদ-এর বৃহত্তম ভাষ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে আল–খাত্তাবীকৃত (মৃত্যু : ৩৮৮ হি.) মা'আলিম আল-সুনান। ইবনুল কাইয়্যিম-এর ভাষ্যের নাম তাযহিব সুনান আবী দাউদ। ভারতের হাদিস ভাষ্যসমূহ হচ্ছে : 'আউন আল-মা'বুদ যা আল-দিয়ানভীকৃত এবং আল-সাহারানপুরীকৃত (মৃত্যু : ১৩৪৬ হি.) বাদল আল-মাজহুদ ফি হাল্লি আবি দাউদ; এর সাথে রয়েছে শায়খুল হাদিস আল-কান্দলবির ভাষ্য এবং সাইয়্যিদ আবু হাসান আল-নাদভী'র মুখবন্ধ। শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আল-সুবকীর (যিনি আল-জামিআ আল-শারিয়াহ'র প্রতিষ্ঠাতা) মানহাল আল-আদব আল-মাওরুদ পর্যাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য। তিনি এটির দশটি খণ্ড বের করেন, কিন্তু তা সমাপ্ত করেননি। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রহম করুন।

তিরমিজির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্য হচ্ছে ইমাম আবু বাকর ইবনুল আরাবিকৃত (মৃত্যু : ৫৪৩ হি.) আরিদাত আল-আহবিদি। নতুন ভাষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে তুহফাতুল আহওয়াযী, যা সুপরিচিত ভারতীয় আলেম আল-মুবারকপুরী রচনা করেছেন।

আবু দাউদ ও তিরমিজির ওপর যেমন ভাষ্য রচিত হয়েছে, নাসায়ির ওপর তেমনটা হয়নি। তবে আল-সুয়ূতী'র লিখিত হাশিয়া রয়েছে, আল-সিন্দিও (মৃত্যু : ১১৩৯ হি.) একগুচ্ছ হাশিয়া লিখেছেন। তাদের দু'জনের এসব হাশিয়া মূল নাসায়ির সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

মিশকাতুল মাসাবিহ'র ভাষ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছে আলী আল-ক্বারীকৃত (মৃত্যু : ১০১৪ হি.) মিরকাত আল-মাফাতিহ। পাঁচ খণ্ডে এটি মুদ্রিত।

একটি নতুন ও পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য লিখেছেন ভারতের অন্যতম আলেম উবায়দুল্লাহ্ আল-মুবারকপুরী, নাম মির'আতুল মাফাতিহ। (এই গ্রন্থটি ভারতের বেনারস শহরের

আল-জামি'আহ আস-সালাফিইয়াহ'য় ৯ (নয়) খণ্ডে, যতটা মনে পড়ে, ভাগ করে দেওয়া হয়।)

প্রচারকের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মানিত ভাষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে আবদুর রউফ আল-মানাবী কর্তৃক আল-সুয়ূতীর জামীউস সাগির এর ভাষ্য। এটা সেই গ্রন্থ যা ফায়যুল কাদির ফী শারহ্ আল-জামীউস সাগির শিরোনামে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এটা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, তবে এর সম্পাদনা হওয়া প্রয়োজন।

রিয়াদুস সালেহীন-এর সুপরিচিত ভাষ্য হচ্ছে ইবন আল্লানকৃত (মৃত্যু : ১০৫৪ হি.) আট অংশে মুদ্রিত দালিল আল-ফালিহিন। সুবহি আল-সালিহ (আল্লাহ তায়ালা তাকে রহমত করুন)-এর মানহাল আল-ওয়ারিদিন নামে একটি নতুন ভাষ্যগ্রন্থ রয়েছে। মুসতাফা আল-খান ও তার সহকর্মীদের রচিত নুজহাত আল-মুত্তাক্বিন নামে আরেকটি পুস্তক পাওয়া যায়।

আল-নাবাবীর গ্রন্থ আল-আযকার-এর জন্য ইবন আল্লান আল-ফুতুহাত আল-রাব্বানিইয়াহ নামে সাত খণ্ডে মুদ্রিত ভাষ্য রচনা করেছেন। তার ক্ষুদ্র অথচ বিখ্যাত গ্রন্থ আল-আরবা'ইন আল-নাবাবীয়া'র অনেক ভালো ভাষ্য রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে উৎকর্ষপূর্ণ, জনপ্রিয় ও উপকারী হচ্ছে ইবন রাজাব আল-হাম্বলীকৃত (মৃত্যু : ৭৯০ হি.) জামি'উল উলূম ওয়া আল-হুক্‌ম। যে চল্লিশটি হাদিস সমাপ্ত হয়েছে তা পর্যবসিত হয়েছে পঞ্চাশটিতে এবং মুহাম্মদ আল-আহমাদী আবু আল-নূর এগুলোর সম্পাদনা করেছেন[১৩]। শাইখ শু'আইব আল-আরনাউত আল-আরবাঈন আল-নাবাবীয়ার হাদিসগুলোর সম্পাদনা ও উৎস-বিচার করেছেন এবং হাশিয়া সংযুক্ত করেছেন। মু'আসসাত আল-রিসালাহ দুই খণ্ডে বৈরুতে মুদ্রিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলোর মধ্যে সেই গ্রন্থটি অন্যতম, যেটি হাদিসের পেছনের বিষয় - এগুলোর গোপন বিষয়াদি এবং এর মধ্যে নিহিত সামাজিক ও দ্বীনী জ্ঞান নিয়ে আলোচনায় সমৃদ্ধ। সেটির নাম হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ। রচয়িতা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাভী (মৃত্যু : ১১৭৬ হি.)।

একজন ধারণাকারী প্রচারক সেই সমস্ত বইপত্র ও অধ্যায় সম্বন্ধে জানবে যা হাদিসের উৎস হতে এসেছে এবং অন্যদের চেয়ে তার কাছে তা বেশি প্রয়োজনীয়। সন্দেহ নেই, এসব বই ও অধ্যায় হচ্ছে ইমান ও তাওহিদ সম্পর্কিত, ইবাদতের বিধিনিয়ম সম্বলিত এবং জ্ঞান, উত্তম আচরণ, অনাসক্তি (জুহদ), হৃদয় কোমলকারী বাণী এবং আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও দোয়ায় পরিপূর্ণ এবং পুণ্য, প্রার্থনার নিয়মাবলী, পরকালীন জীবনের অবস্থা, জান্নাত ও জাহান্নাম, নবি সা.-এর সিরাত ও যুদ্ধের বর্ণনাপূর্ণ এবং দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী ও ইতিহাসসমৃদ্ধ এবং এধরনের আরো-

এর সবই অধিকাংশ সময়ই সরাসরি নির্দেশমূলক হাদিস দ্বারা দাওয়াতদাতার মনোযোগ আকর্ষণ করে। যদি দাওয়াতদাতা [প্রচারক] সুদক্ষ হন ও তার বিস্তারিত জ্ঞান থাকে, তাহলে তিনি এমনকি নির্দেশমূলক হাদিসসমূহসহ হাদিসের সকল প্রকরণ ব্যবহার করবেন।

প্রমাণ হিসেবে কোনো হাদিসকে পেশ করার পূর্ব প্রস্তুতি

দাওয়াতদাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তিনি সাক্ষ্য হিসেবে যেসব হাদিস পেশ করবেন সেগুলো তালাশ করা - অর্থ বের করা, মূল্য ও এর অবস্থান নির্ণয় করা। প্রকৃতপক্ষে, সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যায়িত উৎসের ওপর নির্ভর করা এবং মিথ্যা, বাতিল ও জাল হাদিস এবং উৎসহীন হাদিস থেকে নিজেকে মুক্ত করা। এমনটা সেইসব হাদিসের ক্ষেত্রেই ঘটতে হবে, যেগুলো দিয়ে মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার বইপুস্তককে ঠেসে ভর্তি করা হয়েছে, অতঃপর সহিহ ও হাসান-এর সাথে প্রকারভেদের পার্থক্য না করেই মিশ্রিত করা হয়েছে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়কে। সাধারণ্যে সুপরিচিত হাদিস দ্বারা প্রতারিত করা হয়েছে। এটা বইপুস্তকে বা কথাবার্তার মধ্যে প্রচারিত হয়েছে এবং লোকদের স্মরণে থাকার ফলেই তা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে চারদিকে আরো ছড়াতে ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। কিন্তু অতি সতর্ক আলেমদের কাছে এটা অতি সুবিদিত যে, হাদিস মুখে মুখে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে, এমনকি বিদ্বানদের বইপুস্তকেও এবং একজন থেকে অন্যরা নকল করেছে, অতিশয় যঈফ হওয়া সত্ত্বেও, উৎস না থাকার পরেও, এমনকি প্রক্ষিপ্ত হলেও।

এ অবস্থার জন্যই একদল হাদিস বিশেষজ্ঞ উৎসাহিত হয়েছেন মুখে মুখে প্রচারিত প্রসিদ্ধ হাদিসগুলোর হিসাব গ্রহণে। এসবের মধ্যে রয়েছে : আল-যারকাশি (মৃত্যু : ৭৯৪ হি.) প্রণীত আত্-তাযকিরাহ বি আল-আহাদিস আল-মুশতাহিরাহ; ইবন দীবা'কৃত তামাঈয্ আত্-তাইয়্যিব মিনাল খাতিব ফি মা ইয়াদুরু আল-আলসিনাত আন-নাস মিনাল হাদিস; ইবনে হাজারের (মৃত্যু : ৮৫২ হি) গ্রন্থ আল-লা'লি আল-মানসুরাহ ফি আল-আহাদিস আল-মাশূরাহ; আল-সুয়ূতীর (মৃত্যু : ৯১১ হি.) আদ্-দারার আল-মুনতাশিরাহ ফিল হাদিস আল-মুশতাহিরাহ; আল-সাখাভীর (মৃত্যু : ৯০২ হি.) আল-মাকাসিদুল হাসানাহ ফি মা ইশতাহরা মিনাল হাদিস আলাল আলসিনাহ [এটি সংক্ষেপকরণ করেন আল-যুরকানী (মৃত্যু : ১১২২ হি.)] এবং আল-আজলানী (মৃত্যু : ১১৬২ হি.) প্রণীত কাশফুল খাফা ওয়া-মুযিলুল আলবাস 'আম্মা ইশতারাহ মিনাল হাদিস আলা আলাসিনাতিন নাস। এছাড়া এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য পুস্তক লিখেছেন ইবনুল জাওযী, আল-সুয়ূতী, আল-কারী, আল-

শওকানী, ইবন ইরাক, আল-আলবানি এবং অন্যরা - যাতে জাল হাদিসগুলো যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

তাসাউফের বইগুলোতে গ্রন্থকারগণ হৃদয় কোমল করা সম্পর্কিত এই ধরনের অনেক হাদিস (যঈফ, অস্পষ্ট/দুর্বোধ্য, জাল) উল্লেখ করেছেন। তাই, তাফসিরের বইগুলোতেও, বিশেষ করে বিভিন্ন সূরার ফজিলত, নবি রসুলগণের আ. ও পূণ্যবানদের কাহিনী সম্বন্ধে এবং ওহি নাজিলের (পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনায়) ব্যাপারে একই ধরনের হাদিস আমরা দেখতে পাই। এর মধ্যে খুব কমসংখ্যকই সহিহ বলে প্রত্যায়িত।

সম্প্রতি এক কনফারেন্সে উপস্থিত আলেমদের একজন সালাবা ইবনে হাতীবি'র কাহিনী উপস্থাপন করেন, যেটাকে কুরআনের ভাষ্যকারগণ এই আয়াত নাজিলের পরিপ্রেক্ষিত বলে উল্লেখ করেন :

> এবং তাদের মধ্যে যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা করেছিল যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দান করেন, তবে আমরা অবশ্যই দান করব, আর অবশ্যই সৎ লোকদের মধ্যে শামিল থাকব। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে স্বীয় করুণার দানে ধন্য করলেন, তখন তারা দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করল, আর বেপরোয়াভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। পরিণামে তিনি আল্লাহ তায়ালার সাথে কৃত তাদের ওয়াদা ভঙ্গের এবং মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন; ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে (সুরা তাওবা, ৯ : ৭৫-৭৭)।

কিন্তু এই কাহিনীর সনদ-যা ইবনে হাজার তার উৎসবিচারি আশ-কাশ্‌শাফ গ্রন্থের পূর্বে বর্ণিত এই হাদিসকে যঈফ বলেছেন[১৪]।

অনেক সতর্ককারীর ত্রুটি-বিচ্যুতি

সতর্ককারী ও প্রচারকদের মসজিদে প্রদত্ত বক্তৃতায় অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে সাধারণ যে ব্যর্থতা তা হচ্ছে তারা অন্ধকারে জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ করেন। তারা ঐসব হাদিস উচ্চারণ করে থাকেন যা লোকদেরকে সরিয়ে দেয়, যেক্ষেত্রে ঐসব হাদিসের কোনোটাই চোখে পড়ে না, উৎস বিচারে যেগুলো সহিহ বা হাসান বলে প্রত্যায়িত। আমি এমন কোনো শুক্রবারের খুতবা, সতর্ককারী পাঠের সাক্ষী। কিন্তু প্রায় সর্বদাই এমন একগুচ্ছ হাদিস শুনেছি যা যঈফ, মারাত্মকভাবে যঈফ এবং একই সাথে জালও। একদেশে আমি নবি সা.-এর জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি বক্তৃতা

শুনেছিলাম, যার মূল বিষয় ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনের বিশুদ্ধতা, আচরণের মাধুর্য এবং চরিত্রের মহত্ব। এটা এমন বিষয়বস্তু যা বিপুলধনে বিভূষিত, কুরআন থেকে নিঃসৃত সত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সহিহ সূত্রে বর্ণিত সুন্নাহ্ দ্বারা সজ্জিত। কিন্তু বক্তা মাত্র দুই বা তিনটি হাদিস বর্ণনা করলেন সহিহ বা হাসান পর্যায়ের। তিনি তার গুদাম খালি করে ফেললেন ঐসব হাদিস দিয়ে যেগুলো উদ্ভট, প্রত্যাখ্যাত বা প্রক্ষিপ্ত অথবা যেগুলোর উৎস অজ্ঞাত। আলেমগণ এমন বিষয় সম্বন্ধে বলেছেন : এর কোনো নাক-বালা বা লাগাম নেই অর্থাৎ এর কোনো নিয়ন্ত্রণ, বাধা বা শৃঙ্খল নেই। এখানে এর কিছু উদাহরণ পেশ করা যায় :

আল্লাহ তায়ালা প্রথম [অস্তিত্ব] যা সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে তাঁর নবির নূর।

আল্লাহ তায়ালা তার পিতামাতাকে জীবন দান করলেন এবং তারা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করল।

যাকেই মুহাম্মাদ বলে ডাকা হবে তার জন্যই খাতনা ফরজ।

(তাঁর জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে অতি প্রাকৃত বিভিন্ন প্রকার ঘটনা বলা হয়ে থাকে)।

নবি সা.-এর উম্মাহর মর্যাদা সম্বন্ধে যেসব অদ্ভুত জিনিস আমি শুনেছি তার মধ্যে এই হাদিসটি রয়েছে : আমার উম্মাতের বিদ্বানগণ বানি ইসরাঈলের নবিদের মতো। বক্তা একটি গল্প বলে এই হাদিসটির বিশুদ্ধতার সাফাই গাইলেন। এর সারসংক্ষেপ এমন : স্বপ্নে কিংবা আত্মার জগতে আবু হামীদ আল-গাজ্জালী মুসা আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুসা (যাকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি ডেকেছেন) তাকে বললেন : তোমার নাম কি? তিনি বললেন : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী আল-তুসী... ইত্যাদি। মুসা আ. বললেন : আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করেছি, তোমার বংশবৃত্তান্ত জানতে চাইনি। তিনি বললেন : যখন আল্লাহ তায়ালা জানতে চেয়েছিলেন আপনার ডান হাতে কী রয়েছে, তখন আপনি তাঁকে বলেননি আমার লাঠি এবং চুপচাপ থাকলেন। বরং, আপনি বলেছেন : এটা আমার লাঠি। আমি এর ওপর ভর দিই এবং এর দ্বারা আমার মেষপালকে পাতা পেড়ে দিই এবং আরো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি। বক্তা মন্তব্য করলেন : সুতরাং আল-গাজ্জালী মুসার আ. সাথে বিতর্ক করলেন। এইভাবে বক্তা একটি মিথ্যা হাদিসের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করলেন (আমার উম্মাতের বিদ্বানগণ বাণি ইসরাঈলের নবিদের মতো)। ঐভাবে মূল্যহীন পণ্য বাজারে আনা হয়েছে - যা তৈরি অদ্ভুত দ্রব্য দিয়ে, ইসরাঈলী ঐতিহ্যের গল্প ও স্বপ্ন দ্বারা - এভাবে তা ছড়াচ্ছে ও বিস্তারলাভ করছে, ভালো পণ্যের অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ সহিহ ও হাসান নামে প্রতিষ্ঠিত হাদিসের স্থলে। তারপর, যেমনটা অর্থনীতিবিদগণ বলে থাকেন, খারাপ মুদ্রা দূরীভূত করে ভালো মুদ্রাকে!

ব্যর্থতা পরিচিত বিষয়। এটা এমনকি এমন কিছু আলেমকে স্পর্শ করেছে যারা জ্ঞানবান ও যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এবং হাদিস বর্ণনায় খুবই কঠোর, কিন্তু তারা কদাচ, সতর্ককরার ওপর প্রবন্ধ রচনা করেননি, শৈথিল্যের চূড়ান্ত করেছেন। এটার মতোই আমরা দেখেছি, আবু ফারাজ ইবনুল জাওযী (মৃত্যু : ৫৯৭ হি.)-এর সতর্ককরা সম্বন্ধীয় পুস্তক। উদাহরণস্বরূপ, দাম আল-হাওয়া; যেখানে একই আল-জাওযী কঠোরতা দেখিয়েছেন আল-মাওযুআত এবং আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়া ফিল হাদিস আল ওয়াহিয়্যা এবং এমন বইপুস্তকে। আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে আল-নাককাদ শামসুদ্দীন আল-দাহাবী (মৃত্যু : ৭৩৮ হি.), যিনি প্রায়শই শিথিল ছিলেন আল-কাবায়ির'র মধ্যে, কারণ এই বইটির মধ্যে সতর্ক করার বৈচিত্র্যর রয়েছে। একইভাবে, আল-হাফিয আল-মুনযিরী তার বিস্তারিত গ্রন্থ আত তারগিব ওয়াত্‌ তারহিব এর মধ্যে করেছেন। তিনি এতে যথেষ্ট সংখ্যায় দুর্বল, প্রত্যাখ্যাত, এমনকি জাল হাদিসও উদ্ধৃত করেছেন। তার এগুলোর প্রয়োজন ছিল না। তার মুখবন্ধে তিনি পাঠকদের তথ্য প্রদান করেছেন, তার উদ্ধৃত নির্দেশকসমূহ ও পরিভাষাগত শ্রেণিবিভাগের বিষয়ে। সুতরাং তিনি ঐভাবে তার কর্তব্য পালন করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর মেহেরবান। তবে তার পাঠকগণ, বিশেষ করে আমাদের সময়ের, ঐ বিষয়ে মনোযোগী নয়। এটাই সেই কারণ যাতে আমাকে প্রস্তুত করতে হয়েছে আল-মুনযিরীর গ্রন্থ থেকে একটি দুই অংশের গ্রন্থ, আল-মুনতাকা, এর মধ্যকার সহিহ ও হাসান হাদিসের উৎস-বিচারসহ[১৮]।

ইবনে হাজার আল-হায়সামি'র ফতোয়া

সুবিখ্যাত শাফেয়ী আইনশাস্ত্রবিদ ইবনে হাজার আল-হায়সামি অবশ্যই একটি অপূর্ব কাজ করেছেন, যখন তিনি তার সময়ের শাসকদেরকে সোজাসুজি অনুরোধ করেছিলেন এমন প্রত্যেক প্রচারককে প্রচার থেকে বিরত রাখতে, যারা তাদের উদ্ধৃত হাদিসের উৎস স্পষ্ট করেন না এবং যারা সত্য ও প্রত্যায়িত বর্ণনার সাথে অকার্যকর ও মিথ্যা বর্ণনা মিশ্রিত করেন।

ইবনে হাজার আল-হায়সামির কাছে একজন খতিব সম্পর্কে একজন প্রশ্নকারী এলেন, যিনি প্রতি শুক্রবার মিম্বারে আরোহণ করেন এবং অনেক হাদিস বর্ণনা করেন। কিন্তু উদ্ধৃত হাদিসের উৎস বা বর্ণনাকারীদের অবস্থান বর্ণনা করেন না (উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রশ্নকর্তা একটি বিশেষ হাদিস উল্লেখ করলেন) এবং প্রশ্ন করলেন : এ অবস্থায় তার ব্যাপারে কি করা কর্তব্য? তার জবাব তার ভাষায় :

তার খুতবায় বর্ণনাকারীদেরকে বা সেগুলো কে বলেছে তা স্পষ্ট না করে যে হাদিসগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, এই শর্তে অনুমোদনযোগ্য যে তিনি [নিজেই]

হাদিসে জ্ঞানীদের একজন, অথবা তিনি এমন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছেন যা [হাদিসের জ্ঞানসম্পন্ন] ঐরকম একজনের দ্বারা লিখিত। কিন্তু হাদিসের লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয় যা খুতবায় আস্থা রাখা যায়, এমন লেখকদের বইতে চোখ বুলিয়ে [এর ভিত্তিতে] হাদিসের বর্ণনায় ওপর নির্ভর করা বা খুতবায় আস্থা রাখা বৈধ নয়। যে এমন করবে, তাকেই তীব্রভাবে ভৎর্সনা করতে হবে। এটাই হচ্ছে অনেক খুতবাদাতার অবস্থা। কারণ তারা বাস্তবিকই হাদিসসহ একটা খুতবা পড়ে, মুখস্ত করে ঐ হাদিসগুলো এবং রর সাহায্যে তাদের নিজের খুতবায় প্রচার করে, ঐ হাদিসগুলোর সত্যিকার উৎস আছে কিনা তা না জেনেই। তাই সব দেশের শাসকদের কর্তব্য হচ্ছে তারা তাদের খতিবদের নিবৃত্ত করবেন এমন করা থেকে, যদি তারা এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে।

এটা এই খতিবের জন্য বাধ্যতামূলক যে, তিনি তার বর্ণনায় সনদ স্পষ্ট করবেন। এখন যদি তার সনদ সঠিক হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি নেই। অন্যথায় কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এটা অনুমোদিত যে, তিনি তাকে খুতবা প্রদানের অধিকার থেকে সরিয়ে দেবেন, তাকে এমন সাহসী হওয়া থেকে টেনে ধরবেন যেমনটা তিনি [খতিব] বিনা অধিকারে এই সুন্দর মর্যাদা ধারণ করেছেন[১৬]।

যদি আমাদের সময়ে খুতবা প্রদানকারীদের ওপর এমনটা প্রযোজ্য করা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের অনেকে - তাদের হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং গ্রহণীয় ও বর্জনীয় হাদিস সর্ম্পকে তাদের সন্দেহের কারণে বিতাড়িত হতেন।

৩. তারগিব ও তারহিবে যঈফ হাদিস বর্ণনা

আমার মতে খতিবদের অনেকের মধ্যে, স্মরণকারী ও সতর্ককারীদের মধ্যে অস্পষ্ট, প্রত্যাখ্যাত এবং এমনকি জাল হাদিসের ব্যাপক প্রচারের কারণ হচ্ছে অধিকাংশ আলেমের মতের অনুসরণ, যা এধরনের হাদিস বর্ণনার অনুমতি প্রদান করে। আমলের ফজিলত, হৃদয়কে কোমল করা, পরিহারকরণ এবং তারগিব ও তারহিব ও এমন প্রবণতাসম্পন্ন কাহিনীর উদ্দেশ্যে তারা দুর্বল হাদিসের অনুমতি দেন ঐ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত এই হাদিসগুলো আইনের নির্দেশনার সাথে জড়িত হয় না, পাঁচটি অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় না, যেমন- হালাল, হারাম, নিন্দনীয়, বাধ্যতামূলক ও প্রশংসনীয়। আত-তারগিব ওয়াত তারহিব-এর মুখবন্ধে আল-মুনযিরী লিখেছেন : তারগিব ও তারহিবের দৃষ্টিতে হাদিসের প্রকরণে আলেমগণ শিথিলতা/অবকাশ অনুমোদন করেন ঐ পর্যন্ত, যাতে তাদের অনেকেই জাল হাদিস উদ্ধৃত করেন এবং এর অবস্থা স্পষ্ট না করেন!

আল-হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে কিতাবুদ দোয়ার প্রারম্ভে যা বলেন, এটা তারই নিকটতর : এবং আমি, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়, এই বর্ণনাগুলোকে প্রবাহিত করব, যাতে দুই শায়খ (আল-বুখারি ও মুসলিম)-এর নীরব দোয়ার পুস্তকাদিতে-আবু সাঈদ আবদুর রাহমান ইবনে মাহদীহ এগুলো গ্রন্থনার মতবাদ অনুসরণ করেন। এরপর তিনি আবু সাঈদ আবদুর রাহমানের প্রতি তার সনদ বিন্যাস করেন এবং তার মত উদ্ধৃত করেন :

আমরা যদি হালাল-হারাম এবং হুকুম আহকাম বিষয়ে রসুল সা. এর সুত্রকে সম্পর্কিত করি, তাহলে আমরা সনদ সম্পর্কে কঠোর হই এবং আমরা রাবিদের সমালোচনা করে থাকি। যদি আমরা আমালের নেকি বর্ণনা করি এবং পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি এবং প্রশংসনীয় আমল ও দোয়া বর্ণনা করি, তাহলে আমরা ইসনাদ সহজ করে দিই[১৭]।

আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর সনদসহ আল-খাতিব আল-কিফায়া গ্রন্থে কাছাকাছি ভিন্ন শব্দে একই মতামত বর্ণনা করেন[১৮]। তারপর বলেন : হৃদয় কোমল করার হাদিসগুলোর মধ্যে অনুশাসনের কোনো কিছু আসেনি ব্যক্তির প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে। একইভাবে, আবু যাকারিয়া আল-আনবারী বলেন : সংশ্লিষ্ট বর্ণনা যদি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল না করত এবং অনুশাসনকে বাধ্যতামূলক না করত এবং যদি তা তারগিব ও তারহিব-এর ওপর হতো, অথবা উপাদান বা ইবাদত পদ্ধতির নিবিড়করণ অথবা শিথিলকরণ হতো, তাহলে মানুষের এর প্রতি [সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে] চোখ বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক হতো-এর বর্ণনাকে সহজ করার জন্য[১৯]।

কিন্তু এই চোখ বন্ধ করে থাকা এবং এর ইসনাদকে সহজ করা কতদূর পর্যন্ত?

এর দ্বারা কিছু লোক বুঝে যে, শর্ত ছাড়াই তারগিব ও তারহিবের ভিত্তিতে হাদিস গ্রহণ করা উচিত - এমনকি এর রাবি এর বর্ণনায় যদি একাকীও হন, অথবা তার ভুলে কেউ বেপরোয়া হয় অথবা কারো কাছে অসংখ্য প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা জমা থাকে অথবা যদি কেউ মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত হয়। সুফিদের মধ্যে কিছু অর্বাচীন ব্যক্তি জাল হাদিস বর্ণনারও অনুমতি দিয়েছেন - যেগুলো মিথ্যা, উদ্ভাবিত এবং তৈরি করা-কেবল এই শর্তে যে, তা দিয়ে ভালো কাজে উৎসাহিত করা হয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখা হয়। তাদের কেউ কেউ (যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি) তাদের নিজেদেরকে ক্ষমা করতে ঐ মতলবসহ কুরআনের বিশেষ সুরার গুরুত্ব বিষয়ে কিংবা বিশেষ উত্তম কাজের সুবিধার জন্য হাদিস উদ্ভাবনে এতদূর এগিয়েছে। লোকেরা যখন সুপরিচিত মুতাওয়াতির হাদিসটি উদ্ধৃত করেছে- যে

ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা বলে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়- তারা সমগ্র ধৃষ্টতাসহ বলে : আমরা কখনও তাঁর সা. বিরুদ্ধে মিথ্যা বলি না, তবে আমরা তাঁর জন্য মিথ্যা বলি। এটা এমন এক অজুহাত যা পাপের চেয়েও কুৎসিত। এটা এই রায় প্রকাশ করে যে, দ্বীন অসম্পূর্ণ এবং তারা তাঁর সা. জন্য তা পরিপূর্ণ করে।

অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন সম্পূর্ণ করলাম (সুরা মায়িদাহ, ৫ : ৩)।

সেজন্য আলেমগণ সত্য প্রতিষ্ঠায় জীবন কোরবানি করেছেন সনদ সমূহ বা ইসনাদের শর্ত শিথিল করার সীমা স্পষ্ট। আমরা এখানে কিছু সংখ্যকের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি।

ইবন রজব আল-হাম্বলী (তার শারহ ইলাল আল-তিরমিজি, তিরমিজির ওপর লিখিত গ্রন্থের ওপর বলতে গিয়ে বলেন যে, অসততা অথবা বিস্মৃত হওয়ার ব্যাপারে পরিচিত অথবা তার বর্ণনায় বহু ভুল হয়, এমন অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনো হাদিস সংযুক্ত করেননি) বলেন :

> তিরমিজি যা উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে তার অবস্থান এই যে, তিনি এমন হাদিস উদ্ধৃত করেননি যা আইনী নির্দেশনা ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু যদি বর্ণনাকারীগণ হৃদয় কোমল করার এবং তারগিব ও তারহিব-এর উদ্দেশ্যে ঐসব হাদিসের কিছু বর্ণনা করেন, তাহলে ইমামদের অনেকেই এসব হাদিসের বর্ণনা দুর্বল হতে অনুমতি দিয়েছেন; এদের [ঐসব ইমামদের] মধ্যে ছিলেন ইবন মাহদী ও ইবন হাম্বল।
>
> রাওয়াদ ইবন আল-জাররাহ বলেন : আমি সুফিয়ান আল-সাওরীকে বলতে শুনেছি, প্রধানদের কাছ থেকে ব্যতীত হালাল ও হারাম বিষয়ে এই জ্ঞান গ্রহণ করো না, যারা তাদের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত, যারা সংযোজন ও বিয়োজন [একটি বর্ণনার গুণাগুণ বুঝতে যে সামঞ্জস্যবিধান প্রয়োজন] করতে জানেন এবং এর চেয়ে ভিন্নরূপ কি সে সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই [অর্থাৎ হালাল ও হারাম বিষয়ে] সম্মানিত জ্যেষ্ঠগণের [এমন লোক যারা দীনদারীর জন্য পরিচিত, কিন্তু হাদিসে বিশেষজ্ঞ নন] কাছ থেকে গ্রহণে।

ইবন আবী হাতিম বলেন :

আমার পিতা আবদাহ্ থেকে আমাদেরকে জানান, তিনি বলেন : ইবন আল-মুবারক যখন কোনো লোক থেকে হাদিস বর্ণনা করছিলেন তখন তাকে বলা হলো এই লোকটি দুর্বল! তখন [ইবন আল-মুবারক] বললেন: একজন দুর্বল রাবি থেকে বর্ণনা মেনে নেওয়া হয় এই [সীমা] পর্যন্ত অথবা ঐসব জিনিস পর্যন্ত। সুতরাং আমি আবদাহ্‌কে বললাম : কোন জিনিসগুলোর মতো এটা হতে পারে? তিনি বললেন : আদব কায়দা, উপদেশ, নিষেধকরণ বিষয়ে।

মুসা ইবন উবায়দা আল-রাবযী এমন এক ব্যক্তি যিনি তার দীনদারী [হাদিস বিশেষজ্ঞ নন] এবং বর্ণনায় দুর্বলতার জন্য পরিচিত। তার সম্বন্ধে ইবন মু'ঈন বলেন যে, আল-রাবযী তার হৃদয় কোমল করা হাদিস হতে লিখেছেন।

ইবন উয়ায়নাহ্ বলেন :

বাকিইয়্যা [অর্থাৎ বাকিইয়্যা ইবন ওয়ালীদ] থেকে শুনো না, যা সুন্নাহ্‌র মধ্যে রয়েছে, [পরকালের] পুরস্কার এবং এছাড়া অন্যকিছু সম্পর্কে শুনবে।

আহমাদ ইবন হাম্বল ইবন ইসহাক [বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থের লেখক মুহাম্মদ ইবন ইসহাক] সম্বন্ধে বলেন : লোকেরা যুদ্ধ এবং এরূপ বিষয় সম্বন্ধে তার কাছ থেকে লেখেন।

যিয়াদ আল-বাকা'ই সম্বন্ধে ইবন মুসা বলেন :

যুদ্ধ সম্বন্ধে তার প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু এ ছাড়া অন্য বিষয়েঃ না।

ইবন হাজার বলেন :

প্রকৃতপক্ষে কেবল তারহিব ও তারগিব এবং তিরস্কার ও উত্তম আচরণ সম্পর্কে ঐসব লোকের হাদিস বর্ণনা করা হয় যারা বিস্মৃতিপরায়ণ হলেও মিথ্যাকথনের জন্য সন্দেহভাজন নন। সন্দেহভাজন লোকদের সম্পর্কে বলতে গেলে, মানুষ তাদের হাদিস পরিত্যাগ করে। এমনটাই বলেন ইবন আবী হাতীম এবং অন্যরা[২০]।

যে বক্তব্য এইমাত্র উদ্ধৃত করা হলো (এবং তাদের মত অন্যরা) এটা স্পষ্ট করে যে, হাদিসের ইমামগণের একজনও তারগিব ও তারহিব সংক্রান্ত বর্ণনা সবার কাছে থেকে সামগ্রিকভাবে ও পৃথকভাবে এলোমেলোভাবে গ্রহণ করেননি, যদি ঐগুলোর বর্ণনাকারীগণ মিথ্যাকথন থেকে মুক্ত ছিলেন না, যদি তারা তাদের বর্ণনাক্ষেত্রে অতিরিক্তভাবে প্রমাদ প্রবণ ছিলেন। তারা এমন কিছু বর্ণনাকারীর বর্ণনা অনুমোদন করেছেন যাদের মুখস্থ রাখার সামর্থ্যে কিছুটা নমনীয়তা বা দুর্বলতা ছিল এবং যদিও তারা জ্ঞানের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন না (যেমন সুফিয়ান আল-সাওরী বলেন), তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সাধুতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। সন্দেহ ছিল কেবল তাদের মনে রাখার সামর্থ্য, তাদের সচেতনতা ও পূর্ণতা নিয়ে।

হৃদয় কোমল করা ও তারগিব সংক্রান্ত যঈফ হাদিসগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে ইবন হাজার তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছে। পরে আল-সুয়ূতী এগুলোকে তার তাদরিব আল-রাবি গ্রন্থে স্থান দেন।

প্রথম শর্ত : এই শর্তের ওপর ঐকমত্য হয়েছে। এটা এমন যে, বর্ণনাকারী বা বর্ণনা দুর্বল হতে পারে, কিন্তু অতিরিক্ত দুর্বল নয়। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী মাত্র একজন হলে বাদ যাবেন। পরিচিত মিথ্যুকদের মধ্যে হলে বা মিথ্যুক বলে অভিযুক্তদের একজন হলে এবং তার ভুলের ব্যাপারে নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ হলে তা পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় শর্ত : হাদিসের একটা সাধারণ বিধি রয়েছে (অর্থাৎ এটা আহকাম ও দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, বিরোধী হবে না)। এক্ষেত্রে এমন কিছু যা উদ্ভাবিত হয়েছে, যার পক্ষে কোনো প্রকার উৎসের খোঁজ পাওয়া যায় না, তা বাদ যাবে।

তৃতীয় শর্ত : এমন হাদিসের ওপর আমল করাকালে এটা এমন হয় যে, রসুল সা. থেকে তা প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করা যায় না। এভাবে যা রসুল সা. বলেননি, তা তাঁর প্রতি (অশুদ্ধভাবে) আরোপ করা যাবে না। এমন ধরনের হাদিস যদি আমল করা হয়ে থাকে, তাহলে এটাকে কেবল পূর্ব সতর্কতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

আল-সুয়ূতী বলেন : শেষের দুটো শর্ত ইবন আবদুস সালাম ও তার ছাত্র ইবন দাকীক আল-ঈদ থেকে এবং প্রথমটির ব্যাপারে ঐকমত্য সম্পর্কে আল-'আলা'ই বর্ণনা দিয়েছেন[২১]।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা

এখানে প্রয়োজনীয় হচ্ছে কিছু বাস্তবতার বিষয়ে পাঠকদের আমি সতর্ক করব, যে বিষয়ে অনেক লোকের ক্ষীণ বুঝ রয়েছে। ফলে তাদের দ্বীনী শিক্ষা হয়েছে সন্দেহপূর্ণ। যদিও তাদের কেউ কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দ্বীনী গাইড হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ক). তারগিব ও তারহিবের যঈফ হাদিস বাতিলকরণ

পুরাতন ও নতুন আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ সহিহ্ ও হাসান ব্যতীত কোনো হাদিস গ্রহণ করেন না, তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। শারহ্ আল-ইলাল গ্রন্থে ইবন রজব বলেন :

মুসলিম (মৃত্যু : ২৬১ হি.) তাঁর মুকাদ্দিমায় বলেন যে, তিনি তারগিব ও তারহিব-এর হাদিসগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন। ঐগুলো একজন ব্যতীত অন্য কেউ কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, যার কাছ থেকে আহকামও বর্ণিত হয়েছে[২২]।

তাঁর সহিহ্ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যঈফ হাদিসের বর্ণনাকে নিন্দা করেছেন এবং বাতিল করেছেন[২৩]।

স্পষ্টত, ইমাম আল-বুখারির (মৃত্যু : ২০৬ হি.) মতাদর্শও এমনই ছিল। এটা হচ্ছে জারহ্ ও তা'দীল (রাবিদের নিন্দাজ্ঞাপন বা সমর্থন) বিষয়ে আলেম ইয়াহ্ইয়া ইবন মা'ঈন (মৃত্যু : ২৩৩ হি.) এর মতাদর্শ। পরবর্তী যেসব মনীষী এর প্রতি সমর্থন জানান তারা হলেন : জাহিরি ঘরানার সদস্য ইবন হায্‌ম (মৃত্যু : ৪৫৬ হি.), আল-কাযী ইবন আল-আরাবি (মৃত্যু : ৫৪৩ হি.) মালিকি মাজহাবের এবং শাফিঈ মাজহাবের আবু শামাহ। সমসাময়িক অন্যান্য আলেমদের মধ্যে রয়েছেন : শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির এবং শায়খ মুহাম্মদ নাসির আল-দীন আল-আলবানি। শায়খ শাকির এ প্রসঙ্গে তাঁর আল-বা'থ আল-হাদিদ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, যাতে তিনি ইবন কাসির-এর ইখতিসার উলূম আল-হাদিদ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। কিছু লোক কর্তৃক যঈফ হাদিস বর্ণনার অনুমতি সম্পর্কে বর্ণনা এবং এর শর্তাদি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

আমি যা মনে করি তা হচ্ছে যঈফ হাদিসের দুর্বলতা সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক। কারণ প্রকাশ না করা হলে মানুষ এটাকে সহিহ্ বলে মনে করবে- বিশেষ করে যখন বাহক হাদিসের আলেমদের একজন হন যার অভিমতকে কেউ উল্লেখ করে থাকেন। আমি এও মনে করি যে, হুকুম আহকাম এবং আমলের ফজিলত এবং এই জাতীয় কিছুর দুর্বল বর্ণনার গ্রহণ অযোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য

থাকা ঠিক নয়। বরং কোনো হাদিসেই যুক্তি নেই যতক্ষণ না তা সহিহ্ বা হাসান হাদিস অনুযায়ী আল্লাহর রসুল সা. হতে প্রমাণিত হয়- যেমন আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন মাহদী ও ইবনুল মুবারক বলেছেন ...যদি আমরা গুণ ও এমন কিছুর ভিত্তিতে বর্ণনা করি তাহলে আমরা বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার শর্ত শিথিল করি তখন তারা এর দ্বারা বুঝায় (যাতে আমি ভারসাম্য বিবেচনা করি, আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) হাসান হাদিসকে গ্রহণ করা, যা সহিহ হাদিসের পর্যায়ে পৌঁছে না। কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে সহিহ্ ও হাসান পরিভাষা তাদের চিহ্নিতকরণে কালানুক্রমিকভাবে ব্যাপকভাবে স্থিরীকৃত ও প্রমাণিত হয়নি। বরং প্রাথমিক আলেমদের অনেকেই সহিহ অথবা যঈফ এর বাইরে হাদিসের কোনো স্তর নির্ধারণ করেননি[২৪]।

ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়্যিম-এর সমার্থবোধক আলোচনা রয়েছে। এতে তারা আহমাদ ইবন হাম্বলের বর্ণনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এটা বুঝাতে যে, তিনি যঈফ হাদিসকে রায়ের (ব্যক্তিগত মতামত) ও কিয়াসের (অবরোহমূলক অনুসিদ্ধান্ত) ওপরে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন; তাছাড়া তার মনে যা ছিল তাহল বর্ণনাসমূহ যা (পরে) হাসান হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়। যেমনটা সুপরিচিত, এটা হচ্ছে আল-তিরমিজি সহিহ ও হাসানের পার্থক্যকে জনপ্রিয় করেছেন।

শায়খ আল-আলবানির প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি অনেক গ্রন্থের ভূমিকায় তার কর্তৃত্বকে একই মর্যাদা দিয়েছেন, বিশেষভাবে সহিহ আল-জামি আল-সাগির এবং এর সম্পূরক গ্রন্থে এবং সহিহ আল-তারগিব ওয়া আল-তারহিব নামক পুস্তকে।

খ). সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা আরোপিত শর্তের প্রতি বিরাগ

দ্বিতীয় বাস্তবতা এই যে, দুঃখজনকভাবে তিনটি শর্ত আরোপিত হয়েছে তাদের দ্বারা, যারা যঈফ হাদিস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন তারগিব ও তারহিব বিষয়ে, হৃদয় কোমলকরণে এবং এমনতরো বিষয়ে। এটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রক্রিয়ায় অনুরঞ্জিত হয়নি। এই ক্ষেত্রে হাদিস নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই অত্যন্ত যঈফ ও যঈফ-এর মধ্যে পার্থক্য করেন না। তারা এ নিশ্চয়তা বিধানে দ্বিধান্বিত হন না যে, হাদিসটি কুরআন কিংবা প্রত্যায়িত সুন্নাহ্র প্রতিষ্ঠিত আইনী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বরং এক সময় (যেমন আমি পূর্বেই বলেছি) এই সব স্মরণ ও উৎসাহিতকরণের বিষয়ে এইসব বর্ণনার প্রতি নির্বোধ আবেগ তাদেরকে অভিভূত করে - এমনকি যদি কোনো বর্ণনা কেউ বাতিল করেন বাতিলকরণের কঠিনতম পর্যায়ে এসে অথবা অস্পষ্টতা থাকে এর প্রক্ষিপ্তকরণের লক্ষণের মধ্যে।

গ). নিশ্চয়তার ধরণে বর্ণনায় নিষেধাজ্ঞা

এর ওপরে আলেমগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে, যইফ হাদিসে আল্লাহর রসুল সা. এটা বলেছেন, ওটা বলেছেন- এমন ভাবে ইতিবাচক ও নির্দিষ্টতাসূচক বক্তব্য না করা। ইবন সালাহ্ তার উলূম আল-হাদিস-এ ২২ টি প্রকরণের কথা বলেছেন :

আপনি যদি ইসনাদ ছাড়াই যঈফ হাদিস বর্ণনা করতে চান, তাহলে এতে একথা বলবেন না যে, আল্লাহর রসুল সা. এমন বা তেমন বলেছেন, অথবা এমন শব্দ সহযোগে যা নিশ্চয়তার দিক থেকে [প্রকাশআর্থে] ওর অনুরূপ।

এই পদ্ধতি সহিহ্ কিংবা যঈফ হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের বিধান। প্রকৃতপক্ষে, কেবল বলুন আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন ঐ বর্ণনার ক্ষেত্রে, এর সনদের [এর প্রেরণপথ] দিক থেকে যেটা সহিহ্ হওয়া আপনার নিকট স্পষ্ট। আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন[২৫]।

ইবন সালাহ্-এর বক্তব্যের সাথে আল-নববী একমত, যেমন একমত ইবন কাসির, ইবনুল ইরাকী ও ইবন হাজার এবং হাদিসের প্রক্রিয়া ও পরিভাষা সংক্রান্ত সকল গ্রন্থ। কিন্তু সতর্ককারী ও খতিবগণ এবং যঈফ হাদিস বর্ণনাকারী লেখকগণ এই সতর্কসংকেতে মনোযোগ দেন না। এর পরিবর্তে তারা আল্লাহর রসুল সা. বলেছেন- এই শব্দসমূহ দিয়ে তাদের যঈফ হাদিসগুলো শুরু করেন।

ঘ). সহিহ্ ও হাসানের পর্যাপ্ততা

যদি কোনো বিশেষ বিষয়ে আমরা সহিহ্ ও হাসান পর্যায় থেকে গ্রহণ করি এবং একইভাবে যঈফ থেকেও, তাহলে পূর্বোক্তটিকে অন্বেষণ করাই মূল্যবান পন্থা হবে। আমাদের স্মৃতিকে যঈফ দিয়ে ভারি করার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে সহিহ্'র মুকাবেলায় এমনটা করা মানে এর প্রতি কারো কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করা। সাহাবিগণের রা. কারো কাছ থেকে এসেছে : লোকেরা উদ্ভাবনের (বিদ'আত) ওপর কোনো প্রচেষ্টা চালায় না, কিন্তু তারা সুন্নাহ্ থেকে এর মতোই হারায়। ওটা এমন কিছু যা সত্যসত্যই ঘটে থাকে। বিদ'আত সুন্নাহ্র স্থান দখল করে, উদ্ভাবন ঐতিহ্যের স্থান গ্রহণ করে। আল-কিফায়া গ্রন্থে ইমাম ইবন মাহ্দী থেকে আল-খতিব বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

কারো নিজেকে দুর্বল [বর্ণনাকারীদের] হাদিস লিপিবদ্ধকরণে ব্যস্ত রাখা উচিত নয়। কারণ এর মধ্যে যা আছে তা হলো, ঐ সীমা পর্যন্ত যা সে লিখে, তা থেকে বিশ্বস্থতাসম্পন্ন [লোকদের] হাদিসসমূহ তার দ্বারা বাদ পড়ে যায়।

যদি স্মরণে রাখা, চিন্তাভাবনা, বোধশক্তি ও আত্মীকরণে মানবীয় সামর্থ্য সীমাবদ্ধ হয় এবং এ থেকে পলায়নের পথ না থাকে, তাহলে এই সামর্থ্য এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও সময়, যার ওপর ও অগ্রাধিকার রয়েছে : তা কাজে লাগানো শ্রেয়। এ ক্ষেত্রে অনৈক্য নেই যে, ঐ দুটির মধ্যে এই ক্ষেত্রে যঈফের ওপর সহিহ'র পূর্ব দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ঙ). আমলের মধ্যে ভারসাম্যহীন আদেশের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

হৃদয় কোমলকরণ, তারগিব ও তারহিব সংক্রান্ত হাদিসসমূহে (এদের মূলপাঠে) সিদ্ধ বা নিষিদ্ধকরণ ছাড়া কিছু করণীয় নির্দেশনা নেই। এদতসত্ত্বেও আমরা দেখি, এগুলো এমনকিছু ধারণ করে যার নিজস্ব গুরুত্ব ও ফলাফল রয়েছে। আমাদের পূর্বসুরী ইমামগণ এতে সাড়া দেননি - এটা এমন যা (সময়ের স্রোতে) উদ্ভূত হয়েছে কর্তব্য ও কাজের সম্পর্কের মধ্যে বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে যা আইনের প্রজ্ঞার সাহায্যে সুরাহা করা হয়েছে। কারণ প্রতিটি কাজ আইন দ্বারা নির্দেশিত বা নিষিদ্ধ-এর মূল্য আইন দ্বারা অন্য কাজের নিরিখে আপেক্ষিকভাবে নির্ধারিত। হুকুম যা সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করেছে, আমরা তা অমান্য করতে পারি না, যাতে একটা আমলের যে পর্যায় নির্ধারিত রয়েছে তা কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ থাকে।

সবচেয়ে সাংঘাতিক বিষয় হচ্ছে : আমলের ওজন করা কিছু পুণ্যের কাজকে এর উপযুক্ততার চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া; কিংবা এর যোগ্যতার চেয়ে বেশি ব্যাপ্তি দেওয়া এর পুরস্কারে স্ফীতি ঘটিয়ে, যতক্ষণ না দ্বীনের দৃষ্টিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ কিছুকে এটা বিদূরিত না করে; অন্যদিকে কিছু নির্ধারিত কাজের অন্যায্য ওজন দেওয়া এবং এর মধ্যকার শাস্তির অতি বর্ণনা দ্বারা, এমন করা হয় যাতে ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য নির্ধারিত আমলের সম্বন্ধে ধারণা বিধ্বংস হয়। পুরস্কারের ওয়াদা কিংবা শাস্তির হুমকি সম্বন্ধে এই ধরনের অতিশয়োক্তি হিদায়াতের অন্বেষণকারী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে দ্বীনের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। এসব অতিশয়োক্তি তারা যা শোনে বা পাঠ করে তা খোদ দ্বীনের সাথে যুক্ত, অথচ ইসলাম এর থেকে বিমুক্ত।

প্রায়ই এমন অতিশয়োক্তি বিশেষ করে তারহিবের দিকে চালিত করে যা মনোজাগতিক প্রত্যাগমন (reversion) বা উদ্বেগ (anxieties)। তারা লোকদের মাঝে বিরূপভাব ও ঘৃণার বীজ বপন করেছে এবং তাদের দ্বীন সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে এবং এর প্রশস্ততা থেকে দূরে রেখেছে। তাই আমরা দেখব এক পিতাকে, যিনি তার বারো বছর বয়সী কন্যার রাত্রে উৎকণ্ঠিত ও ভীত অবস্থায় জেগে ওঠার অভিযোগ করেন, কারণ সে ভীতিকর স্বপ্ন দেখে - যা তার হয় একজন বক্তা কর্তৃক

কবরে প্রদত্ত শাস্তি সংক্রান্ত ক্যাসেটের বক্তৃতা শুনে, এমন ক্যাসেট যার মধ্যে এ ধরনের অনেক হাদিস রয়েছে।

মুসলিমদের কর্তব্য হচ্ছে অতিশয়োক্তির প্রবাহে পতিত না হয়ে আইনের ক্রম অনুযায়ী আমল করা। কারণ তা আমাদেরকে অতিরিক্তকরণ কিংবা চরম অবহেলার মধ্য নিয়ে যায়। যেমনটা আলী ইবনে আবি তালিব বলেন : তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক হচ্ছে [কিছু করার ক্ষেত্রে] মধ্যপন্থা, যা অতিদূর গমন থেকে ফিরায় [আর–গালী] এবং ব্যক্তিকে যথেষ্ট আমল করার কাজে ধরে রাখে (আল-টালী)।

চ). একটি যঈফ হাদিস এককভাবে কোনো হুকুম প্রতিষ্ঠা করতে পারে না

দ্বীনের আলেমগণ যঈফ হাদিস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন এরূপ করার সাথে সম্পর্কিত শর্তে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক'র মতানুযায়ী : তারা যঈফ হাদিস বর্ণনায় এর ইসনাদ পরীক্ষায় শিথিল ছিলেন পুণ্যের কাজের প্রতি আবেদন তৈরির উদ্দেশ্যে, যার পুণ্যময়তা ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্য আইনী যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অথবা এমন খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, যার খারাপী ইতোমধ্যেই গ্রহণযোগ্য আইনী যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তারা যঈফ হাদিস আমলের পুণ্য বা পাপ প্রমাণে ব্যবহার করতে চাননি। তবে, সাধারণ জনসমাজের অনেকেই, বাস্তবিকপক্ষে কিছু হাদিসবিশারদও, যঈফ হাদিস বর্ণনার অনুমোদনযোগ্যতা (শর্তসহ) এবং এর দ্বারা কোনো আমল প্রতিষ্ঠার মধ্যে পার্থক্য করেননি।

এ কারণেই আমরা দেখি উদাহরণস্বরূপ, অধিকাংশ মুসলিম দেশের লোকদেরকে মধ্য-শা'বানের রাত্রে অতিরিক্ত কিছু করতে। তারা এটিকে বিশেষ রাত বানায় এর মধ্যে জাগরণের দ্বারা এবং এর দিনে রোজা রাখে আলী থেকে বর্ণিত মারফু সূত্রের হাদিসের ভিত্তিতে : যখন মধ্য শা'বানের রাত্রি আসে, রাতে জাগরণ কর এবং দিনে রোজা রাখ। কারণ মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের পর এই রাত্রে নেমে আসেন পৃথিবীর আসমানে এবং তিনি বলতে থাকেন : এমন কে আছে, যে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করবো ...। ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন। আল-মুনযিরী এর দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন; আল-বুসীরীও জাওয়াইদ ইবন মাজাহ'র মধ্যে এর দুর্বলতা নিশ্চিত করেছেন[২৬]।

আবার অধিকাংশ মুসলিম দেশে, আমরা দেখি, লোকেরা অনেকেই আশুরা দিবসে পশু কুরবানি করে এটাকে একটা ঈদ গণ্য করে অথবা এমন একটা দিন যা নিয়মিত বার্ষিক স্মরণানুষ্ঠানের দিন এবং এদিনে তারা উদার হস্তে আত্মীয় স্বজনকে দান করে। তারা এর সবকিছুই একটা যঈফ হাদিসের ভিত্তিতে করে, যা লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত : আশুরার দিনে যে ব্যক্তি মুক্ত হস্তে আত্মীয় স্বজনকে প্রদান

করে, আল্লাহ তায়ালা তার অবশিষ্ট বছরসমূহের জন্য তার প্রতি দানশীল হবেন। ইবন তাইমিয়্যাহ এবং অন্যদের মতানুযায়ী এই হাদিসটি জাল। এর সম্পর্কে আল-মুনযিরী বলেন, আল-বাইহাকী ও অন্যরা এটি একদল সাহাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আল-বাইহাকী বলেন, যদিও এই হাদিসের ইসনাদ দুর্বল, কিন্তু যখন সেগুলো একত্র করা হয়, একটি অন্যটির সাথে মিলে শক্তি অর্জন করে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এটি এমন বর্ণনা যা সন্দেহ উদ্রেক করে। ইবন জাওযী, ইবন তাইমিইয়াহ এবং অন্যরা একেবারেই নিশ্চিত ছিলেন যে, এই হাদিসটি জাল। কিন্তু আল-ইরাকী এবং অন্যরা এটাকে হাসান লি-গাইরিহী (অর্থাৎ এটি নিজে হাসান নয়, কিন্তু এর সমর্থক সনদসমূহ দ্বারা এটি হাসান) প্রতিপন্ন করেন। পরবর্তী অনেক আলেম এটাকে জাল হাদিস বলে রায় দেওয়া কষ্টকর মনে করেছেন।

সাক্ষ্যের ভারসাম্যের ভিত্তিতে এসবকিছু এ ধারণাই দেয় যে, এ হাদিসটি এমনই কোনো কিছু যা সুন্নিদের কিছু জ্ঞানহীন ব্যক্তি শিয়াদের বাড়াবাড়ি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আবিষ্কার করেছে। তাদের কাছে আশুরার দিন হচ্ছে দুঃখ ও শোকের দিন, তাই এটাকে তারা গোসল করার ও ঝকঝকে পোশাক পরার এবং শিশুদেরকে উপহার দেওয়ার দিনে পরিণত করেছে!

মুসলিম জনগণের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝি ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত বিদআতই যঈফ হাদিসের সূত্রে এসেছে। এগুলো তাদের পশ্চাৎপদ প্রজন্মের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, তাদের মন ও আত্মাকে প্রভাবিত করেছে এবং বিতাড়িত করেছে সহিহকে। তথাপি মুসলিমদের জন্য সহিহ প্রয়োজন - কুরআনের সীমার মধ্যে - তাদের বুঝাবুঝি ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। আল-ই'তিসাম গ্রন্থে আল-শাতিবী এই কর্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিইয়াহ, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি সদয় হোন, আলেমদের এই মানসিকতা সম্পর্কে একটি স্ফটিক -স্বচ্ছ আলোচনা করেছেন, যাতে তারা মনে করেন যে, মানুষ নির্ধারিত কিছু আমলের ফাজাইল বা তারগিব ও তারহিবের সুবিধার জন্য দুর্বল হাদিসের অনুশীলন করতে পারে।

যে বিষয়ের ওপর আলেমগণ রয়েছেন [অর্থাৎ তাদের বিবেচিত মত রয়েছে] তা হচ্ছে : ফাজাইলের ওপর যঈফ হাদিসের ভিত্তিতে আমল করা হাদিস দ্বারা অনুমোদিত, কোনো আমল প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, কারণ তা [নিজেই] যুক্তি হিসেবে উধৃত নয়। কারণ অনুমোদিত আমল নিশ্চয়ই এক ধরনের আইনী আদেশ এবং তা আইনী প্রমাণ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা হতে বর্ণনা করে যে, তিনি আইনী প্রমাণ ব্যতিরেকেই নির্ধারিত কিছু আমলকে পছন্দ করেন তিনি নিশ্চয়ই দ্বীনে [কিছু] আইন হিসেবে নির্দেশিত করেছেন, যার জন্য আল্লাহ তায়ালা থেকে তার

কোনো অনুমতি নেই। এটা ঠিক যেন এরকম, সে বাধ্যতামূলক অথবা নিষিদ্ধকৃত ধরনের আমল প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ কারণেই আলেমগণ অনুমোদিত [ধরন] বিষয়ে মতভেদ করেছেন। বাস্তবিক এটা হলো দ্বীনের মৌলিক নীতি যা আইনে সংজ্ঞায়িত রয়েছে।

ঐ বিষয়ে তাদের ইচ্ছা কেবল এই ছিল যে, আমল এমনকিছু হবে যা কুরআন বা সুন্নাহ্‌র মূলপাঠ অথবা ইজমা [ঐকমত্য] দ্বারা ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ তায়ালা তা ভালোবাসেন অথবা অপছন্দ করেন-যেমন কুরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহর নামের তাসবিহ করা, দোয়া করা, দানখয়রাত, দাসমুক্ত করা, লোকদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করা এবং ঘৃণা করেন মিথ্যাকথন বা প্রতারণা এবং এর মতোই অন্যকিছু... । সুতরাং যখন কিছু অনুমোদিত ফজিলত ও পুরস্কার সম্পর্কে এবং কিছু আমলের অপকারিতা ও শাস্তি সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করা হয় এবং এগুলোর পুরস্কার ও শাস্তি এবং এগুলোর প্রকরণ প্রতিষ্ঠিত ও স্থিরীকৃত এবং যদি বর্ণনাকৃত হাদিস ঐরকম একটি হয় যা জাল বলে আমরা জানি না, তাহলে এর বর্ণনা এবং এর ওপর আমল করা অনুমতিযোগ্য। অর্থ হচ্ছে, আত্মা-এর দ্বারা পুরস্কার আশা করতে অথবা শাস্তির ভয়ে ভীত হতে পারে। ঠিক যেমন একজন মানুষ জানে যে, বাণিজ্যে লাভ আছে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে সে জানল যে, এতে বিপুল লাভ, তা সত্য হলে তাকে লাভবান করবে, কিন্তু মিথ্যা হলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এর একটা উদাহরণ হচ্ছে ইসরাইলীদের বর্ণনা এবং স্বপ্ন-দৃশ্যের [বর্ণনার] ওপর সালাফ ও আলেমদের কথা এবং আলেমদের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং ঐপ্রকার কিছুর ওপর [নির্ভরতায়] তারগিব ও তারহিব আইনী নির্দেশনা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করে না- না একটি সুপারিশকৃত আমলের বা অন্যকিছুর। যা হোক, তারগিব ও তারহিবের মধ্যে উল্লেখ এবং ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক অনুমতিযোগ্য এই শর্তে যে, এ সম্পর্কে যা আকর্ষণকারী বা নিবৃত্তিমূলক তা ইতোমধ্যেই আইনী যুক্তি দ্বারা জ্ঞাত। কারণ বাস্তবিকই তা উপকারী এবং ক্ষতিকর নয়। তা সত্য বা মিথ্যার বেলাতেও এটা একইরকম। কারণ যা মানুষ মিথ্যা ও জাল বলে জানে, তার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অনুমতি নেই। কারণ যদি এটি মিথ্যা হয়, তাহলে কোনোকিছুর জন্যই ভালো নয় এবং যদি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে এটি সহিহ, তাহলে এর দ্বারা অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। যখন উভয় বিষয়ই [এটা সত্য অথবা এটা মিথ্যা] প্রয়োগ করা হয়, এটা এর সত্য হওয়া এবং মিথ্যা হলে ক্ষতিকর না হওয়ার সম্ভাবনার ওপর বর্ণিত হবে। আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন : যখন তারগিব ও তারহিব সম্পর্কিত বর্ণনা আসে, তখন আমরা ইসনাদের জন্য [সাধারণ মান] বর্ণনা সনদসহ করি এবং আমরা এমন করি যদি ঐগুলো [গুণসম্পন্ন] বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক

বর্ণিত না-ও হয়, যাতে কেউ আইনী যুক্তি ঐগুলোর ওপর দাঁড় করাতে পারে। একইভাবে কেউ এমন কথা বলে : আমলের সুবিধা আছে এমন হাদিস অনুযায়ী আমল করো, এগুলোর মধ্যে এমনগুলো করা যাতে যথার্থতা রয়েছে, যেমন কুরআন তেলাওয়াত ও [আল্লাহ্ তায়ালার] জিকর করা এবং নিন্দনীয় ও অসৎ প্রকৃতির কাজ এড়িয়ে চলা।

কিন্তু যদি ফাজাইল সংক্রান্ত যঈফ হাদিস এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে যা আইন দ্বারা স্থিরীকৃত ও সীমাবদ্ধ নির্দিষ্টকৃত গুণ তা আপনার জন্য অনুমতিযোগ্য নয়। কারণ আইনী প্রমাণ দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ তেলাওয়াত বা বিশেষ প্রার্থনা করা। [এটা] এর মধ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে [তার মতোই কিছু] ভিন্ন : যে কেউ বাজারে ঢুকেছে এবং বলেছে নাই কোনো ইলাহ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত... সে এই এবং এই পাবে[২৭]। এখন বাজারে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ অনুমোদিত এই কারণে যে, ভুলোমনাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণের ক্ষেত্রে সুপরিচিত হাদিসে এসেছে : বিস্মৃতিশীলদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ হচ্ছে শুকনো বৃক্ষসমূহের মধ্যে সবুজ বৃক্ষ[২৮]।

পুরস্কারের পরিমাপ ক্ষেত্রে [একটি যঈফ হাদিসে] বর্ণনার ব্যাপারে এর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ক্ষতি করে না, এটার অ-বিদ্যমানতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

উপসংহার : কোনো ব্যক্তি এই ধরনের হাদিস এবং কোনো ব্যক্তি তারগিব ও তারহিবে প্রাপ্ত হাদিস অনুযায়ী আমল করে, কিন্তু অনুমোদিত আমলে থাকে না। এর বাইরে এর ফলাফল সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস - এবং [এটা] হচ্ছে [এর জন্য] পুরস্কার ও শাস্তির মাপকাঠি-যা আইনী প্রমাণের ওপর শর্তযুক্ত[২৯]।

এই সুস্পষ্ট উন্মোচন সত্ত্বেও যঈফ হাদিস অনুযায়ী অনেক লোককে হালাল ও হারামের অনুমোদন ও তিরস্কারযোগ্যতার সীমা, শর্ত ও পরিমাণ প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়।

ছ). যঈফ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটি সম্পূরক শর্ত

আমার মতে তারগিব ও তারহিবের ওপর যঈফ হাদিসের অনুমতিযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো গ্রহণ করি, তাহলে ইতোমধ্যে উল্লিখিত তিনটি শর্তকে সুরুচিসম্পন্ন করতে আরো দুটি পরিপূরক শর্ত রয়েছে। (ঐগুলো আমার বই ছাকাফাত আল-দা'ইয়াহর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে) ঐগুলো হচ্ছে :

১. হাদিস এমন অতিরিক্ত অতিশয়োক্তি ধারণ করবে না বা যুক্তি বা আইন বা ভাষার বিরোধী;

২. হাদিস এর চেয়ে সবল কোন আইনী প্রমাণের সাথে বিরোধ ঘটাবে না।

যুক্তি বা আইন বা ভাষার বিরোধী কী?

হাদিস গবেষকগণ ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন যে, জাল হাদিস লক্ষণ দ্বারা পরিচিত যা বর্ণনাকারী বা বর্ণনার মধ্যেই থাকে। যা বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রামাণ্য লক্ষণাদি হচ্ছে : (ক) জালিয়াতির সাধারণ সাক্ষ্য, তা এই যে, বর্ণনা যুক্তির বিপরীত, তাই এর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা অনুভূতি ও ধারণার দ্বারা সহজেই বাতিলযোগ্য। অথবা (খ) বর্ণনাটি মুতাওয়াতির বা অকাট্য কিতাব ও সুন্নাহ্র সুনির্দিষ্ট প্রমাণের বিপরীত, অথবা সুনির্দিষ্ট ইজমার (ঐকমত্যের) এবং এ দুটির মধ্যে বিরাজমান বৈপরীত্য নিরসনের কোনো সম্ভাবনাও নেই। অথবা (গ) বর্ণনাটির বিশাল বিষয় নিয়ে কিছু করার রয়েছে, যে সম্পর্কে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপস্থিত একদল মানুষের গভীর প্রত্যাশাও রয়েছে অথচ মাত্র একজন তা পৌঁছিয়েছে। ঐসব প্রমাণিত লক্ষণের মধ্যে আরো রয়েছে : ছোটখাট বিষয়ে কঠিন হুমকির চূড়ান্ত অথবা সামান্য ব্যাপারে কঠিন প্রতিজ্ঞা; এমনটা কাহিনী-বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান।

এমনকি হাদিসবেত্তাগণের মধ্যেও এমন অনেকেই রয়েছেন যারা তারগিব ও তারহিব এবং এমন বিষয়াদি বর্ণনার ক্ষেত্রে এসব মূল উপাদান প্রয়োগ করেন না। সম্ভবত তাদের ক্ষেত্রে বয়সের অর বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।

আমাদের সময়কালের যুক্তির পদ্ধতির ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, এগুলো হৃদয়ঙ্গমও করা যায় না এবং এমনটা হতে পারে যে, দ্বীন নিজেই অভিযুক্ত হবে যদি এমন ধরনের হাদিসের এসব অতিশয়োক্তির মোকাবেলা করা হয়।

যা ভাষাকে বিচলিত করে সে সম্বন্ধে

এই শ্রেণিতে অনেক হাদিস রয়েছে যা গল্প কথকগণ বর্ণনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, দারাজ আবু আল-সামাহ কুরআনের ভাষ্যে এমন শব্দ সংযোজন করেছেন যার ভাষাগত অর্থ মৌলিকভাবে স্পষ্ট, কিন্তু এর জন্য তিনি যে ব্যাখ্যাসমূহ বর্ণনা করেছেন তা এদের অভিনবত্ব আভিধানিক অর্থের দূরত্বের কারণে বিপথমুখী। আবু সাঈদ থেকে মারফূ সূত্রে আবু হায়সাম থেকে বর্ণিত হাদিস এর উদাহরণ : ওয়ায়েল-এর অর্থ হচ্ছে জাহান্নামের গহ্বর - অবিশ্বাসীরা এতে পতিত হতে থাকবে চল্লিশ বছর ধরে তলদেশে পৌঁছানো পর্যন্ত। ইবন হাম্বল এবং আল-তিরমিজি কিছুটা অভিন্ন বর্ণনা করেছেন তাদের এই শব্দগুচ্ছ সত্তর বছর ব্যতীত। কিন্তু ওয়ায়েল শব্দের অর্থ ধ্বংসের হুমকি যা ইসলামের পূর্বে ও পরে সুবিদিত। আরেকটি

উদাহরণ দেওয়া যায়, আল-তাবারানি ও আল-বাইহাকীর মতানুযায়ী ইবন মাসউদ থেকে, আল-গাইয়্যি বিষয়ে এই আয়াত সম্পর্কে তার ভাষ্য :

> অতঃপর তাদের পর এলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত হারাল, আর লালসার বশবর্তী হলো। তারা শীঘ্রই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে (সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৫৯)।

ইবন মাসউদ বলেন : জাহান্নামের একটি গহ্বর এবং একটি ভিন্ন বর্ণনায় : জাহান্নামের আগুন। কিন্তু গাইয়্যি একটি সুপরিচিত শব্দ এবং এটি রুশদ (হিদায়াত) শব্দের বিপরীতার্থক, যেমনটা এই আয়াতে :

> সত্য পথ (আল-রুশদ) স্পষ্টভাবে পৃথক হয়েছে ভ্রান্ত পথ হতে (আল-গাইয়্যি) (সুরা বাকারা, ২ : ২৫৬)।

আনাস ইবন মালিক হতে আল-বাইহাকী ও অন্যরা এ আয়াতের ওপর একই রকম বলেছেন :

> এবং আমি উভয় দলের মাঝে রেখে দেব এক ধ্বংস-গহ্বর (মাওবিক) (সুরা কাহাফ, ১৮ : ৫২)।

মাওবিকের অর্থ সম্পর্কে আনাস বলেন : পুঁজ ও রক্তভর্তি গহ্বর। এমনকি শাফী ইবন মা-তি হতে ইবন আবিদ কর্তৃক দুনয়া'র বর্ণনা আরো অভিনব, তা এই যে : জাহান্নামের মধ্যে আছাম নামে একটি গর্ত রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সাপ ও বিচ্ছু ...। তিনি এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেন :

> আর যে এগুলো করে, সে আছামা-এর সাক্ষাৎ লাভ করবে (শাস্তি দেখতে পাবে) (সুরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮)।

কিন্তু আছাম হচ্ছে ইছম (পাপ, অন্যায়) শব্দ হতে উদ্ভূত।

এটা বাস্তবিকপক্ষে দুঃখজনক যে, আল-মুনযিরী (রহ.) তাঁর আল-তারগিব ওয়াত তারহিব পুস্তকে এই হাদিসগুলো উদ্ধৃত করতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি করুণা করুন। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, খুতবা প্রস্তুতকারীরা তাঁর কাছে দৌড়ে যেত এবং তাঁর চেয়ে বেশি করত। এ কারণেই আমরা আমাদের গ্রন্থ আল-মুনতাকা মিনাল তারগিব ওয়াত তারহিব-এর মধ্যে এর বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করেছি।

একটি সবলতর আইনী যুক্তির সাথে এর বিরোধ থাকা উচিত নয়। আবদুর রহমান ইবন আওফ সম্পর্কে বর্ণনায় যঈফ হাদিসগুলোর উদাহরণ পাওয়া যায়। তা এই

যে, তিনি তার ধন সম্পদের কারণে চারজনের মধ্যে সবার উপরে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। দাবি করা হয়েছে যে, এসব হাদিস সম্পদের বিষয়ে কঠিন পরীক্ষার বিরুদ্ধে সাধারণ সতর্কবাণীর সাথে এবং সম্পদশালীদের ক্রোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাহোক আমরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখব যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ সেই দশজনের মধ্যে একজন যাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

খুব বিস্তারিতভাবে প্রত্যায়িত ঘটনাবলী এবং অতিবিশ্বাসযোগ্য বর্ণনার কথা বলাই বাহুল্য এর সবগুলোই এটা প্রতিষ্ঠা করে যে, তিনি দশজন মহত্তর মুসলিমের একজন ছিলেন, নেক আমল ও আল্লাহ্ তায়ালা ভীতিতে মহান, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় অকাতরে সম্পদ ব্যয় করতেন এবং তিনি আল্লাহ্ তায়ালার সত্যিকার শোকরগুজার বান্দার আদর্শ। এ কারণেই আল্লাহর রসুল সা. তার প্রশংসা করেছেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। উমার রা. তাকে তার মজলিসে শুরার ছয় সদস্যের একজন নিযুক্ত করেছিলেন এবং যখন সকলের মত একরকম হতো তখন তার (আবদুর রহমান ইবনে আউফ) মতামতকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিতেন।

এ কারণেই আল-মুনজিরী এসব হাদিসকে তাদের অন্যায্যতার জন্য খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন : একদল সাহাবির একটি হাদিস মারফত রসুল সা. থেকে আমাদের কাছে সঠিক নয় এমন কিছু এসেছে যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ তার বিশাল সম্পদের জন্য চারজনের সবার ওপরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ঐ হাদিসগুলোর সর্বোত্তমটি আপত্তি থেকে নিরাপদ নয় এবং হাসান পর্যায়ের কোনো কিছু কোনো একজন রাবি থেকেও কখনো আসেনি। নিঃসন্দেহে তার সম্পদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা রসুল সা. উল্লেখ করেছেন : একজন সৎকর্মশীল মানুষের সৎভাবে উপার্জিত সম্পদ কতই না উত্তম![৩০] সুতরাং পরকালে তাঁর অবস্থান কিভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, বা অপর্যাপ্তভাবে তাঁর বিচার করা হবে, এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্পদশালী লোকদের বাদ দিয়ে? এবং এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় আবদুর রহমান ইবন আউফ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এমন বর্ণনা আসেনি। এটা বলা কেবল সম্প্রদায়ের ধনীদের ওপর দরিদ্র লোকদের নিরঙ্কুশ অগ্রাধিকার বুঝানোর ক্ষেত্রেই সঠিক হতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালাই উত্তম জানেন[৩১]।

আল-গারানিক-এর হাদিসটি এ ধরনের আরেকটি উদাহরণ। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের ইবনে হাজার-এর মানসম্পন্ন একজন হাদিস বিশেষজ্ঞ (হাফিয) রয়েছেন। আল-বুখারির ভাষ্য-লেখক এই হাদিস সম্বন্ধে এমন বর্ণনা দেন যে, যেহেতু এটি কতকগুলো সূত্র থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর অবশ্যই একটি উৎস

রয়েছে। কিন্তু এটি এমন হাদিস যা স্পষ্ট যুক্তি গ্রহণে অসম্মত এবং বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। শাইখ আল-আলবানি তার নাসবা আল-মাজানিক লি-নাসফ কিস্সাত আল-গারানিক গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন। মুহাম্মদ সাদিক আরজানও তার মূল্যবান গ্রন্থ রসুল সা.-এর মধ্যে এসব গল্পের ভিত্তিহীনতা মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোকে বাজে মিথ্যা বলে বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞানী প্রচারক জনগণের নিকট অস্পষ্ট কিছু পৌছান না

একজন উজ্জীবিত প্রচারক হাদিস নামে পরিচিত সব কিছুই মানুষের কাছে পৌছান না, এমনকি সহিহ হলেও। ক্বাওয়াইদ আল-তাহদিস গ্রন্থে জামাল উদ্দীন আল-কাসিমী বলেন :

> সব সহিহ হাদিসই সাধারণ লোকদের কাছে পৌছানো হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রমাণ হচ্ছে, শায়খাঈন [আল-বুখারি ও মুসলিম] মু'আয থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আমি রসুল সা.-এর পিছনে সওয়ারিতে উপবিষ্ট ছিলাম। এসময় তিনি সা. বললেন : মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অধিকার কী? আমি বললাম : আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি সা. বললেন : নিশ্চয়ই বান্দার ওপর আল্লাহ তায়ালার অধিকার হচ্ছে যে, তারা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না এবং বান্দার অধিকার হচ্ছে, যারা তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করে না তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসুল, আমি কি লোকদেরকে এই শুভ সংবাদ জানিয়ে দেবো? তিনি সা. বললেন : না, তাদেরকে এই শুভ সংবাদ জানিও না, কারণ তারা অলস হয়ে পড়বে!
>
> অন্য একটি বর্ণনায় উভয়েই [আল-বুখারি ও মুসলিম] করেছেন, তাতে আনাস থেকে জানা যায় যে : রসুল সা. মুয়ায কে বললেন, যিনি সরাসরি তাঁর সা. পেছনে বসে ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে সর্বান্তঃকরণে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল, সে জাহান্নামে যাবে, সেই বিষয় ছাড়া যে বিষয়ে আল্লাহই তাকে আগুন থেকে বাঁচাবার মালিক। তিনি (মুয়ায) বললেন : হে আল্লাহর রসুল! আমি কি লোকদের এই সংবাদ জানাব না যাতে তারা এই শুভ সংবাদে উল্লসিত হতে পারে? তিনি সা. বললেন : তাহলে তারা আমল করা থেকে বিরত থাকবে।

মুয়ায রা. তার মৃত্যুকালে [কাউকে] এটা জানিয়ে গেছেন [জ্ঞান পৌছে দেওয়া এবং তা গোপন না করা সম্পর্কিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ] এর গুনাহ হতে বাঁচার জন্য। আল-বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন একটি নোটে [অর্থাৎ কোনো সনদ সংযুক্ত না করে] আলী থেকে : লোকদের কাছে পৌছাবে যা তারা জানে [এবং যাতে অনুধাবন করতে পারে]; তোমরা কি চাও আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে অস্বীকার করা হোক? ইবন মাসউদ-এর এরকমই একটি উক্তি রয়েছে- তুমি ঐ লোকদের কাছে হাদিস পৌছাওনি যাদের মন এটা অর্জন করতে পারে না তাছাড়া যা, তাদের জন্য একটা পরীক্ষা। মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবন হাজার বলেন : যারা কিছু হাদিস পৌছে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন অথচ অন্যগুলো নয়, তাদের মধ্যে : আহমাদ ইবন হাম্বল ঐসব হাদিস সম্পর্কে যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বুঝায়; মালিক গুণাবলী সংক্রান্ত হাদিস; আবু ইউসূফ মোজেযা [বিষয়] এবং তাদের পূর্বে আবু হুরায়রা [উদাহরণস্বরূপ] দুই থালি বিষয়ে তার কাছে থেকে যা বর্ণিত হয়েছে;[৩২] সেই অবস্থান [যা আবু হুরায়রা ইঙ্গিত করেছিলেন] হচ্ছে তাই, যা ঘটে মতভেদ বিবাদ বিসম্বাদের সময়। এর মতোই একটি বর্ণনা হুযায়ফা হতে বর্ণিত এবং হাসান (আল-বাসরি) থেকে : যে, তিনি আল-হাজ্জাজের কাছে আনাস কর্তৃক উরানিয়্যুন সম্পর্কিত কাহিনী পৌছে দেওয়া অপছন্দ করেছেন[৩৩]। এই আশঙ্কায় যে, হাজ্জাজ তিনি তার এটাকে অবলম্বন করতে পারতেন একটা হাতিয়ার হিসেবে, তিনি অতিরিক্ত রক্তপাতকে গ্রহণযোগ্য করতে মনস্থ করেছিলেন।

এর নিয়ন্ত্রক নীতি হলো : হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ধর্মীয় বিদআতকে শক্তিশালী করতে পারে এবং এর বাহ্যিক অর্থ প্রকৃত উৎসের উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং যা চাওয়া হচ্ছে তা হয়ে, ঐ ব্যক্তি হতে ফিরিয়ে রাখা, যার সম্পর্কে ভয় আছে যে সে এর বাহ্যিক অর্থের অপব্যবহার করবে।

এভাবে সমগ্র হাদিস সামষ্টিকভাবে এবং পৃথকভাবে পৌছানো নিষিদ্ধকরণ জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত এবং নিজেই নিষিদ্ধ নয়। মুয়ায মানুষকে জানিয়েছেন, কারণ তিনি করেছেন দ্বীনের জ্ঞান পৌছে দেওয়ার নির্দেশের ফলে।

কিছু আলেম বলেছেন যে, রসুল সা.-এর বক্তব্য তাদেরকে এই শুভ সংবাদ দিও না কিছু লোকের কাছে বিশেষায়িত, অর্থাৎ সর্বজনীন নয়। আল-বুখারি যুক্তির মধ্যে এটা উদ্ধৃত করেছেন যে, আলেমগণের দায়িত্ব এই জ্ঞান কিছু লোকের জন্য

বিশেষায়িত করা, অন্যদের জন্য নয়। নিন্দনীয় হচ্ছে লোকদের বোধগম্যতা ঐ বিষয়ে যা তাদের কাছে পৌঁছানো হয়। তিনি এ অবস্থান গ্রহণের, সর্ব জনকে অনুমতি দেওয়া ঐন্দ্রজালিকদের মতো এই হাদিসসমূহ (আল-বাতালাহ[৩৪] আল-মুবাহিয়্যাহ[৩৫]) দ্বীনী দায়িত্ব পরিত্যাগ করার এবং অনুশাসন ভুলে নেওয়ার জন্য ওজর পেশ করে এবং তা পরজগতে ধ্বংসের ওপরে এই জগতে ধ্বংসের প্রশস্ত পথ খুলে দেয়। কারণ কোথায় তারা, যারা তাদেরকে সুসংবাদ দিলে ইবাদতে বিরাট বিস্তার ঘটায়? রসুল সা. কে বলা হয়েছিল কেন আপনি সরাসরি [সালাতে] দণ্ডায়মান থাকেন যেখানে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি সা. বলেন : আমি কি শোকরকারী বান্দা হব না?[৩৬]

সুতরাং আমি ঐসব প্রচারকের মনোভাবে একেবারেই আশ্চর্য বোধ করি, যারা মাছির হাদিস (মাছিকে সম্পূর্ণভাবে মধ্যে খাবারের ডোবানোর কথা) উল্লেখ করতে বিরত হন না! অথবা ঐ হাদিস, যাতে মুসা আ. মালাকুল মউতকে চড় মেরেছিলেন! অথবা সেই হাদিস (জবাবে যাতে একজন প্রশ্ন করেছিল, আমার পিতা কোথায়?) প্রকৃত পক্ষে তোমার পিতা ও আমার পিতা জাহান্নামে। অথবা এমন হাদিসসমূহ যাতে সালাফ ও খালাফ (প্রাথমিক প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্ম) আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলী ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন বিধেয় হিসেবে [তাঁর প্রয়োজনীয় বিদ্যমানতা প্রকাশে] - (উভয় ক্ষেত্রে যদি অসাবধানতাবশত প্রকাশ হয়) এই সম্ভাবনায় যে, অপব্যাখ্যার ফলে মানব দেহে (তিনি) অনুপ্রবিষ্ট হন। অথবা, ফিতনার সময়ের হাদিসসমূহ যার বাহ্যিক অর্থ এমন মনে করা হতে পারে যে, নিয়মশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো আশাই নেই এবং কোনো রকম বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ হতে দূরে সরে থাকা। অথবা অন্য হাদিসসমূহ যার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের জন্যই উপলব্ধি করা অতি দুরূহ।

এই সব হাদিসের কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলোর ভিত্তিতে কোনো হুকুম আসেনি। যদি লোকেরা এগুলো না শুনেই তাদের দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে দেয়, তাতে তাদের জন্য সরিষার দানা পরিমাণও কম করবে না। যদি কোনো বিশেষ কারণে এসব হাদিস হতে প্রচারক কিছু প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তা সঠিক কাঠামোতে উপস্থাপন করা তার কর্তব্য হবে। এগুলোকে কিছু বিশদ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করবেন যাতে এর অর্থ স্পষ্ট হয় এবং এসবের ব্যাপারে সবরকম সন্দেহ ও সংশয় দূর হয়।

আমরা এর দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি বিখ্যাত হাদিস গ্রহণ করেছি যা প্রায়ই মানুষকে ভুল বুঝতে প্ররোচিত করে এবং ঐ বুঝের কারণে তারা এর ভিত্তিতে ভয়ানক পরিণতি সম্পন্ন নির্দেশ প্রদান করে। এটা হচ্ছে নিম্নে বর্ণিত আনাস এর হাদিস :

হাদিস : পূর্ববর্তী জমানার তুলনায় পরবর্তী জমানার খারাপ

আল-যুবাইর আদি'র সনদে আল-বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা আনাস ইবন মালিকের কাছে এসে হাজ্জাজের সাক্ষাতে প্রাপ্ত আমাদের সংশয়ের কথা ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি বলেন : ধৈর্য ধারণ করো। কারণ তোমাদের কাছে এমন উৎকৃষ্ট সময় আসবে না। যা এর পরে আসবে তা এর চেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ পাও। আমি তোমাদের নবির সা. কাছ থেকে এটা শুনেছি।

এই হাদিসের গুরুত্ব

পদক্ষেপ না নিয়ে পেছনে বসে থাকা, সংস্কারের জন্য চেষ্টা বা পরিবর্তন ও বিপদমুক্তির জন্য চেষ্টা না করার কারণ হিসেবে কিছু লোক এই হাদিসটিকে গ্রহণ করে থাকে। তারা যুক্তি দেয় এই হাদিস প্রমাণ করেছে যে, মানুষের আমল অবিরাম পতনশীল, পতন স্থায়ী হয়েছে, কেবল খারাপের দিকেই যাচ্ছে, এক পর্যায় থেকে নিম্নতর পর্যায়ের দিকে ধাবমান, খারাপ থেকে আরো খারাপ, মন্দ হতে হচ্ছে অধিকতর মন্দ, যতক্ষণ না দুষ্টদের সময় ঘনিয়ে আসে এবং সব মানুষ তাদের প্রভুর সাথে মিলিত হয়।

অন্যরা এই হাদিস গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এক সময় তাদের কেউ কেউ এটিকে প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত হয়েছেন তাদের চিন্তা ধারণার মাধ্যমে। হাদিসটা কয়েকটি কারণে ক্ষতিকর কিংবা ভুল ছিল। প্রথম, এটি নৈরাশ্য ও হতাশাকে উৎসাহিত করে। দ্বিতীয়, বিপথগামী শাসকের নির্যাতন মোকাবেলায় এটি নেতিবোধের উদ্রেক করে। তৃতীয়, এটি প্রগতির ধারণার বিরোধী যার ওপর সমগ্র জীবন ও অস্তিত্ব দণ্ডায়মান। চতুর্থ, এটি মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে দূরে। পঞ্চম, এটা সেই হাদিসসমূহের বিরোধী যা একজন খলিফার আবির্ভাবের বর্ণনা নিয়ে এসেছে, যিনি পৃথিবীকে ন্যায় বিচার দ্বারা পূর্ণ করবেন (তিনি সেই ব্যক্তি যিনি আল-মাহদী নামে পরিচিত)। যেমন, এটি এখন পূর্ণ হয়ে আছে অত্যাচার ও অন্যায় দ্বারা এবং এটি আইনের শাসন এবং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এর মর্যাদাপূর্ণ উল্লেখ সম্পর্কিত বর্ণনায় ভরপুর।

এই হাদিসের প্রতি আমাদের পুরনো দিনের আলেমদের মনোভাব

এটা বলা আমাদের কর্তব্য যে, আমাদের আলেমদের পূর্ববর্তীগণ এই হাদিস সম্পর্কে অনাগ্রহী, এর সাধারণত্ব (ইত্‌লাক) অস্পষ্ট। সাধারণত্ব বলতে তারা সেই

অর্থকে বুঝিয়েছেন যা হাদিসটি থেকে বুঝা যায়। তা এই যে, প্রত্যেক সময়ই এর পূর্বের সময়ের চেয়ে নিকৃষ্ট, যেখানে পূর্ববর্তীর চেয়ে কোনো কোনো সময় অন্যায়ের দিক দিয়ে ক্ষমতাধর। যদিও তা কেবল একবারই- উমার ইবন আবদুল আজিজের শাসনকালেই হয়েছে। এমনকি এ সম্পর্কে যদি এমনটা বলা হয় যে, তার সময়ে খারাপ কিছু নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল- আরো সামনে এগিয়ে, কোনোভাবেই এটা দাবি করা যাবে না যে, তার সময়কাল তার পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে খারাপ ছিল।

পূর্ববর্তী সময়ের আলেমগণ নিম্নবর্ণিত রক্ষণশীলতায় সাড়া দিয়েছেন

ক). হাসান আল-বাসরীর ব্যাখ্যা

আল-হাসান আল-বাসরী এই হাদিসটির অর্থ আরোপ করেছেন সেই সময়ের ওপর, সব সময়ের নয়; অবিসংবাদিত সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থ বাতিল করে। আল-হাজ্জাজের পরে উমার ইবন আবদুল আজিজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন : কিছু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের স্থান জনসাধারণের জন্য প্রয়োজন ছিল।

খ). ইবন মাসউদের ব্যাখ্যা

ইবন মাসউদ থেকে এসেছে : তোমাদের ওপর ঐ সময় ব্যতীত এমন সময় আসবে না যা এর আগের সময়ের চেয়ে ভালো। এখন দেখ, আমি এটা বুঝাচ্ছি না যে, এক শাসক অন্য একজন শাসকের চেয়ে উত্তম নয় এবং কোনো বছরই আরেক বছরের চেয়ে উত্তম নয়, কিন্তু তোমাদের আলেম ও ফকিহগণ চলে যাবেন, তারপর তোমরা [লোকদের] মধ্য থেকে [তাদের] উত্তরাধিকারী পাবে না এবং এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা তাদের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে ফতোয়া প্রদান করবে। একটি বক্তৃতায়, যা তার বলে কথিত, তিনি বলেন : তখন তারা ইসলামকে কলুষিত করবে এবং একে ধ্বংস করে ছাড়বে। আল-ফাতহ'র মধ্যে ইবন হাজার এই প্রসঙ্গে ভালো ও মন্দ'র অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এই যুক্তির পরিমাপ করেন এবং বলেন : অনুসরণের জন্য তিনিই অধিক যথার্থ ব্যক্তি।

কিন্তু বাস্তবে তিনি এই অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করেননি। কারণ, মূলপাঠ অনুযায়ী এটা দেখা গেছে যে, অদেখা ভবিষ্যতে ইসলামের জন্য সময় আসবে যখন পতাকা উত্তোলিত হবে এবং এর বাণী সমুন্নত হবে এবং এমনটা যদি কেবল শেষ জমানায় মাহদি ও মাসিহ'র সময়ও ঘটে তবুও যথেষ্ট।

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, পৃথিবীতে অচলাবস্থা ও বন্ধ্যাত্ব এসেছে, যা অতিক্রান্ত হয়েছে আন্দোলন ও সংস্কার দ্বারা। উদাহরণ হিসেবে, এটা উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, অষ্টম শতকে ঐসব বিদ্বান ও সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন বাগদাদে খিলাফত

পতনের পর। সপ্তম শতকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, যার পরে উদাহরণ হিসেবে ইবন দাকীক আল-ঈদ ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিইয়াহ এবং তার শিষ্য ইবন আল-কাইয়্যিম এবং সিরিয়ায় তার অবশিষ্ট ছাত্ররা এসেছিলেন; এমনি আন্দালুসে আল-শাতিবী এবং মাগরিব ও মিসরে ইবন খালদুন এবং অন্যরা যাদের ওপর ইবনহাজার তার গ্রন্থ দুরার আল-কামিনাহ ফি আ'ইয়ান আল-মি'আত আল-সামিনাহ'র মধ্যে জৈবনিক বর্ণনা দিয়েছেন।

এর পরের যুগে উদাহরণস্বরূপ আমরা খোদ ইবন হাজার এবং মিসরে আল-সুয়ূতী, ইয়েমেনে ইবন ওয়াযির, ভারতে আল-দেহলাভী, ইয়েমেনে আল-শাওকানী ও আল-সানাঈ, নাজদে ইবন আবদুল ওয়াহহাবকে এবং ইজতিহাদে উচ্চ মানের আলেম এবং সংস্কারকদের নেতাদের দেখতে পাই। এটা সে বিষয়ে যা ইবন হিব্বান তার সহিহ গ্রন্থে পর্যবেক্ষণহেতু উচ্চারণ করেছেন। তা এই যে, আনাসের হাদিস তার জমানায় সাধারণ লোকদের জন্য ছিল না এবং তার যুক্তিকে স্থাপন করেছেন মাহদী সংক্রান্ত পূর্বে উল্লিখিত হাদিসে 'কিভাবে তিনি অবিচারে পরিপূর্ণ পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দ্বারা পূর্ণ করবেন[৩৭]।

গ). ভারসাম্যমূলক বিশ্লেষণ

ভারসাম্য রক্ষার্থে আল-ফাতহ গ্রন্থে ইবন হাজার প্রদত্ত হাদিসটিকে অনুকূল বিবেচনা করি।

এমন সম্ভাবনা আছে যে, বর্ণনায় আনীত ঐ সময় হচ্ছে সাহাবিদের যুগ। এই ভিত্তিতে যে, তারা ঐ হাদিসে সম্বোধিত। তাদের পরবর্তীগণ জন্য।

বর্ণিত বক্তব্যে উদ্দিষ্ট ছিলেন না। যাই হোক, সাহাবি [অর্থাৎ আনাস] বুঝেছিলেন তাদের সাধারণত্বসহ শব্দসমূহকে। সুতরাং ঐ কারণের জন্য তিনি জবাব দিয়েছিলেন তাদেরকে, যারা হাজ্জাজের ব্যাপারে তার কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তারা বা তাদের বৃহত্তর অংশ ছিলেন তাবিঈগণ [উত্তরাধিকারী সাহাবিগণের পরবর্তী প্রজন্ম][৩৮]।

হাদিসটিতে যে বিশেষ দাবি রয়েছে তা হচ্ছে : অবিচারের সামনে নীরবতার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারের সামনে ধৈর্য, ভুলকাজ ও বিশৃঙ্খলার সময় সন্তুষ্টির আহ্বান এবং পৃথিবীতে স্বৈরাচারীদের উৎপীড়নের মুখে ঋনাত্মক মনোভাব। বেশকিছু যুক্তি দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম : ধৈর্য ধারণ করো! এর বক্তা ছিলেন আনাস। সুতরাং হাদিসটি মারফূ নয়। তিনি তা-ই উল্লেখ করেছেন, যা নবি সা.-এর কাছ থেকে তিনি বুঝেছেন এবং পাপমুক্ত ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে একজন মুসলিম স্বাধীন।

দ্বিতীয় : আনাস অবিচার ও বিশৃঙ্খলার সামনে লোকদেরকে হৃষ্টচিত্ত থাকার নির্দেশ দেননি, তাদেরকে কেবল ধৈর্য ধারণের জন্য বলেছেন - এবং এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বিরাট। অবিশ্বাসের সম্মুখে প্রশান্তি নিজেরই অবিশ্বাস এবং অসৎ কাজের সামনে অসৎকাজই। ধৈর্যের ক্ষেত্রে এটা সর্বদাই অপরিহার্য; একজন এক বিষয়ে ধৈর্যশীল যাতে সে অনিচ্ছুক, যখন সে তা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে।

তৃতীয় : অবিচার ও স্বৈরাচার প্রতিহত করার সাধ্য যার নেই, তার ধৈর্যকে আশ্রয় করা ও দীর্ঘ ভোগান্তি ছাড়া কোনো পথ নেই। একই সাথে সে অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা করবে, পরিবর্তনের জন্য এবং উপায় ও সুযোগ নেওয়ার জন্য, ঐসব লোকের সাহায্য গ্রহণের চেষ্টাও করবে যারা এই অবস্থার ভাগীদার। সে অবশ্যই অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে, যাতে সে সত্যের শক্তি দিয়ে মিথ্যার শক্তিকে এবং ন্যায়ের সাহায্যকারীদের সহযোগিতায় অন্যায়ের সহযোগীদের প্রতিরোধ করতে পারে। এটা নিশ্চিত যে, নবি সা. তের বছর ধরে মক্কায় মূর্তি ও এর উপাসকদের বিরুদ্ধে ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি ঐ সময় মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করেছেন এবং কাবার তাওয়াফ করেছেন, যখন এর মধ্যে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল। হিজরতের সপ্তম বছরে উমরাতুল কাযা আদায়কালে তিনি ও সাহাবিগণ এর তাওয়াফ করেন; তিনি মূর্তিগুলোকে দেখেছেন, কিন্তু মহাবিজয়ের দিনের সঠিক সময়ের পূর্বে ওগুলো স্পর্শ করেননি। যেটা ছিল মক্কাবিজয় সেদিনই তিনি ওগুলো ধ্বংস করেন।

এ কারণেই আমাদের মনীষীগণ শর্ত রেখেছেন, যদি একটি ভুলকে নির্মূল করতে গিয়ে ব্যাপকতর ভুলের জন্ম হয়, সেক্ষেত্রে সময় না আসা পর্যন্ত মানুষের কর্তব্য হবে নীরবতা অবলম্বন করা। তাই ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য নির্দেশকে অন্যায় ও অত্যাচারের কাছে নিখাদ আত্মসমর্পণ বুঝাবে না। বরং আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা না আসা পর্যন্ত নিবিড়ভাবে অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করাই এর অর্থ এবং তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম বিচারক।

চতুর্থ : ধৈর্য কাউকে সত্যকথন থেকে বিরত থাকতে বলে না এবং প্রভু বা স্রষ্টার মতো আচরণকারী স্বৈরাচারীর সম্মুখে হক অনুসরণ ও নাহক প্রত্যাখ্যানও নিষেধ করে না। তথাপি এমনটা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয় যে, তার জন্য, তার পরিবারের জন্য বা তার চারপাশের লোকদের জন্য সে ভীতি অনুভব করে। একটি হাদিসে এটা এসেছে :

অত্যাচারী শাসকদের সামনে সত্য উচ্চারণ সর্বোত্তম জিহাদ[৩৯]।

এবং আরেকটি হাদিসে এসেছে : শহিদগণের নেতা হচ্ছেন হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়ায়, তারপর যা সঠিক তা করতে তাকে হুকুম করে এবং নিষেধ করে যা অন্যায়, তা করতে এবং তাকে হত্যা করে[৪০]।

টীকা

০১. আল-শাওকানি ইরশাদ আল-ফুহূল (কায়রো : মুস্তাফা আল-হালাবি), পৃষ্ঠা ৩৩।

০২. প্রাগুক্ত। তিনি এটা ইয়াহ্ইয়া ইবন আবি কাসিরের প্রতি আরোপ করেছেন। ইবন আব্দুল বার উদ্ধৃত করেন জামি'বায়ান আল-'ইলম ওয়া ফাজলি-হি গ্রন্থে (বৈরুত : আল-মুসাববিরাহ 'আন আল-মুনিরিইয়্যাহ), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯২।

০৩. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা ১৯১-৯২

০৪. ইরশাদ আল-ফুহূল, পৃষ্ঠা ৩৩

০৫. ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা (সম্পাদনা-'আলী'আবদ আল-ওয়াহিদ ওয়াফী; বৈরুত : লাজনাত আল-বায়ান আল-'আরাবি, ২য় সংস্করণ) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৪৩-৪৫।

০৬. অর্থাৎ, তারা কেবল মতামতের ভিত্তিতে সহিহ ও সারিহ হাদিসের মধ্যে বিরোধ করছে না, নিজেদের রায় দ্বারা তাদের প্রভুর প্রত্যাদেশের বিরোধিতা করছে। অবশ্য, এটা ব্যাখ্যা ও প্রমাণ চেয়ে প্রশ্ন করাকে নিষেধ করে না, যাতে বিষয়াদি স্পষ্ট হয় এবং তারা সন্তুষ্ট হয়।

০৭. আল-সুয়ূতী, মিফতাহ আল-জান্নাত, পৃষ্ঠা ৪৯ - ৫০।

০৮. দেখুন ইবন হাজার, আল-দিরায়াহ্ ফি আল-হিদায়াহ (সম্পাদনা : হাশিম আল-ইয়ামানি), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২০৫-১৩।

০৯. দেখুন মা'রিফাত আল-সুনান ওয়া আল-আসার'র মুকাদ্দিমাহ আল-সাইয়িদ আহমদ সাক-এর সমালোচনামূলক সংস্করণে (কায়রো : আল-মাজলিস আল-আ'লা লি আল-শু'উন আল-ইসলামিইয়াহ)।

১০. দেখুন এই হাদিসের ওপর আমাদের প্রবন্ধ আল-সাহওয়াত আল-ইসলামিইয়াহ বাইনা আল-ইখতিলাফ আল-মাশরূ'ওয়া আল-তাফাররুক আল-মাযমূম, এই শিরোনামে : আল-ইখতিলাফ রাহমাহ্। এই হাদিসটি প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু এর অর্থ বিশুদ্ধ (সহিহ) যদি এটা বিশদ বুঝার ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে, যদি না বিরোধ ও আপত্তি সৃষ্টি করে ঐভাবে ব্যতীত যেভাবে ফিকহ'র বিষয়ে সাহাবিগণ মতপার্থক্য করেছেন।

১১. দেখুন অধ্যায় দিয়্যাত আহল আল-যিম্মাহ আল-শাওকানীর নায়ল আল-আওতার এর ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১-২৪ এ।

১২. দেখুন দিয়াগত আল-মার'আহ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৪-২৭।

১৩. যেহেতু তিনি কাজটি শেষ করেছেন, এটা তিন খণ্ডে বের হয়েছে।

১৪. কারণ এটি'আলী ইবন ইয়াজিদ আল-আলবানি হতে বর্ণনা। আল-বুখারি তাকে মুনকার (অর্থাৎ, এমন দুর্বল রাবি যিনি এমন হাদিস বর্ণনা করেন যা নির্ভরযোগ্য রাবিদের বর্ণিত

হাদিসের বিরোধী) বলে অভিহিত করেছেন। আল-নাসায়ি বলেন : তিনি বিশ্বাসযোগ্য নন। আল-দারাকুতনি বলেন : তিনি প্রত্যাখ্যাত যখন তিনি বর্ণনা করেন আল-কাসিম আবু 'আবদ আল-রাহমান হতে। আহমাদ ইবন হাম্বল তার সম্বন্ধে বলেন : আলী ইবন ইয়াজিদ তার কাছ থেকে [আল-কাসিম] অদ্ভুত [জিনিস] বর্ণনা করে থাকেন! ইবন হিব্বান বলেন : তিনি মু'দিল্লাত [এমন হাদিস যার সনদ দুই বা ততোধিক স্থানে বিচ্ছিন্ন] সাহাবি হতে বর্ণনা করেন এবং বিশ্বাসযোগ্য [রাবিদের] কাছ হতে আনেন মাকলুবাত [এমন হাদিস যার ইসনাদ ও মাতন মিশে গেছে]।

১৫. কাতারের সেন্টার ফর রিসার্চ ইন দ্য সুন্নাহ্ এন্ড সিরাহ হতে প্রকাশিত। এটা পরে আল-মাকতাব আল-ইসলামী, বৈরুত কর্তৃক মুদ্রিত হয় এবং কায়রোতে আল-দার আল-ইসলামিয়্যাহ লি-ল-তাওজি হতে পরিমার্জন, উৎস-বিচার এবং টীকাটিপ্পনীর সম্পূরকসহ।

১৬. আল-ফাত্ওয়া আল-শারি'আহ (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ), পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ (উদ্ধৃত মূলপাঠকে সংক্ষেপিত করা হয়েছে)।

১৭. আল-মুসতাদরাক, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৯০।

১৮. যদি আমরা আল্লাহর রসুল সা. হতে সম্পৃক্ত করি হালাল ও হারাম বিষয়ক সুন্নাহ্ ও বিধানাদি, তাহলে আমরা ইসনাদ সম্বন্ধে কঠোর এবং রাবিদের সমালোচনা করি। আর যদি আমরা রসুল সা., আমলের ফজিলত, পুরস্কার ও [পরকালে] শাস্তি, নির্দেশিত কার্যসমূহ এবং দোয়া সম্পর্কে আলোচনা করি, তাহলে সনদের ব্যাপারে নমনীয়তা দেখাই।

১৯. আল-খতিব, আল কিফায়া (আল-মাদিনাহ্ আল-মুনাওয়ারা; আল-মাকতাব আল-'ইলমিয়্যাহ), পৃষ্ঠা ১৩৪।

২০. ইবন রজব, শারহ্ 'ইলাল-আল-তিরমিজি (সম্পাদনা : নূর আল-দীন আল-'ইত্র) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭২-৭৪

২১. তাদরিব আল-রাবি'আলা তাকরীব আল-নাওয়াবি (সম্পাদনা : 'আবদ আল-ওয়াহহাব 'আবদ আল-লাতিফ; কায়রো : দার আল-হাদিস), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৭, ২৯৯।

২২. ইবন রজব, শারহ্'ইলাল আল-তিরমিজি, পৃষ্ঠা-৭৪

২৩. ইমাম মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন : বেশ, তাহলে, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে রহম করুন। তুমি অমিল ও উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন প্রসঙ্গ যে সাড়াদানের জন্য অনুরোধ করেছ তা আমাদের জন্য সহজ, কিন্তু আপত্তির বিষয় হলো : [১] যারা নিজেদেরকে হাদিস বিশেষজ্ঞের স্তর ও উপাধি দিয়েছে, তাদের অনেকের বদ-অভ্যাসে যা দেখেছি-[শিরোনাম] যা তা ধারণে, দুর্বল হাদিস ও বাতিল বর্ণনা পরিহার করা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য; [২] সহিহ ও মশহুর হাদিস পরিত্যাগের সীমা যা নির্ভরযোগ্য [রাবিগণ] কর্তৃক পৌছান হয়েছে, যারা সত্যবাদিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য সুপরিচিত

[৩] তাদের তাদের জানা ও প্রত্যায়ন করা যে, অমনোযোগী লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ গ্রহণের অযোগ্য এবং [৪] একদল লোক হতে [বর্ণনা] পৌছান যারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত নয়, যাদের কাছে হতে প্রাপ্তবর্ণনা (নেতৃস্থানীয় হাদিস বিশেষজ্ঞগণ বাতিল করেছেন ..., তবে যে বিষয়ে তোমাকে আমরা জানিয়েছি বাতিল বর্ণনাকারী লোকদের প্রচার সম্পর্কে অজানা ও দুর্বল রাবিদের দুর্বল ইসনাদের মাধ্যমে এবং এর সাথে তাদের বোমাবর্ষণ সাধারণ লোকদের ওপর যারা তাদের দোষত্রুটি জানে না-এটা তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে উত্তরদানে আমাদের হৃদয় আলোকিত করেছে।

২৪. আল-বা'ইছ আল-হাছীছ : শারহ ইখতিসার উলূম আল-হাদিস (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-ইলমিইয়াহ), পৃষ্ঠা ৯১-৯২ (এখানে উদ্ধৃত মূল পাঠ কিছুটা সংক্ষেপিত)।

২৫. ইবন সালাহ, আল-মুকাদ্দিমা এবং মাহাসিন আল-ইসতিলাহ (সম্পাদনকৃত 'আয়িশাহ 'আবদ আল-রাহমান; আল-হি'য়া আল-মিসরিইয়াহ আল-'আম্মাহ লি-ল-কিতাব), পৃষ্ঠা ২১৭।

২৬. হাদিসটি ইবন মাজাহ হতে, নম্বর ১৩৮৮। এর সনদে রয়েছে আবু বকর ইবন 'আবদ আল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী সিরাহ। আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইবন হিব্বান এবং আল-হাকিম ও ইবন আদি তাকে হাদিস জাল করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। এমন আরো তাহযিব আল-তাহযিব-এর মধ্যে (যেখানে তার সম্বন্ধে একই মূল্যায়ন)।

২৭. তিনি ওটা ইঙ্গিত করেন, তার মতে, এই হাদিসটি বর্ণনায় বিভিন্ন সূত্র সত্ত্বেও যঈফ। কিন্তু আল-আলবানি একে হাসান বলেছেন ইবন তাইমিইয়াহর আল-কালিম আল-তাইয়্যিব গ্রন্থের উৎস-বিচারে।

২৮. হাদিসের একটি অংশ-আল-হিলয়া গ্রন্থে ইবন 'উমার হতে আবু নু'আইম এটা বর্ণনা করেছেন। আল-'ইরাকি একে যঈফ বলেছেন। যেমনটা উদ্ধৃত হয়েছে ফয়েয আল-কাদির-এর মধ্যে, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯। এর ওপর ইবন তাইমিইয়াহর আলোচনা ইঙ্গিত দেয় যে, এটা সবল।

২৯. মাজমু'আ ফতোয়া শায়খ আল-ইসলাম (রিয়াদ), খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা - ৬৫-৬৭।

৩০. ইবন হাম্বল ও আল-হাকিম এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-যাহাবি এটাকে সহিহ বলে প্রত্যায়ন করেছেন।

৩১. দেখুন আল-মুনযিরি, আল-তারগিব (সম্পাদনা মুহাম্মাদ মুহঈ আল-দিন 'আবদ আল-হামিদ), হাদিস নম্বর ৪৫৭৬।

৩২. মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা বলেন : আমার হেফাজতে তিনটি বোমা ছিল। আমি ওর দুটো বিতরণ করেছি এবং সহিহ বুখারিতে আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন : আল্লাহর রসুল সা.-এর কাছ হতে আমি দুটো পাত্র পেয়েছিলাম। তারপর দুটোর একটির কথা বলতে গেলে আমি বিতরণ করেছি এবং অন্যটি সম্পর্কে বলতে গেলে, যদি আমি তা বিতরণ করতাম, তাহলে আমার বায়ুনালী কেটে ফেলা হতো।

৩৩. 'উরানিইউন ছিল একটি গোষ্ঠী যারা নবি সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল এবং ইসলাম কবুল করেছিল। তারা মদিনার আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদেরকে বলা হল, দান হিসেবে (সাদাকা) তাদেরকে প্রদত্ত উটগুলোর কাছে আসতে এবং তাদের দুধ পান করতে। তারা তাই করল এবং সুস্থবোধ করল। তারপর তারা ইসলাম হতে ফিরে গেল, উটের রাখালকে মেরে ফেলল এবং তাদের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর তিনি সা. তাদেরকে ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে ধরে আনা হলো এবং কঠিন ও ভীতিকর শাস্তি দেওয়া হলো, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয়। এই হাদিস সহিহদ্বয়ে এবং অন্যান্য সংকলনে রয়েছে (দেখুন ফাতহ আল-বারি, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা-৯৮)।

৩৪. যখন বি আল-বাতিল কোনোকিছুর আগমন ঘটে তখন আবতালা শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং আল-বাতালাহ শব্দটি বসে জাদুবিদ্যা ও শয়তানের স্থলে। মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে আবু উমামাহ'র হাদিস হতে : আল-বাকারা তিলাওয়াত করো। বাস্তবিকপক্ষে, এটা গ্রহণ করা আর্শীবাদ এবং পরিত্যাগ করা হীনতা এবং এর দ্বারা জাদুবিদ্যা অকার্যকর হয় [অর্থাৎ আল-বাকারা তিলাওয়াত জাদুর প্রভাব হতে বাঁচায়]। মুসলিম এটা তার সহিহ-তে বর্ণনা করেছেন।

৩৫. এভাবেই এটা মূল পাঠে রয়েছে। সম্ভবত এটা আল-ইবাহিয়্যাহ পাঠ করা উচিত ছিল (অর্থ 'অনুমতি')। ওটা নিশ্চয়ই যা বলা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য।

৩৬. দুই শায়খ এটা বের করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আল-তিরমিজি এবং আল-নাসায়িও আল-মুনিরাহ ইবন শু'বা হতে।

৩৭. ফাত্‌হ আল-বারি (কায়রো : আল-হালাবি), খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা-২২৭।

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. ইবন মাজাহ এটা বর্ণনা করেছেন, এভাবে আল-হুমায়দি এবং আল-হাকিমও আবু সাঈদ হতে। আল-শুআব মধ্যে আহমদ ইবন হাম্বল, ইবন মাজাহ, আল-তাবারানি এবং আল-বায়হাকি বর্ণনা করেছেন আবু উমামাহ হতে; ইবন হাম্বল ও আল-নাসায়ি এবং আল-বায়হাকি তারিক ইবন শিহাব হতে আল-শুআব গ্রন্থে। আল-হাকিমও এটি বর্ণনা করেছেন 'উমার ইবন কাতাদাহ হতে এবং অন্যরা। দেখুন সহিহ আল-জামি আল-সাগির এবং এর সম্পূরক গ্রন্থ, নম্বর ১১০০।

৪০. আল-হাকিম এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-দাইয়া জাবির হতে। আল-আলবানি সহিহ আল-জামি আল-সগির গ্রন্থে এটাকে হাসান বলেছেন, নম্বর ৩৫৭৫।

তৃতীয় অধ্যায়

সঠিকভাবে সুন্নাহ্ উপলব্ধির নীতিমালা

১. কুরআনের আলোকে উপলব্ধি

বিকৃতি, বিচ্যুতি ও নিকৃষ্ট ব্যাখ্যা থেকে নিরাপদ রেখে সুন্নাহ্‌কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই একে কুরআনের আলোকে এবং এর স্বর্গীয় নির্দেশাবলীর কাঠামোর মধ্যে বুঝতে হবে। যে ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ আমাদেরকে তথ্য প্রদান করে, কুরআন সেক্ষেত্রে এর সত্যতার সিদ্ধান্ত দেয় এবং যেখানে এ নির্দেশ দেয়, সেখানে কুরআন এর ন্যায়ানুগতা নিশ্চিত করে :

> সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাণী পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (সুরা আন'আম, ৬ : ১১৫)।

আমরা কুরআনকে ইসলাম নামক দেহের আত্মা বিবেচনা করতে পারি; এর দালানের ভিত মনে করতে পারি এবং এর সাংবিধানিক নীতিমালার সম্পদ ভাবতে পারি, যার প্রতি ইসলামের সকল বিধিবিধান উৎকীর্ণ করা হয়, এসবের পিতামাতা ও নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে।

রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ হচ্ছে এই সংবিধানের ভাষ্য, এর প্রকাশ্যতা, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তবে প্রয়োগ উভয় রূপে। তাঁর প্রতি যা প্রেরণ করা হয় তা লোকদের কাছে স্পষ্ট করা ছিল তাঁর সা. কর্তব্য। যেহেতু শাখা মূলের বিরুদ্ধে শাখা কাজ করে না, সুতরাং ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যাত বিষয়ের বিরোধী হয় না। সুন্নাহ্ সর্বদা কিতাবের দিগন্তের মধ্যে চলাচল করে, কখনও একে লঙ্ঘন করে না। সেজন্যই সহিহ্ হাদিস ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্‌কে কুরআনের নির্দেশমালার বিরোধী হতে দেখা যায় না। যদি লোকেরা মনে করে যে, এমন বিরোধিতা/পার্থক্য রয়েছে, তাহলে ওটা এমন সুন্নাহ্ যা সহিহ্ নয়, অথবা যার বুঝ সহিহ্ নয় অথবা এমন হতে পারে যে, পার্থক্য সত্য নয়, কিন্তু কিছুটা অনুমিত।

কুরআনের আলোকে সুন্নাহ্ বুঝার প্রথম অর্থ হচ্ছে কুরআনের বিরোধিতাকারী হাদিসসমূহ বাতিল হওয়া। উদাহরণস্বরূপ :

অভিযুক্ত গারানিক (লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট লোক) সম্পর্কিত হাদিস সন্দেহাতীতভাবে প্রত্যাখ্যাত, কারণ এটি কুরআনের বিরোধী। কেউ কল্পনা করতে পারে না কিভাবে এটি এ প্রসঙ্গে এসেছে, যেখানে কুরআন প্রবলভাবে মিথ্যা দেবীদেরকে সমালোচনা করে, যেখানে এতে বলা হয়েছে :

> তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? আর তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? কী! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান, আর আল্লাহ তায়ালার জন্য কন্যা সন্তান? তাহলে এটাতো খুবই অসঙ্গত ভাগ বাটোয়ারা। এগুলো তো কেবল কতকগুলো নাম, যে নাম তোমরা আর তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা রেখেছ, এর পক্ষে আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে (সুরা নাজম, ৫৩ : ১৯ - ২৩)।

এই প্রত্যাখ্যান এবং দূরে চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, কেউ কি যুক্তি দেখাতে পারে যে, তাদের প্রতি মহানত্ব আরোপকারী শব্দসমূহ- অভিযুক্ত শব্দ-ওইসব গারানিক-প্রকৃতই তাদের প্রত্যাশিত হতে পারে?

একইভাবে, স্ত্রীলোক সম্পর্কিত হাদিসটি-তাদের সাথে পরামর্শ করো এবং অতঃপর তাদের বিরোধিতা করো-অসিদ্ধ ও মিথ্যা, এজন্য যে এটি মাতাপিতা এবং তাদের সন্তানের পরিচর্যা ব্যবস্থা সম্পর্কিত আয়াতের বিরোধী :

> ...অতঃপর যদি উভয়ের সম্মতিক্রমে [একজন দুধ মা নিযুক্ত করে] স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাতে ইচ্ছা করো, তবে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই (সুরা বাকারা, ২ : ২৩৩)।

কুরআনের আলোকে যা হয়, তাকে অগ্রাধিকার প্রদান

'কুরআনের আলোকে সুন্নাহ্‌কে বুঝা' দ্বারা এও বুঝায়, যদি আইনবিদ বা ভাষ্যকারগণ সুন্নাহ্ থেকে উদ্ধৃত বিষয়ে মতপার্থক্য করেন, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আনুকূল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন তিনিই যাকে কুরআন সমর্থন করে। আয়াতটি বিবেচনা করুন :

> এবং তিনি (আল্লাহ তায়ালা) যিনি লতাগুল্মবিশিষ্ট আর লতাবিশিষ্ট নয় এমন উদ্যানরাজি, খেজুরগাছ ও বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, একই ধরনের ও আলাদা ধরনের জয়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন। যখন ফল ধরে তখন ফল খাও, আর ফসল তোলার দিন হক আদায় করো... (সুরা আন'আম, ৬ : ১৪২)।

এখন এই আয়াত, যাতে সাধারণ ভাষায় বর্ণনা এসেছে এবং যা বিশদ করা হয়েছে, কোনো কিছু যা পৃথিবীতে উৎপাদিত হয় ও বৃদ্ধি পায় তার বর্ণনা বাদ দেয়নি। কারণ প্রত্যেক বর্ধনশীল জিনিস যা এর দ্বারা নির্দেশিত তা যথার্থ এবং এ আয়াতে

যথার্থ জিনিস উৎপাদনের নির্দেশ রয়েছে। এখানে যথার্থতার নির্দেশ সাধারণ, এটা তাই যা কুরআন ও সুন্নাহ্ পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত করেছে জাকাতের (দরিদ্রদের প্রাপ্য কর) প্রকরণের ক্ষেত্রে।

এ সত্ত্বেও, আমরা ফকিহদের মধ্যে তাদেরকে দেখি যারা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ভূপৃষ্টে উৎপাদিত বস্তুর জাকাতের বাধ্যবাধকতা নিষিদ্ধ করেছেন। তারা এটিকে (১) চার প্রকারের ফসল ও খেজুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন; অথবা (২) সীমাবদ্ধ করেছেন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত বস্তুর মধ্যে, যেখানে মানুষের (খাবার হিসেবে গ্রহণ করার) জন্য পছন্দের সুযোগ রয়েছে, অন্যভাবে নয়; অথবা (৩) এমন কিছু উৎপাদন করা যা শুকানো যায়, মাপা যায় এবং জমা করা যায়। অন্যান্য ফল এবং শাকসবজিকেও তারা বাধ্যবাধকতার বাইরে রেখেছেন – কফি ও চা বাগান করা, আপেল ও আমের বাগান, তুলা, ইক্ষু এবং এমন ধরনের মাঠ, এমন সবকিছু যা থেকে মালিকদের কাছে প্রচুর পরিমাণ সম্পদের প্রবাহ আসে। এটা এতদূর যাতে, যখন কিছু এশীয় এলাকা ভ্রমণ করেছি, আমি শুনেছি যে, কম্যুনিস্টগণ বলে : ইসলামি ফিকহ বা ইসলামী আইন তখন জাকাতের বোঝা ক্ষুদ্র চাষীদের ওপর (সম্ভবত জমির জন্য নিযুক্ত শ্রমিক, মালিক নয়) চাপায়-যারা ওট, গম, বার্লি এবং সুগন্ধি কাঠ উৎপাদন করে; অথচ নারকেল, চা, রাবার এবং এ ধরনের বড় আবাদের চাষীদের/মালিকদের জাকাত প্রদান থেকে ছাড় দেয়।

আমি মালিকী মজহাবের নেতৃস্থানীয় আবু বকর ইবন আল-আরাবি কর্তৃক এই বিষয়ের আলোচনাকে সম্মান জানাই। তিনি তার গ্রন্থ আহকাম আল-কুরআন'র মধ্যে এই আয়াতের ওপর মন্তব্য করেছেন এবং তিনজন ফকিহ্'র মতবাদ স্পষ্ট করেন - মালিক, শাফিঈ এবং ইবন হাম্বল- জমিতে উৎপাদিত কোন ফসলের উপর জাকাত বাধ্যতামূলক এবং কোনটির উপর নয়, সে সম্পর্কে। ঐসব মতবাদের মধ্যে মালিকের মতবাদ তার নিজস্ব, কিন্তু (এমনটা ছিল তার উদ্দেশ্য ও জ্ঞানের গভীরতা) তিনি তিনটি ঘরানার মতবাদকেই সামগ্রিকভাবে দুর্বল বলে ঘোষণা করেছেন। এরপর তিনি বলেন :

> আবু হানীফার কথা বলতে গেলে, তিনি আয়াতটিকে তার আয়না করেছেন [অর্থাৎ এর ওপর নিবিড় চিন্তাভাবনা ঘটিয়েছেন], তারপর সত্যকে বিচার করেছেন। তিনি জাকাতকে ফরজ করেছেন ভক্ষণযোগ্য ফসলের ওপর, তা পুষ্টিকর হোক বা অন্যকিছু। রসুল সা. তার অমিয় বাণী সাধারণ ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন : যাতে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয় [অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে যা উৎপাদিত হয়] তার এক দশমাংশ ('উশর)।

আহমদ ইবন হাম্বলের মতামতের ব্যাপার এই যে, জাকাতের দায় হচ্ছে তাই, যা পরিমাপযোগ্য। তার বক্তব্য অনুযায়ী, পাঁচ উকিয়ার কমে কোনো দায় নেই, এটা যঈফ। কারণ এই যে, বাহ্যিকভাবে যা এই হাদিসকে প্রভাবিত করে তা হচ্ছে : নিসাব [যার প্রান্তিক মূল্য কম হলে জাকাতের দায় থাকে না] ফল ও ফসলের ক্ষেত্রে। তারপর [ফল বা ফসলের] প্রকৃত হক থেকে সরে আসার বেলায় এই বক্তব্যের উপযোগীতা থাকে না [এটা এ হাদিসের শব্দ দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা যায় না]। পুষ্টিকরতার দিক থেকে বিবেচনা করলে (যেটা শাফেঈদের অবস্থান) এটা কেবলই একটা দাবি, একটা আইডিয়া বা ভাবধারা যার কোনো এমন উৎস নেই যেদিকে ইঙ্গিত করা যায়। এই ভাবধারা কোনো মূলপাঠ বা নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি এবং ভাবধারাসমূহ, যে সম্পর্কে আমরা কিয়াস সম্পর্কিত পুস্তকে ব্যাখ্যা দিয়েছি, কেবল এসবের উৎস অনুযায়ী নির্দেশনার জন্য প্রযোজ্য।

অতঃপর কিভাবে আল্লাহ তায়ালা পুষ্টিকর ফল ও খাদ্যের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের জন্য দায়যুক্ত করেছেন, যাদের শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে আঙ্গুর ও খেজুরবীথির মধ্যে, যেগুলো সবই চাষের উৎপন্ন [ফসল] এবং যেসবের পুষ্টিগুণ আলোকদানের সাথে সংযুক্ত, যার দ্বারা চোখের আনন্দ উপভোগ হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। তাহলে জমিনের ওপরের এই পরিপূর্ণতা অর্জন কি জমিনের নিচের অন্ধকারে আনুকূল্যলাভ?

এরপর ইবন আল-আরাবি বলেন :

এখন যদি এমনটা বলা হয় : কেন নবি সা. থেকে এমনটা বলা হয়নি যে, তিনি মদিনা ও খায়বারে শাকসবজি হতে জাকাত নিয়েছেন? লোকদের বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে, আমাদের কাছে কোনো হাদিস পৌঁছেনি, যার দ্বারা শাকসবজির ওপর জাকাতের আমলকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

[এর জবাবে] আমরা বলি : ঠিক এমনটিই যার ওপরে আমাদের আলেমগণ নির্ভর করেছেন। এটি [শাক সবজির ওপর জাকাত না নেওয়া] প্রমাণের অনুপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল, এটি প্রমাণের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই বিরোধিতা এমন কোনো সত্যতার ওপর নির্ভরশীল নয় যা শাকসবজির ওপর জাকাত আদায়কে না বলে। যদি এটি বলা হয় : যদি সে জাকাত আদায় করে, তাহলে কি এটা জানাজানি হবে না যে, সে এমনটা করেছে? আমরা বলি : নবি সা.-এর আমল হিসেবে এটি জানাজানির কি প্রয়োজন, যখন কুরআনই এ ব্যাপারে যথেষ্ট[২]।

নবি সা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে : শাকসবজির ওপর কোনো সদকাহ নেই। কিন্তু এটির ইসনাদ দুর্বল এবং কেউই কোনো আইনী যুক্তিতে এমন ধরনের

হাদিস দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করতে পারে না। সাধারণ করা হয়েছে, যা কুরআনে এবং সুপরিচিত হাদিসের সাহায্যে সেটাকে সুনির্দিষ্টকরণের একক ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারে না। আল-তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন : এই হাদিসের ইসনাদ সহিহ নয় এবং [এই বিষয়ে হাদিস] এমন কিছু নয় যা নবি সা. থেকে প্রত্যায়িত করা যেতে পারে[৩]।

হাদিস : জীবিত ব্যক্তিকে দাফনকারী ও দাফনকৃত ব্যক্তি [উভয়েই] জাহান্নামি।

মুসলিম ব্যক্তি অবশ্যই এমন হাদিস থেকে বিরত থাকবে যা সে কুরআনের কোনো নির্দেশের বিরোধী দেখবে, যতক্ষণ না এটিকে সহজে গ্রহণ করার মতো ব্যাখ্যা পাচ্ছে। তাই আমি বিরত থেকেছি ঐ হাদিস থেকে যা আবু দাউদ এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন : জীবিত দাফনকারী এবং দাফনকৃত [উভয়েই] জাহান্নামি[৪]। আমি যখন এই হাদিস পাঠ করি তখন অন্তরে নিরানন্দ অনুভব করি। আমি বিস্মিত হয়েছি যদি হাদিসটি দুর্বল হতো। আবু দাউদ তার সুনানে যা বর্ণনা করেছেন তার সবই সহিহ নয়। কিন্তু আমি একটি মূল গ্রন্থে এটি সহিহ হওয়ার পক্ষে কিছু পেয়েছি। যারা এটিকে এমন বলে প্রত্যায়িত করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : শাইখ আল-আলবানি (সহিহ আল-জামি আল-সাগির) এবং আবী দাউদ।

এর পক্ষে যুক্তিসমূহের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে : জীবিত দাফনকারী এবং দাফনকৃত উভয়েই জাহান্নামি-এমনটা ছাড়া যদি দাফনকারী জীবিত ব্যক্তি ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করে[৫]। এর অর্থ এই যে, জীবিত দাফনকারী ব্যক্তির জন্য আগুন থেকে বাঁচার কিছু সুযোগ রয়েছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যে ব্যক্তিকে জীবিত দাফন করা হয়েছে জন্য কোনো সুযোগ নেই!

আমি এখানে এ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছি - যেমনটা নবি সা.-এর কাছে থেকে শোনার পর সাহাবিগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন : যদি দুজন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে হন্তা ও নিহত উভয়েই জাহান্নামি। তাঁরা বললেন, এই হন্তা [আমরা বুঝি যার কী পরিণাম], কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন [সেও কেন জাহান্নামে যাবে?] তিনি সা. বললেন, প্রকৃতপক্ষে সেও [নিহত ব্যক্তি] তার সাথীকে হত্যা করেছিল। এভাবে তিনি সা. তাদের জন্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন নিহত ব্যক্তির জাহান্নামি হওয়া সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে - যেমন, তার মনের ইচ্ছা, তার সাথীকে হত্যা করার ক্ষেত্রে তার মনের ইচ্ছা ।

একইভাবে, এখন জিজ্ঞেস করি : জীবিত সমাধিস্থকারী ব্যক্তির জাহান্নামি হওয়া আমি বুঝি। কিন্তু কেন ক্ষতিগ্রস্ত জীবন্ত সমাধিস্থ ব্যক্তিও জাহান্নামে যাবে? তার জাহান্নামি হওয়া এই আয়াতের বিরোধী-

এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কচি বালিকাকে প্রশ্ন করা হবে, কেন সে নিহত হয়েছিল (আত-তাকভির, ৮১ : ৮-৯)?

আমি এই হাদিস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য জানার জন্য তাফসিরকারগণ কি বলেছেন তা জানতে ফিরে গেছি, কিন্তু আমি এমন কিছু দেখিনি যা মন ও হৃদয়কে শান্ত করে।

হাদিস : বাস্তবিকপক্ষে তোমার পিতা ও আমার পিতা জাহান্নামে

আনাস থেকে মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস আরেকটি উদাহরণ : সত্যিই তোমার ও আমার পিতা জাহান্নামে[৬]। নবি সা. একজন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের জবাবে একথা বলেছিলেন, যে তার (প্রশ্নকর্তার) পিতা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিল : তিনি এখন কোথায় (এখন মৃত অবস্থায়)? অবাক হয়েছিলাম : আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মোত্তালিব কি পাপ করেছিলেন যে, তিনি জাহান্নামে থাকবেন? তিনি ছিলেন ফাতরাহ যুগের (ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেকার সময়) লোকদের একজন, যাদের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ বর্ণনা এমন যে তারা নিরাপদ।

আমার কাছে মনে হয়েছিল আমার পিতা শব্দ দুটি দ্বারা তিনি সা. হয়ত তাঁর চাচা আবু তালিবকে বুঝিয়েছেন, যিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁর ওপর নজর রেখেছেন এবং তাঁর সা. দাদার (আবদুল মোত্তালিব) মৃত্যুর পর তাঁকে লালন পালন করেছেন। আম্ম (চাচা) শব্দটি আবু (পিতা)র পরিবর্তে ব্যবহার খোদ কুরআনেই দেখা যায় :

আমরা আপনার প্রভু এবং আপনার পিতা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রভুর ইবাদত করি, তিনি একক ইলাহ এবং আমরা মুসলিম (তাঁর কাছে পুরোপুরি সমর্পিত) (সুরা বাকারা, ২ : ১৩৩)।

ইসমাঈল ছিলেন ইয়াকুবের চাচা, কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় 'পিতা'। আবু তালিবের জাহান্নামি হওয়ার ব্যাপারে কেউ অবাক হয় না, জীবনের শেষ মুহূর্তে তাওহিদের বাণী উচ্চারণে তার অস্বীকৃতির জন্য। কয়েকটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, শাস্তি ভোগকালে তিনি হবেন জাহান্নামের লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কম যন্ত্রণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তবে আমার মতে, এমন ধরনের ব্যাখ্যা দুর্বল, কারণ এটি মূল পাঠের ঠিক অব্যবহিত দিকের বিরোধী। এরপর আরেকটি দিক : প্রশ্নকারী ব্যক্তির পিতার কি পাপ ছিল? এ বিষয়ে বাহ্যিক ভাব যা আমরা জানি, তা হচ্ছে : এই ব্যক্তির পিতা ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। এসব বিষয় মাথায় রেখেই এ সম্পর্কে সংশয়মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ হাদিস থেকে বিরত থাকি।

আমার শিক্ষকদের একজন, শাইখ মুহাম্মদ গাজ্জালী, এই হাদিসটিকে স্পষ্টভাবে বাতিল করে দিয়েছেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন এটি তার সাথে বিরোধিতাপূর্ণ :

> রসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত তারা শাস্তি প্রাপ্ত হয় না (সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ১৫)।
>
> এর (অর্থাৎ কোনো নিদর্শন আসার) আগেই আমি যদি তাদেরকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে তারা বলত : হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের কাছে যদি একজন রসুল প্রেরণ করতে যাতে আমরা অবশ্যই তোমার নির্দেশ মেনে চলতাম অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার পূর্বেই (সুরা ত্বহা, ২০ : ১৩৪)।
>
> ...যাতে তোমরা বলতে না পার : আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আগমন করেনি, এখন তো তোমাদের কাছে একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসে গেছে (সুরা মায়েদা, ৫ : ১৯)।

মহাগ্রন্থে যেভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে, মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বে আরবরা কোনো সর্তককারী পায়নি :

> যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সর্তক করা হয়নি, কাজেই তারা উদাসীন (সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৬)।
>
> যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, সম্ভবত তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে (সুরা আস সাজদাহ, ৩২ : ৩)।
>
> আর আমি তোমার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি (সুরা সাবা, ৩৪ : ৪৪)।

যাই হোক, আমি সহিহ হাদিসের কারণেই এগুলো থেকে বিরত থাকা পছন্দ করি, এগুলো পুরোপুরি বাতিল না করে, ভয় এই যে তাদের এমন অর্থ হয়ত আছে যা এখনো আমার কাছে উন্মোচিত নয়। মহাসৌভাগ্যক্রমে আমি আল-নবভী বাদে অন্য ভাষ্যকারগণের সহিহ মুসলিম সম্পকিত বর্ণনায় ফিরে গিয়েছিলাম। আমি অতি বিদ্বান দুজন আলেমকে বোঝাচ্ছি, আল-আব্বী এবং আল-সানুসী। আমি এদের দুজনকেই এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা থেকে বিরত দেখেছি। এই হাদিসের ওপর আল-নবভী মন্তব্য করেছেন : তিনি তাঁর প্রকৃতিগত সৌন্দর্য অনুযায়ী

এটি বলেছেন, ঐ মানুষটির সান্ত্বনার জন্য, কষ্টের ভাগ হিসেবে [এমন পিতার জন্য যিনি ইমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেননি]। তারপর তিনি বলতে থাকেন : যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী হয়ে মারা যায়, সে জাহান্নামি এবং নিকটাত্মীয়দের আত্মীয়তা তার কোনো উপকারে আসে না। এর জবাবে আল-আব্বী বলেন : এই অবিমিশ্র বক্তব্যকে দেখা প্রয়োজন! আল-সুহাইলী বলেন : এটি বলা আমাদের জন্য নয়, কারণ তিনি সা. বলেন : মৃতদের কারণে জীবিতদের কষ্ট দিও না এবং

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি (সুরা আহজাব, ৩৩ : ৫৭)।
>
> নবি সা. ঐ লোকটির সান্ত্বনার জন্য এ কথা বলেছেন এবং এমনটা এসেছে যে, লোকটি বলেছিল : আপনি, আপনার পিতা কোথায়? সে সময় তিনি সা. তাকে ঐ কথা বলেছিলেন [অর্থাৎ প্রশ্নের বিশেষ ধরনের জবাবে]।

আল-নবভী বলেন : এবং এর মধ্যে [অন্তর্ভুক্ত] যে, ফাতরাহ'র সময়ে যে মারা গিয়েছে, যে সময় আরবরা প্রতিমা পূজায় [ব্যাপৃত] ছিল, সে জাহান্নামে এবং এটি দাওয়াত পৌঁছানোর পূর্বে শাস্তির দৃষ্টান্ত নয়। কারণ, ইবরাহীম আ. ও অন্যান্য নবির আ. দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছেছিল।

এর জবাবে আল-আব্বী বলেন :

এই বক্তব্যে কি বিরোধ রয়েছে ভেবে দেখুন। [সঠিক ইবাদত করার] দাওয়াত যাদের কাছে পৌঁছেছিল তারা নিশ্চয়ই ফাতরাহর অন্তর্ভুক্ত লোক নয়। ওটা জানা গেছে শ্রুত হাদিসের বর্ণনানুযায়ী। কারণ ফাতরাহর লোক হচ্ছে সেই সব সম্প্রদায় যারা রসুলদের মাঝখানে বিদ্যমান ছিল, আগেকার রসুলগণকে যাদের জন্য প্রেরণ করা হয়নি এবং যারা পরবর্তী রসুল সা.-এর সময় পর্যন্ত বাঁচেনি-যেমন বেদুঈন আরবগণ, যাদের কাছে ঈসা আ.-কে প্রেরণ করা হয়নি এবং তারা রসুল সা.-এর সময় পর্যন্ত বাঁচেনি। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফাতরাহ হচ্ছে দুই রসুল সা.-এর মাঝখানের সময়।

তবে আইনবেত্তাগণ ফাতরাহ শব্দটি কেবল ঈসা আ. এবং রসুল সা.-এর মাঝখানের সময় বুঝাতেই ব্যবহার করেছেন। আল-বুখারি সালমান রা.-এর সূত্রে বলেন যে এটা ছিল ছ'শ বছর।

যেহেতু সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যৌক্তিকতা (হুজ্জাহ) প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি নেই, তাই তারা শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়।

অতঃপর যদি এটি বলা হয় : ফাতরাহ'র কিছু লোকের শাস্তি সম্বন্ধে সঠিক হাদিস রয়েছে, এই হাদিসটির মতো, হাদিসটি আমি দেখেছি আমর ইবন লুহাইকে জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি (কুসবা-হু)[৭] হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতে[৮]। [উত্তরে] আমি বলি : আকীল ইবন আবু তালিব এর তিনটি উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রথম : ওগুলো [প্রশ্নাধীন হাদিসগুলো] একমাত্র বর্ণনা, ওগুলো [অনেকসূত্রে অনেক বর্ণনাকারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত] সুনির্দিষ্টতা সম্পন্ন হাদিসের বিপক্ষে যেতে পারে না।

দ্বিতীয় : ওদের [উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ] প্রতি শাস্তি নিষিদ্ধ, এর কারণ [যার জন্য তারা শাস্তিপ্রাপ্ত] আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

তৃতীয় : যারা কিছু ভুল পথে চালনার মাধ্যমে[৯] মার্জনীয়[১০] ছিল না এভাবে লোকদের [জীবনপদ্ধতি] পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করেছে, তাদের জন্য হাদিসের বর্ণিত শাস্তি।

কুরআনে বিরোধ রয়েছে, এমন দাবির ক্ষেত্রে সতর্কতা

এটা বাধ্যতামূলক যে, এখানে আমরা সতর্ক করি কুরআনের মধ্যে বিরোধিতা রয়েছে এমন দাবির বিস্তৃতির বিরুদ্ধে - এমন দাবির পক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তি ছাড়া।

মুতা'যিলাগণ এমন এক গোষ্ঠী যারা বাড়াবাড়ির যানে দুঃসাহসের সাথে আরোহণ করেছে। পরকালে রসুল সা., তাঁর ভ্রাতৃপ্রতীম রসুলগণ, ফেরেশতা ও বিশ্বাসীদের মধ্যেকার দ্বীনদার ব্যক্তিগণের সুপারিশের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত, বিস্তৃত পরিসরে পরিচিত সহিহ হাদিসকে তারা প্রত্যাখান করেছে।

এমন সুপারিশ হচ্ছে এক আল্লাহ তায়ালাতে বিশ্বাসীগণের পক্ষে, তাদের যারা ছিল অবাধ্য। হাদিসসমূহের ভাষ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপরিসীম দয়া ও অনুগ্রহে তাদের ক্ষমা করেন এবং তাদের সুপারিশে যারা সুপারিশের যোগ্য, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়, অথবা এতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে এক সময় বের হয়ে আসে এবং তারপর জান্নাতের দিকে অগ্রসর হয়।

এটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অতি দানশীলতা, তিনি বরকতময় ও মহীয়ান তাঁর বান্দাদের প্রতি। এ এমন দয়াদাক্ষিণ্য যা ন্যায়বিচারের উর্ধ্বে। এভাবে তিনি একটি ভালো কাজের প্রতিফল দশগুণ বা আরো বেশি, এমনকি সত্তরগুণ বৃদ্ধি করেন,

কিংবা তার চেয়েও বেশি। তিনি খারাপ কাজের প্রতিফল একাজের সমান দেন, কিংবা ক্ষমা করেন। তিনি পাপ কাজের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুমআর সালাত, রমজানের সিয়াম এবং এর রাত্রির ইবাদত, বিভিন্ন প্রকার দানখয়রাত, তীর্থযাত্রা - হজ্জ ও উমরাহ উভয়ই এবং তাঁর নাম উচ্চারণ ও স্মরণ, তাওহিদের কালিমা উচ্চারণ, তাঁর তাসবিহ্ ও প্রশংসা এবং অন্যান্য জিকর ও দু'আর ব্যবস্থা রেখে। এর সবই পাপের বোঝা হালকা করেদেয়। অধিকন্তু, একজন মুসলিম কোনো অসুবিধা বা কষ্ট, দুঃখ বা যাতনা অথবা অন্যায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে ভোগ করে না, এসব কাঁটার খোঁচা খাওয়ার মতো - কিন্তু এর সবই আল্লাহ তায়ালা তার পাপ ও ভুলের কাফ্ফারা করেন। এছাড়া বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহের অংশ এমন যে, তিনি মৃত ব্যক্তির পক্ষে ইমানদারের প্রার্থনার ব্যবস্থা রেখেছেন, তারা পরিবারের সদস্য হোক বা না হোক, এর সুফল কবরে শায়িত ব্যক্তির জন্য রয়েছে।

তারপর এটা কষ্টকল্পিত নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মধ্যে কাউকে পছন্দ করেন এবং কাউকে মনোনীত করেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাওহিদের কালেমাসহ মারা গেছে এমন লোকদের জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করে থাকেন। এটা তা-ই যা নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ হতে জানা যায় :

এসব লোক মুহাম্মদ সা.-এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদেরকে বলা হবে জাহান্নামের লোক[১১]।

সুপারিশক্রমে এসব লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের দেখে মনে হবে সা'আরির[১২] (আল-সা'আরির হচ্ছে শতমূলী গাছের মতো সবজি)।

আমার উম্মতের একজন লোকের সুপারিশে [লোকেরা] বনূ তামীম এর [সংখ্যার চেয়ে] অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে[১৩]।

শহিদগণ তাদের প্রত্যেকের পরিজনবর্গ থেকে সত্তরজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে[১৪]।

লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান হচ্ছে কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশপ্রাপ্ত, যে অন্তরের বিশুদ্ধতা থেকে উচ্চারণ করেছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (নাই কোনো ইলাহ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত)[১৫]।

প্রত্যেক নবির একটি দোয়া রয়েছে [যা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন]। তাই আমি ইচ্ছা করি, যদি আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় হয়, কিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের সুপারিশের জন্য দোয়া করব[১৬]।

প্রত্যেক নবি একটি প্রশ্ন করেছেন -অথবা, তিনি সা. বলেন : প্রত্যেক নবির একটি দোয়া রয়েছে - তিনি এর দ্বারা দোয়া করেন এবং জবাব প্রাপ্ত হন। সুতরাং পুনরুত্থান দিবসে আমি আমার উম্মাতের সুপারিশের জন্য দোয়া করব[১৭]।

শাইখাইন, আল-বুখারি ও মুসলিম-এ বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরীর হাদিস :

সুতরাং নবিগণ, ফেরেশতাগণ ও ইমানদারগণ সুপারিশ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন : আমার সুপারিশ অবশিষ্ট রয়েছে। তাই তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি উঠিয়ে নেবেন, অতঃপর অগ্নিদগ্ধ [অর্থাৎ তীব্র তাপদগ্ধ] লোকদের মুক্তি দেবেন; অতঃপর তাঁর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে তাদেরকে জান্নাতের সামনে হায়াতের নদীতে ছুঁড়ে দেওয়া হবে ...[১৮]।

প্রত্যেক নবির একটি করে দোয়া শোনা হয়েছে ও কবুল করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নবিই তাঁর দোয়া পেশ করতে ত্বরা করেছেন। কিন্তু আমি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মাতের জন্য দোয়া সংরক্ষণ করেছি - তারপর তা কবুল করা হবে - যদি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন - তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা অবস্থায় মারা গেছে[১৯]।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার প্রতিশ্রুত হুমকির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব, তাঁর দয়ার ওপরে ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য এবং শরিয়াহর ওপর যুক্তিকে (ওহির ওপরে যৌক্তিকতা) প্রাধান্য দেওয়ায় মুতাজিলাগণ এসব হাদিসকে প্রত্যাখান করেছে, এগুলোর সবলতা ও পূর্ণ স্পষ্টতাসহ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও। এসব হাদিস প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে তাদের সন্দেহ এই ধারণার ভিত্তিতে হয়েছিল যে, এগুলো কুরআনের বিরোধী, যা, তাদের দাবি অনুযায়ী, সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে। প্রকৃতপক্ষে যিনি কুরআন পাঠ করেন, তিনি এর মধ্যে সুপারিশের কোনো না বাচক চিহ্ন পান না এটা ছাড়া যে, অংশীবাদীগণ (মুশরিকূন) তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্য ধর্মের পথভ্রষ্ট অনুসারীদের ওপর ন্যস্ত করেছে। অংশীবাদীগণ দাবি করেছে, আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া বা আল্লাহ্ তায়ালা থাকা সত্ত্বেও যাদের কাছে তারা প্রার্থনা জানায় সেসব দেবতার ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহ্ তায়ালার সামনে তাদের জন্য সুপারিশ করার এবং তাদের প্রতি শাস্তি ফিরিয়ে দেওয়ার।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে তারা না তাদের ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে এবং তারা বলে, ওরা আল্লাহ্ তায়ালার সামনে সুপারিশকারী (সুরা ইউনুস, ১০ : ১৮)।

কিন্তু কুরআন এই সুপারিশের দাবিকে অসার ও মিথ্যা ঘোষণা করেছে এই নিশ্চয়তাসহ যে, তাদের খোদারা আল্লাহ তায়ালার কাছে থেকে তাদের জন্য কিছুই এনে দিতে পারবে না।

কুরআন বলে :

> তারা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? বলো- তারা কোনো কিছুর মালিক না হওয়া সত্ত্বেও, আর তারা না বুঝলেও? বলো-শাফাআত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে (সুরা যুমার, ৩৯ : ৪৩ - ৪৪)।

> এছাড়া : তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছে যাতে ওরা তাদের জন্য পৃষ্ঠপোষক হয়। কক্ষণো না, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে (সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৮১-৮২)।

কোনো সন্দেহ ছাড়া কুরআন এ ধারণা বাতিল করে যে, মিথ্যা উপাস্যদের সুপারিশের ক্ষমতা রয়েছে এবং অংশীবাদীদের জন্য সুপারিশকারী থাকবে যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে :

> তাদেরকে একদিন সম্পর্কে সতর্ক করা... যখন পাপীদের (যালিমীন) জন্য না কোনো বন্ধু থাকবে, না থাকবে অনুকূল কোনো সুপারিশকারী (সুরা মুমিন, ৪০ : ১৮)।

কুরআন বারংবার অংশীবাদের ক্ষেত্রে অন্যায় (জুলুম) এবং অংশীবাদীদের স্থলে অন্যায়কারী (জালিমীন) পরিভাষা ব্যবহার করেছে। অংশীবাদ নিঃসন্দেহে চরম অপরাধ। এর পাশাপাশি কুরআন কিছু সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে সুপারিশের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথম : এটা কেবল মহামহিম আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অনুমতির পরেই ঐ সুপারিশকারী দেওয়া হবে, যে সুপারিশ করতে পারে। সে যেই হোক না কেন, কারো এই ক্ষমতা নেই, যে কোনো বিষয়ে সে আল্লাহ তায়ালাকে বাধ্য করবে।

তিনি আয়াতুল কুরসিতে বলেন :

> কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে (সুরা বাকারা, ২ : ২৫৫)?

দ্বিতীয় : সুপারিশ হবে তাওহিদপন্থী লোকদের জন্য, আল্লাহ্ তায়ালার একত্বে বিশ্বাসীদের পক্ষে।

যেমনটা আল্লাহ তায়ালা তাঁর মালাইকা সম্পর্কে বলেন,

> ...তিনি যার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, তার ব্যাপারে ছাড়া তাঁরা কোনো সুপারিশ করে না (সুরা আম্বিয়া, ২১ : ২৮)।

মহাবিচার দিবসে মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে আয়াত-

> তখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজে আসবে না (সুরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ : ৪৮)।

মানুষ বোঝে, যারা সুপারিশকারীরা রয়েছেন, তাদের ছাড়া যাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং তারা ওরাই যারা বিশ্বাসের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

সুতরাং কুরআন সুপারিশকারীকে পুরাপুরি অস্বীকার করে না, এমন দাবিদাররা যেভাবে দাবি করে। বরং এটি সেই সুপারিশ অস্বীকার করে যা অংশীবাদী ও ভ্রান্তপথের অনুসারীরা বলে থাকে। এটি সেই সুপারিশ অস্বীকার করে যা হবে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে অত্যধিক কষ্ট ও বিশৃঙ্খলার, যারা ভয়াবহ অপরাধ করা সত্ত্বেও প্রত্যাশা লালন করে যে, তাদের সুপারিশকারী ও মধ্যস্থতাকারীগণ তাদের ওপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নেবে। এ ধারণার কারণেই পৃথিবীর রাজাবাদশাহ ও শাসকগণ দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে নির্যাতন ও অবিচার করে থাকে, পরকালের পরিণাম থেকে পরিত্রাণ পাবে এই আশায়।

এটা দুঃখজনক যে, আমাদের সময়ে ইসলাম সম্পর্কিত এমন বইপুস্তক পাওয়া যাচ্ছে, যা পরকালে সুপারিশ প্রত্যাখ্যানকারী মুতাজিলাদের পাশাপাশি চলছে এবং দাবি করছে যে, এই পৃথিবীতে লোকদের পরিচিত কারো পৃষ্ঠপোষকতায় এর ওপর রং চড়ান হয়েছে। সুতরাং তারা সহিহ, স্পষ্ট ও বিপুল সংখ্যক হাদিসকে দেওয়ালে ছুঁড়ে দিয়েছে, যেগুলো আমাদের জন্য সান্ত্বনা, এগুলো সম্বন্ধে অভিযোগ যে, তা কুরআনের বিরোধী[২০]।

২. এক বিষয়ে একত্রে প্রাসঙ্গিক হাদিস সংগ্রহ করা

সুন্নাহ্কে যথাযথভাবে বুঝার জন্য এটাও প্রয়োজন যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সহিহ হাদিসগুলো সংগ্রহ করতে হবে একত্রে এবং পাশাপাশি অবস্থানে রেখে - দ্ব্যর্থবোধকের পাশাপাশি স্পষ্টগুলো থাকবে, অকৃত্রিম থাকবে নিষিদ্ধের পাশে, সাধারণ থাকবে বিশেষায়িতের পাশাপাশি। এভাবে একটির সাথে অন্যটির ব্যাখ্যা দ্বারা তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থ সহজ ও পরিষ্কার করা যাবে। আমরা এগুলোর একটি

দিয়ে অন্যটিকে আঘাত করি না (অর্থাৎ আমরা এগুলোর মধ্যে সংঘাত বা একটির প্রতি অন্যটির সন্দেহ সৃষ্টি করি না)। যেহেতু এটি প্রতিষ্ঠিত ও সম্মত যে, সুন্নাহ্‌ কুরআনকে ব্যাখ্যা করে এবং এটিকে স্পষ্ট করে- অর্থাৎ এর (কুরআনের) মধ্যকার সাধারণ বিষয়কে বিশদ করে, অস্পষ্টতা স্পষ্ট করে, সার্বজনীনকে বিশেষায়িত করে এবং এর মধ্যকার নিরঙ্কুশকে নিষিদ্ধ করে- উত্তম দ্বারা উত্তম অনুসৃত এই সাধারণ নীতি সুন্নাহ্‌র মধ্যে সবচেয়ে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এর কিছু উপাদানকে অন্যকিছু উপাদানের দ্বারা যাচাই করে।

হাদিস : লম্বা ইজার পরিধান করা

উদাহরণ হিসেবে লম্বা ইজার (শরীরের নিম্নাংশের পোষাক) পরিধানের হাদিসটি দেখুন। এমন করার বিরুদ্ধে কঠিন সতর্কতা রয়েছে। অনেক ঈর্ষাকাতর যুবক ওটার ওপর বিশ্বাস রাখে যখন তারা কঠিনভাবে ভৎর্সনা করে তাদেরকে, যারা গোড়ালির ওপরে তাদের ইজার পরিধান করে না। তারা এর ওপর প্রচার চালায় এ উদ্দেশ্যে যে, পাজামা সংক্ষিপ্তকরণ ইসলামের প্রতীক বা এর মধ্যে মহত্তম কর্তব্য রয়েছে! যদি তারা কোনো মুসলিম আলেম বা প্রচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত যিনি ইজার [পাজামা/লুঙ্গি/প্যান্ট] ছোট করেননি, তাহলে তারা কেমন আচরণ করত। তারা নিজেদের মধ্যে তাকে নিন্দা জানাতো দ্বীনকে হেয় করায় এবং (আরো খারাপ হলো) তারা কখনো ঘোষণা দিয়ে এমন করে থাকে।

যদি তারা এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল হাদিসের দিকে ফিরে দেখত এবং ওগুলোর কয়েকটিকে অন্যগুলোর পাশে বসাত, তাদের জন্য যারা ইসলামের ব্যাপক দৃশ্য দেখতে চায় প্রতিদিনের কাজ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, তারা এমনটি করে থাকলে এই বিষয়ে হাদিসের উদ্দেশ্য তারা জানতে পারত। আল্লাহ তায়ালা যে বিষয় মানুষের জন্য প্রশস্ত করেছেন, তাকে তারা সংকীর্ণ করত না।

আবু যার থেকে নবি সা.-এর বক্তব্যরূপে মুসলিম যা বর্ণনা করেছেন তা বিবেচনা করুন। তিনি সা. বলেন : তিন প্রকার লোকের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন না : সেই দাতা যে আনুকূল্য ছাড়া কিছু দান করে না (অর্থাৎ সে দান করে খ্যাতির উদ্দেশ্যে বা গ্রহীতাকে বাঁধার জন্য), দ্রুত মুনাফাকারী[২১] যার পণ্য বিক্রয় হয় মিথ্যা শপথের মাধ্যমে এবং সেই ব্যক্তি, যে তার ইজার ঝুলিয়ে পরিধান করে[২২]।

আবু যার রা.-এর আরেকটি বর্ণনা : তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তিনি তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র

করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সা. এটি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তিনি (আবু যার) বলেন : তারা অকৃতকার্য হয়েছে এবং তারা হারিয়েছে! তারা কারা। ইয়া রসূল? তিনি সা. বলেন : যে তার পাজামা/লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরিধান করে, দাতা এবং দ্রুত মুনাফাকারী যে তার পণ্য বিক্রয় করে মিথ্যা শপথের মধ্যমে[২৩]।

যে তার ইজার ঝুলিয়ে পরে-এর উদ্দিষ্ট অর্থ কি?

এর অর্থ কি সেই ব্যক্তি যার লম্বা ইজার রয়েছে? এমনকি যদি এমনটি করার ক্ষেত্রে সে শুধু তার সম্প্রদায়ের লোকদের রীতি অনুসরণ করে থাকে, তার অভিপ্রায়ের মধ্যে কোনোপ্রকার গর্ব বা অহংকার না রেখেই? অন্য একটি সম্ভবত ওটার সত্যায়নকারী যা সহিহ্ আল-বুখারিতে আবু হুরায়রাহ্ রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : যে ইজার গোড়ালির নিচে থাকবে তা আগুনে জ্বলবে[২৪]। নাসাঈতে এই ভাষ্যে বর্ণনা এসেছে : যেসব ইজার গোড়ালির নিচে থাকবে তা আগুনে জ্বলবে[২৫]। এর অর্থ এরূপ প্রতীয়মান হতে পারে : যা কিছু ইজার পরিধানকারীর গোড়ালির নিচে ঝুলবে তা ঝুলিয়ে পরা শব্দদ্বয় দ্বারা বোঝায় এবং তা থাকবে জাহান্নামে। কারো প্রতিফলন হবে তার কাজ অনুযায়ী এবং এখানে পাজামা/লুঙ্গি/আঙরাখা (ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ্যার্থকভাবে) পরোক্ষভাবে শরীরকে এবং যে ব্যক্তি পরিধান করেছে তাকে বুঝাচ্ছে[২৬]।

যাই হোক, এর ওপর যে সমস্ত হাদিস এসেছে তার সবকটি যে ব্যক্তি পাঠ করে তার কাছে এটা স্পষ্ট যে, এর অর্থ তাই যা আল-নবভী ও ইবন হাজার এবং অন্যরা ভারসাম্যের জন্য বিবেচনা করেছেন; যথা (প্রচ্ছন্ন) পূর্ণতা ব্যাখ্যাত হবে অহংকার-এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা দ্বারা। ঐকমত্য রয়েছে যে, এই অহংকার তথা আত্মগর্ব সেটাই যার বিরুদ্ধে হাদিসে সরাসরি হুমকি এসেছে[২৭]। সুতরাং আসুন, আমরা পাঠ করে দেখি, এই হাদিসগুলোর মধ্য থেকে সহিহ্তে কি দেখা যায়।

মান জাররা ইযা-রাহু মিন গাইরি খুইয়ালা (যে ব্যক্তি আত্মগর্ব ব্যতীত ইজার নামিয়ে পরে)-এই শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে আল-বুখারি নবি সা. হতে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি সা. বলেন : যে ব্যক্তি তার পাজামা অহংকারের সাথে ঝুলিয়ে পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না। আবু বকর রা. বললেন : হে আল্লাহর রসূল, আমার তহবন্দের এক পাশ নেমে যায়, যতক্ষণ না আমি এর [প্রতিরোধে] খেয়াল করি। তখন নবি সা. বললেন : তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অমন করে [ঘটায়] আত্মগর্বের সাথে[২৮]। এই অধ্যায়ে আবু বাকরাহ'র একটি হাদিসও রয়েছে, তিনি বলেন : সূর্যগ্রহণ হচ্ছিল এবং আমরা নবি

সা.-এর সাথে ছিলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, অতি তাড়াতাড়ি তিনি তাঁর আগুরাখা নামানো অবস্থায় মসজিদ পর্যন্ত এলেন [...][২৯]। মানযারা সাওবাহ মিনআল-খুইয়ালা' শিরোনামের অধ্যায়ে (যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে পাজামা ঝুলিয়ে রাখে) আবু হুরাইয়রা হতে যে, আল্লাহর রসুল সা. বলেন : আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না যে ঔদ্ধত্যের (আল-বাতার) সাথে ইজার নামিয়ে দেয়[৩০]। আরো আবু হুরায়রা থেকে : তিনি বলেন, নবি সা. বলেছেন (অথবা তিনি বলেছেন আবু আল-কাসিম বলেছেন) : একদা একটি লোক সুন্দর পোশাক পরে হাঁটছিল, নিজেই নিজের স্তুতি গাইছিল, তার ঘন কেশরাশি পরিপাটি করে আঁচড়ানো ছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা মাটিকে নির্দেশ দিলেন তাকে নিয়ে দেবে যেতে, সুতরাং সে কিয়ামত দিবসের পূর্ব পর্যন্ত দেবে যেতেই থাকবে[৩১]।

ইবন উমার হতে এবং এর মতোই আবু হুরায়রা হতেও বর্ণনা এসেছে যে, যখন এক ব্যক্তি তার ইজার হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিচ্ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাকে দেবে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দেবে যেতেই থাকবে[৩২]।

মুসলিম আবু হুরায়রার হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যা সর্বশেষে এবং তার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সনদে ইবন উমারের হাদিস বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- আমি আল্লাহর রসুল সা.-কে আমার নিজ দু'কানে বলতে শুনেছি : অন্যকিছু ছাড়া কেবল আত্মগর্বের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তার পাজামা ঝুলিয়ে দেয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে তার দিকে তাকাবেন না[৩৩]। এই বর্ণনায় আত্মগর্ব নিষেধ করা ক্ষেত্রে আত্মগর্ব ছাড়া [অন্যকিছু] না বুঝালে শব্দাবলী প্রয়োগ করে ব্যাখ্যার কোনোকিছু অবশিষ্ট রাখা হয়নি।

আল-নবভী এবং তিনি শিথিলতার দায়ে অভিযুক্ত নন, বরং (ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত) আরো সতর্ক পরিচয়, কঠোরতার প্রতি অধিকতর অনুরাগী ব্যক্তি হিসেবে এই হাদিসের ভাষ্যে বলেন যে ব্যক্তি তার ইজার ঝুলিয়ে পরে :[৩৪] অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে তার ইজার ঝুলিয়ে রাখে- এর অর্থ হচ্ছে 'সেই ব্যক্তি গর্বের সাথে এটা ঢিলা রাখে পাশে ঝুলে থাকার জন্য। অন্য একটি হাদিসে এর ব্যাখ্যা এসেছে যে আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যে অহংকারবশত পাজামা/তহবন্দ ঝুলিয়ে রাখে এবং অহংকার অর্থ ঔদ্ধত্য। অহংকারবশত ঝুলিয়ে দেওয়ার এই সীমাবদ্ধতা যে ব্যক্তি তার ইজার ঝুলিয়ে পরে এর সাধারণ অর্থকে বিশেষায়িত করেছে। এই হুঁশিয়ারির উদ্দিষ্ট সেই ব্যক্তি যে ঝুলিয়ে রাখে, কারণ রসুল সা. এ ক্ষেত্রে আবু বকর আল-সিদ্দীককে ছাড় দিয়েছেন এবং বলেছেন : তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও যখন তিনি অহংকার ছাড়াই ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

এসকল হাদিসের ভাষ্যে ইবন হাজার বলেন যে, আল-বুখারি ইজার ঝুলিয়ে পরিধান এবং আঙরাখা হেঁচড়ে রাখার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারির জন্য এমন বর্ণনা করেছেন।

এইসব হাদিসে এটা স্পষ্ট যে, অহংকারের সাথে ইজার লম্বা রাখা একটি ভয়ানক ব্যাপার। অহংকার ব্যতিরেকে ঝুলিয়ে পরার ক্ষেত্রে এই হাদিসের বাহ্য অবস্থা এটাও নিষেধ করে। তবে এসব হাদিসে অহংকারবশত : এর প্রতি নিষেধাজ্ঞার অনুজ্ঞা হচ্ছে উল্লিখিত আচরণ জোরপূর্বক প্রতিরোধ করার বিশুদ্ধতা। লম্বা ইজার পরিধানকে ভৎর্সনা করে এটাকে পাশাপাশি নিষেধ গণ্য করা হবে, যাতে মানুষ [এটা ঘটে এমনভাবে] অহংকার থেকে মুক্ত থাকা অবস্থায়ও ঝুলিয়ে পরা ও লম্বা করে পরিধানকে নিষেধ করে।

ইবন 'আবদ আল-বারর বলেন : এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অহংকার ছাড়াই ঝুলিয়ে রাখা হুঁশিয়ারি বিরোধী হবে না যতক্ষণ না [প্রকৃতপক্ষে] জামা ঝুলিয়ে পরা এবং এছাড়া, লম্বা পোষাক সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় হয়[৩৫]।

এর দ্বারা আরো নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে, হাদিসগুলোতে বর্ণিত হুঁশিয়ারি হচ্ছে বড় ধরনের হুশিয়ারি, এটা এতদূর পর্যন্ত যে, যে ব্যক্তিই তার পোষাক লম্বা করবে সে ঐ তিনজনের মধ্যে গণ্য হবে যাদের সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা কথা বলবেন না। তিনি তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রকৃত পক্ষে, নবি সা. এই হুঁশিয়ারি তিনবার পুনর্ব্যক্ত করেছেন, এতে আবু যার এতটাই ভীত হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন : তারা অকৃতকার্য হয়েছে এবং তারা হারিয়েছে! কে তারা হে আল্লাহর রসুল? এর সবকিছু এটাই প্রকাশ করে যে, ঐ তিনজনের আমল হচ্ছে সকল পাপের মধ্যে ভয়াবহ এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে ভয়াবহ। জনকল্যাণ লঙ্ঘনের বিষয় ব্যতীত এটা এমনটা নয়, আইন যাকে সমর্থন করতে ও রক্ষা করতে এসেছে - দ্বীনে, আত্মায়, মনে, মর্যাদা, বংশপরম্পরা ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে - যা ইসলামের আইনের মৌলিক লক্ষ্য।

ইজার বা আঙরাখার সংক্ষিপ্তকরণ পরিমার্জন (প্রয়োজনীয় নয়) শিরোনামে এসেছে, সম্পর্কিত হয়েছে উত্তম আচরণ ও পরিপূর্ণতার সাথে, যা দ্বারা জীবন ধন্য হয়, রুচি উন্নত হয় এবং চরিত্রের মহৎ বৈশিষ্ট্য গভীরতা লাভ করে। পোশাক লম্বা পরিধান বা একে দীর্ঘ করা ঘটে কুমতলব হাসিলে খুলে ফেলার ক্ষেত্রে; এটা স্বল্পতর অননুমোদিত কর্মশ্রেণির অন্তর্গত।

এখানে দ্বীন যে বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ কামনা করে তা হলো বাহ্যিক আচরণের পেছনে উদ্দেশ্য ও অনুভূতি। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যমে যা দ্বীনের

ক্ষতি করে, তাহল আত্মগর্ব, অহংকার, ঔদ্ধত্য, আত্ম-প্রশংসা, রূঢ়তা এবং এধরনের মানসিক ব্যাধি ও আত্মার ত্রুটিসমূহ। সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার হৃদয়ে এসবের অণু পরিমাণ থাকবে। কঠিন হুমকি নীষিদ্ধ করণের প্রতিটিকে এটি সমর্থন করে যা উল্লেখ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে লম্বা নিম্নাংশের পোষাক পরে অহংকারবশে- যা অন্যান্য হাদিসে (ওপরে বর্ণিত) দেখানো হয়েছে।

আমরা যা বলেছি তার সাথে সম্পর্কিত আরেকটি অর্থ হচ্ছে এই : পোশাক সম্বন্ধে নির্দেশ হচ্ছে আচরণ ও বাহ্যিক রূপের অধীন যা লোকদের কাছে তাদের প্রথামতো পরিচিত। এটি গরম ও ঠাণ্ডা, সম্পদ ও দারিদ্র্য, সামর্থ ও অসামর্থ্য, কাজের ধরন ও জীবনযাত্রার মান এবং অন্যান্য প্রভাবক উপাদানের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে। আইন এখানে লোকদের জন্য নিষেধাজ্ঞা হালকা করে এবং নির্ধারিত সীমানার বিষয় ছাড়া অনুপ্রবেশ করে না, যাতে বাহ্যিক জীবনে দৃশ্যমান অপচয় ও অমিতব্যয়কে নিষেধ করে, অভ্যন্তরীণ জীবনে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের অভিপ্রায়কে এবং এ ধরনের বিষয়াদি থেকে বিরত রাখে, যা আমরা অন্যত্র বিশদভাবে দেখিয়েছি[৩৬]।

এই কারণে আল-বুখারি তার সহিহ গ্রন্থে কিতাব আল-লিবাস অধ্যায়ে পরিচ্ছেদ শিরোনাম ক্বাওল আল্লাহু তাআলা : কুল মান হাররামা যীনাতা আল-লাহি আল্লাতী আখরাজা লি-ইবাদিহি- অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার বাণী, যিনি মহীয়ান :

> বলো, যেসব সৌন্দর্য-শোভামণ্ডিত বস্ত্র ও পবিত্র জীবিকা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে তা হারাম করল (সুরা আ'রাফ, ৭ : ৩২)?

উল্লেখ করেছেন। নবি সা. বলেন : খাও, পান করো এবং পোশাক পরিধান করো এবং দান খয়রাত করো, অপচয় ও অহংকার করো না[৩৭]। ইবন আব্বাস বলেন : যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরো, যতক্ষণ না এদুটো তোমাকে স্পর্শ করে-অপচয় ও অহংকার[৩৮]।

ইবনে হাজার তার শিক্ষক আল-হাফিয আল-ইরাকি থেকে জানান যে, তিনি আল-তিরমিজিয় ভাষ্যে বলেন :

এগুলো (অর্থাৎ পরিধেয় বস্ত্র) যা মাটি স্পর্শ করে, তা হলো অহংকার। এর নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই... এবং যদি নিষিদ্ধতা সম্পর্কে বলা হয় যে, এটা হচ্ছে অভ্যস্ত রীতিকে অতিক্রম করা, এটা বেশি দূর যাবে না। যাহোক, জনগণের কাছে পাজামা লম্বা কয়ার ঐতিহ্য রয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণির মানুষ দেখতে

ও জানতে শুরু করে। এখানে কর্তব্য এটাই ছিল, যাতে অহংকারের পথ বন্ধ হয়। কারণ নিঃসন্দেহে এটি নিষিদ্ধ। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রথার পদ্ধতি নিয়ে নয় এবং এর ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, যতক্ষণ না এটি নিষিদ্ধ ধরনের প্রান্ত ঝুলিয়ে দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে।

আল-কাযী ইয়ায আলেমদের সূত্রে বলেন : বিরূপতা পুরোপুরি হচ্ছে প্রথার সীমানা ছাড়ান এবং পোশাক ঝুল ও ঢিলা হওয়ার আচরিত অভ্যাসের বাইরে[৩৯]।

সুতরাং প্রথার নিজস্ব কানুন রয়েছে এবং ঐতিহ্যের রয়েছে প্রভাব, যেমনটা আল-ইরাকী বলেছেন। প্রথা থেকে দূরে সরে গেলে অনেক সময় মনে হয় এই ব্যক্তি কুখ্যাতি অর্জনে সন্দেহ করার মতো এবং কুখ্যাতির পোশাককে আইনে নিন্দা করা হয়েছে। অতএব যা কিছু উত্তম, তা হচ্ছে পরিমার্জন।

এর বাইরে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার পরিধেয় খাটো করে সুন্নাহ্র অনুসরণ করবে এবং অহংকারের সন্দেহ হতে বেঁচে থাকবে, যদি সে আলেমগণের প্রতি বিরোধিতা পরিহারের ইচ্ছা করে এবং যদি সে পূর্ব সাবধানতা হিসেবে তার আমলের গ্রহণযোগ্যতা কামনা করে, তাহলে সে এর জন্য পুরস্কৃত হবে, যদি আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন। এ শর্তও থাকবে যে, এতে সে লোকদেরকে বাধ্য করে না এবং ঐ ব্যক্তির প্রত্যাখ্যানকে ঘোষণা করে না যে ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা ইমাম ও গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ ভাষ্যকারগণের মতামতে সন্তুষ্ট হয়ে সে অভ্যাস পরিত্যাগ করেছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। জ্ঞানসম্মত সাধারণ রীতি হচ্ছে : প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত মুজতাহিদের জন্য পুরস্কার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার নিয়েত।

একটি একক হাদিসের বাহ্যিক অর্থ অবলম্বন প্রাসঙ্গিক বিষয়সম্পন্ন অবশিষ্ট অন্যান্য হাদিস ও মূলপাঠের দিকে তাকাবার ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রমাদে পতিত হওয়ার কারণ ঘটায় এবং শুদ্ধতার প্রধান সড়ক থেকে বহু দূরে চলে যায় এবং যে উদ্দেশ্য সাধনে হাদিসটির আগমন, তার থেকেও।

কৃষিকাজ নিরুৎসাহিতকরণ সম্পর্কিত আল-বুখারির হাদিস

কিতাব আল-মুযারা'হ (বর্গাচাষ) সম্পর্কে আল-বুখারি বর্ণিত তাঁর সহিহ গ্রন্থে আবু উমামাহ আল-বাহিলী'র বাচনিক হাদিসটি বিবেচনা করুন। আবু উমামাহ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করতে দেখে বললেন : আমি আল্লাহর রসুল সা. কে বলতে শুনেছি : এটি কোনো সম্প্রদায়ের বাড়িতে প্রবেশ করে না, আল্লাহ তায়ালা এতে প্রবেশে সম্মানহানির কারণ না ঘটালে[৪০]। এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ লাঙল চালনা ও কৃষিকাজের ব্যাপারে নবি সা.-এর বিমুখতা প্রকাশ করে, যা এতে কর্মরত শ্রমিকদের

নিন্দা জানায়। প্রাচ্যবিদগণ এই হাদিসটিকে চাষাবাদের প্রতি ইসলামের অনীহা প্রকাশের কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু হাদিসটির বাহ্যিক ভাব কি সত্যিই এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে এবং ইসলাম কি সত্যিই বপন ও রোপণ বিমুখ? বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য স্পষ্ট সহিহ্ বর্ণনা এই ধারণার বিরোধী।

আনসারগণ (মদিনার বাসিন্দা মুসলিমগণ) কৃষিকাজ করতেন এবং চাষাবাদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু নবি সা. তাদেরকে তাদের কৃষি ও চাষাবাদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেননি। বরং সুন্নাহ্ স্পষ্ট করেছে এবং ইসলামী আইনব্যবস্থা বিস্তারিত করেছে কৃষি ও সেচকাজের বিধিমালাকে, পতিত জমি পুনরুদ্ধারকে এবং এর সাথে জড়িত অধিকার ও কর্তব্যকে।

অন্যরা যেমন, তেমনই শাইখগণ (আল-বুখারি ও মুসলিম) তাঁর কাছে থেকে বর্ণনা করেছেন : যে মুসলিম গাছ লাগায় অথবা বীজ বপন করে, তারপর পাখি বা কোনো মানুষ বা প্রাণী তা থেকে খেয়ে যায়। ঐ সবই তার কাছ থেকে দান হিসেবে গণ্য হয়[৪১]। মুসলিম এটি জাবির থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন : মুসলিমদের একজন নেই যে চারা লাগায়, এটি ছাড়া তার জন্য দান লেখা হয়ে থাকে। শিকারি পশু এর থেকে যা খায়, তা তার জন্য দান বলে গণ্য হয়। না কেউ তাকে বঞ্চিত করে (অর্থাৎ, তার ফল কমিয়ে দেয় বা নিয়ে যায়)। তাছাড়া তার পক্ষ থেকে এটা দান গণ্য হয়[৪২]।

জাবির আরো বর্ণনা করেন যে, নবি সা. উম্ম মা'বাদের দেওয়াল ঘেরা বাগানে ঢুকলেন, যেখানে ছিল খেজুর গাছ। তারপর তিনি সা. বললেন, হে উম্ম মা'বাদ। এই খেজুর গাছকে কে রোপণ করেছিল? কোনো মুসলিম, না কোনো অবিশ্বাসী? তিনি বললেন : অবশ্যই একজন মুসলিম। তিনি সা. বললেন : একজন মুসলিম কেবল গাছ লাগায় না, তারপর মানুষ, কিংবা পশু বা পাখি এর থেকে খায়, এছাড়া কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য দানের কাজ[৪৩]।

সুতরাং গাছ রোপণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে, যেমন রয়েছে দানের জন্য। পুরস্কার হচ্ছে কোনো ফল গাছ থেকে যা পাড়া হচ্ছে, এমনকি তার যদি এমন নিয়েত নাও থাকে - উদাহরণস্বরূপ, শিকারি জন্তু বা পাখি এর থেকে খায় কিংবা চোর চুরি করে অথবা কেউ এমনটা করার জন্য অনুমতি না নিয়েই তা কমিয়ে দেয়। এটা একটা চলমান দানের কাজ, স্থায়ী, কখনো ছিন্ন হয় না। এখানে স্থায়ী যখন কোনো জীবন্ত প্রাণী এই গাছ বা ফসল থেকে উপকৃত হয়। এই পুণ্যের চেয়ে মহৎ আর কোনো পুণ্য হতে পারে কি? কৃষির প্রতি এই উৎসাহের মহত্তর নিশ্চয়তা আর কী থাকতে পারে?

আহমদ ইবন হাম্বল তার মুসনাদে এবং আল-বুখারি তার আদাব আল-মুফরাদে রোপণ ও বপনকে উৎসাহিতকরণে আরো অলংকারপূর্ণ ও বিস্ময়কর বর্ণনা এনেছেন সাহাবি আনাস রা. থেকে : যদি সময় ঘনিয়ে আসে এবং তোমাদের কারো হাতে চারাগাছ থাকে, তখন তার রোপণ না হওয়া পর্যন্ত (সময় পাওয়া) সম্ভব হলে সে যেন চারাটি রোপণ করে[৪৪]।

আমার মতে, এটি হচ্ছে পৃথিবীকে গড়ার কাজকে সম্মান প্রদর্শন করা, এমনকি এর শেষ মুহূর্তেও। [মৃত্যু] সময় আসন্ন হলেও মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে গাছ লাগাবার জন্য, এমনকি যদিও ঐ পরিশ্রম রোপণকারীকে লাভবান করে না, বা তার পরবর্তী কাউকে, শেষ পর্যন্ত কেউই এর থেকে লাভবান হবে এমন প্রত্যাশা ছাড়াই (এ কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে)! গাছ রোপণ ও শস্য উৎপাদনের জন্য এর চেয়ে ভালো উৎসাহিতকরণ হতে পারে না, যতক্ষণ না জীবনের শ্বাস এদিক-ওদিক হয় (অর্থাৎ ফুরিয়ে আসে)। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের উদ্দেশ্যে, তারপর পরিশ্রম করতে এবং পৃথিবীকে গড়ার জন্য এবং এর মধ্যে অধ্যবসায় করে যেতে, যতক্ষণ না পৃথিবী মৃত্যুর যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়। এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম এবং শতাব্দীব্যাপী মুসলিমদের উপলব্ধি। এটাই তাদেরকে এগিয়ে দিয়েছে কৃষিকাজ ও পতিত জমি উদ্ধার করে পৃথিবী গড়ার দিকে।

ইবন জারীর‘উমারাহ ইবন খুযায়মাহ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : আমি উমার ইবন আল-খাত্তাবকে আমার পিতাকে বলতে শুনেছি : তোমার জমিতে গাছ রোপণ করতে কী তোমাকে বিরত রাখে? আমার পিতা তাকে বললেন: আমি একজন বৃদ্ধস্য বৃদ্ধ ব্যক্তি। আমি আগামীকালই মারা যেতে পারি! অতঃপর তিনি (উমার) তাকে বললেন : তোমাকে চাপ দিয়ে বলছি যে, তুমি এতে অবশ্যই গাছ রোপণ করবে! তারপর অবশ্যই উমার ইবন আল-খাত্তাবকে দেখেছি আমার পিতার সাথে নিজ হাতে গাছ রোপণ করতে[৪৫]! আহমাদ ইবন হাম্বল আবু আল-দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দামেশকে যখন তিনি গাছ লাগাচ্ছিলেন, তখন একটি লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। এই লোকটি তাকে বলল : তুমি এই কাজ করো, তুমি কি আল্লাহর রসুল সা.এর সা. সাহাবি? আবু আল-দারদা বলেন : আমার দিকে ছুটে এসো না [দ্রুত রায় দিও না]। আমি আল্লাহর রসুল সা. কে বলতে শুনেছি : যে একটা গাছ লাগাল-না কোনো মানুষ বা না আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কোনো প্রাণী তা থেকে খেল, ঐটা ছাড়া এসব দানের কাজ হবে[৪৬]।

তাহলে আল-বুখারি বর্ণিত আবু উমামাহ'র হাদিসের ব্যাখ্যা কী হবে? ইবনে হাজার তাঁর আল ফাতাহ'র মধ্যে বলেন :

আল বুখারি আবু উমামাহ'র হাদিসটির সাথে রোপণ ও বপনের গুণাবলী সংক্রান্ত হাদিসের সমন্বয় করেছেন। ঐ সমন্বয় এক বা দুই উপায়ে হয় : কৃষিকাজে আত্মমগ্ন থাকার কারণে অন্যান্য কর্তব্য অবহেলা ও এতে ব্যর্থতার কারণে তাকে এসব থেকে নিরাপদ রাখার জন্য- কারো কাছে এমন মনে হতে পারে যে, কৃষিকাজে আত্মমগ্ন থাকার পরিণামের কারণে ভৎর্সনা-এমনটা হবে আবশ্যিক জিহাদে অবহেলা বা ব্যর্থতা; অথবা যে কেউ এটা বোঝবে সে কি অবহেলা করে না বা কিসে ব্যর্থ হয় এর জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা ব্যতীত?

কিছু ভাষ্যকার বলেন : এটা তার সাথে সম্পর্কিত যে শত্রুর কাছাকাছি রয়েছে। কারণ যদি সে সময় লাঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে ঘোড়াসওয়ারিতে ব্যস্ত থাকতে পারবে না এবং শত্রু তার বিরুদ্ধে সাহস পেয়ে যাবে। তাদের কর্তব্য হবে, তারা নিজেদেরকে ঘোড়াসওয়ারিতে ব্যস্ত রাখবে এবং অন্যদের কর্তব্য তাদেরকে সেই কাজে সাহায্য ও সমর্থন করা[৪৭]।

আবু উমামাহ'র হাদিসের উদ্দেশ্যের ওপরে আহমাদ ইবন হাম্বল ও আবু দাউদ কর্তৃক ইবন উমার থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আলোকপাত করে। তিনি নবি সা. থেকে বর্ণনা করেন : যখন তুমি নমুনা[৪৮] দিয়ে বিনিময় করেছ এবং গবাদি পশুর লেজ ধরেছ এবং জমি কর্ষণে খুশি হয়েছ এবং ছেড়ে দিয়েছ জিহাদ, [তাই] আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর অপমানকে প্রভুত্ব দিয়েছেন এবং তিনি তোমার ওপর থেকে এর ক্ষমতা সরিয়ে নেবেন না, যতক্ষণ না তুমি দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করো[৪৯]। এই হাদিস উম্মাহর ওপর অসম্মান নেমে আসার কারণ উন্মোচিত করে - অংশত দ্বীন সম্পর্কিত নির্দেশের প্রতি অবহেলার সূত্রে এবং ঐসব আদেশ পালন না করা যা এই পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত, যার পূর্ণতাসাধন বাধ্যতামূলক।

নমুনা দ্বারা বিনিময় দেখায় যে, উম্মাত সেই স্থানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যা আল্লাহ তায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন এবং নিষিদ্ধ করেছেন জোরের সাথে, যা করলে তাকে আল্লাহ তায়ালা ও রসুল সা.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে - যেমন রিবা (সুদ) এবং এটিকে বিনিময় হিসেবে ব্যবহারের জন্য কৌশল প্রয়োগ, অর্থাৎ যারা এতে অংশগ্রহণ করে, বাহ্যিকভাবে আইনসম্মত মনে হলেও তা নিঃসন্দেহে বেআইনী। একইভাবে, গবাদি পশুর লেজ ধরে চলা এবং ভূমি চাষে সন্তুষ্টি, কৃষিতে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ কাজে গর্বিত বোধ করে অন্যান্য দক্ষতাকে অবহেলা, এমন কাজের উদাহরণ। জিহাদকে পরিত্যাগ করার যৌক্তিক পরিণামই হচ্ছে ঐ অবহেলা। এই কারণগুলোকে একত্রে দেখলে, যতক্ষণ উম্মাত দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করে, ততক্ষণ অসম্মান একে ঘিরে থাকবে।

এই হাদিস এবং এর পূর্বেকার হাদিসগুলো এটা স্পষ্ট করে যে, মুসলিমের উচিত হবে না একটি একক হাদিস থেকে সুন্নাহ্‌কে গ্রহণ করা বরং তার সাথে অন্যান্য হাদিস যোগ করতে হবে, যা এ হাদিসকে প্রত্যায়িত করবে বা পার্থক্যপূর্ণ করে কিংবা এর অভ্যন্তরের সাধারণ বিষয়কে বিস্তৃত বা সার্বজনীনকে বিশেষায়িত করবে কিংবা এর মধ্যকার অবাধ বিষয়কে নিষিদ্ধ করবে। এভাবে এদের কয়েকটির সাথে অন্য সহিহ হাদিসকে যুক্ত করে তিনি একটি সংহত ও ব্যাপক মতামত দাঁড় করাতে এবং তার মতামতকে পক্ষপাতিত্ব ও অযথার্থতা থেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এমনটি না করা অনেককেই প্রভাবিত করেছে যারা এটা ভুলের মধ্যে করেন, এমনকি তাদের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও।

৩. পরস্পর পার্থক্যবিশিষ্ট হাদিসের সমন্বয় অথবা এদের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান

আইনের প্রতিষ্ঠিত মূল পাঠের নীতি এই যে, এগুলো বিরোধিতাপূর্ণ নয়, কারণ সত্য সত্যের বিরোধী হতে পারে না। যদি বিরোধিতা অনুমানও করা হয়, সেক্ষেত্রে এটি বিষয়ের বাহ্যিক দিকে, প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতায় নয়। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ ধরনের বিরোধিতার অবসান ঘটান, যখন এটা সম্ভব হবে কোনোপ্রকার কৃত্রিমতা এবং খামখেয়ালী ছাড়াই। এটা করতে দুটো মূল বর্ণনা (পাঠ) কে সমন্বয় করতে হবে যাতে একটি একত্রে দুটোর কাজ করতে পারে, তারপর দুটোর মধ্যে অগ্রাধিকারের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এটা উত্তম কারণ অগ্রাধিকার দুটোর মধ্যে একটি মূলপাঠকে অবহেলা ও একটির ওপর অন্যটিকে প্রাধান্য দেওয়ার শামিল হবে।

অগ্রাধিকারের চেয়ে সমন্বয় অধিকতর সুবিধাজনক

সুন্নাহ্‌কে উত্তমভাবে বুঝতে প্রথম দর্শনে সহিহ হাদিসসমূহের মূল পাঠের অর্থে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে সমন্বয় করা গুরুত্বপূর্ণ। এর কতকগুলোকে অন্যগুলোর সাথে যুক্ত করতে হবে এবং একে এর যথাস্থানে বসাতে হবে, যাতে এগুলো একতানে আসে এবং বিরোধপূর্ণ না হয়, যাতে পরিপূরক হয় এবং বিরোধিতা না করে। আমরা কেবল সহিহ হাদিস সম্পর্কেই এমন বলি, কারণ যঈফ ও প্রক্ষিপ্ত হাদিস এর আওতায় আসে না। আমরা চাই সহিহ ও প্রতিষ্ঠিত পাঠকে মিলাতে যদি এরা পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়। আমরা দুর্বলভাবে সমর্থিত মূল পাঠের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবা হিসেবে এমনটা করি না, এটা প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ-এর কোনো চাহিদাও নেই বা এটা করা কর্তব্যও নয়[৫০]।

এ কারণেই সত্যান্বেষী আলেমগণ তোমরা দুজন কি অন্ধ? নামের যে হাদিসটি আবু দাউদ ও আল-তিরমিজিতে উম্মে সালামাহ হতে বর্ণিত হয়েছে তা খণ্ডন করেছেন, যাতে অন্ধ হলেও কোনো পুরুষকে দেখা কোনো মহিলার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা আয়িশা রা. ও ফাতিমা বিনত কায়েস বর্ণিত দুটো সহিহ হাদিসও খণ্ডন করেছেন।

উম্মে সালামাহ বলেন : আমি নবি সা.-এর কাছে ছিলাম এবং তাঁর সা. সাথে মায়মুনা রা.ও ছিলেন। এসময় ইবন উম্মে মাকতুম রা. এলেন। এটি হিজাবের নির্দেশনা আসার পরের ঘটনা। তখন নবি সা. বললেন : তার সামনে পর্দা করো। তখন আমরা বললাম : ইয়া রসুলুল্লাহ! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখেন না বা চেনেন না। নবি সা. বললেন : তোমরা দুজন কি অন্ধ? তোমরা তাকে দেখছ না?

আবু দাউদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং আল-তিরমিজিও এটিকে সহিহ ও হাসান বলেছেন[৫১]। কিন্তু এর সনদে-যেটাকে আল-তিরমিজি প্রকৃতপক্ষে সহিহ বলেছেন-সেখানে নাবহান নামে একজন রয়েছেন যিনি উম্মে সালামাহ'র চাকর ছিলেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন না এবং ইবন হিব্বান ছাড়া কেউ তাকে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেননি। আল-মুগনী গ্রন্থে, আল-যাহাবী তাকে যঈফ রাবিদের একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-এর হাদিসের সাথে এটি সাংঘর্ষিক, যেখানে মহিলাকে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আয়িশা রা. বলেন : আমি নবি সা. কে দেখলাম আমাকে তাঁর সা. আলখেল্লা দ্বারা আবৃত করে নিতে যখন আমি মসজিদে আবিসিনীয়দের খেলা উপভোগ করছিলাম[৫২]।

কাযী আয়াদ বলেন : এই হাদিসে স্ত্রীলোককে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আগন্তুকদের কার্যকলাপ দেখার, কারণ মহিলাদের কৃত যে কাজ অপছন্দনীয়, তা হচ্ছে অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখা এবং এতে আনন্দ উপভোগ করা। এই হাদিসের ওপর লিখিত প্রারম্ভিক মন্তব্যে আল-বুখারিরও একই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে : আবিসিনীয়দের প্রতি মহিলাটির দৃষ্টিপাতে সন্দেহের কিছু ছিল না[৫৩]। ফাতিমাহ বিনতে কায়েস বুখারির বর্ণনাকে এ বর্ণনা প্রত্যায়িত করে। তা এই যে, নবি সা. তাকে বললেন তার অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাকের পরপরই : ইদ্দত [পুনর্বিবাহ জায়েজ হওয়ার পূর্বে অপেক্ষাকাল] পূর্ণ কর ইবন উম্মে মাকতুমের গৃহে, কারণ সে একজন অন্ধ ব্যক্তি, তুমি তোমার বহির্বাস খুলে রাখলে সে তোমাকে দেখতে পাবে না। প্রথমে তিনি সা. উল্লেখ করেছিলেন যে, উম্মে শারিক এর সাথে তার ইদ্দত পালন করা উচিত, কিন্তু

পরে তিনি সা. বললেন : ঐ মহিলা - আমার সাহাবিরা তার (বাড়িতে) যায় করে। ইদ্দত পালন কর ইবন উম্মে মাকতুমের সাথে ... ।

সংক্ষেপে বললে, এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে উম্মে সালামাহর হাদিসটি এসব সহিহ হাদিসের ওপর অগ্রাধিকার পায় না। তা সত্ত্বেও সহিহ ও যঈফ হাদিসের সমন্বয় স্বেচ্ছায় ও প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে করার অনুমতি রয়েছে - এমনকি তা বাধ্যতামূলক না হলেও। এ প্রসঙ্গে আল-কুরতুবি (এবং অন্যরাও) উম্মে সালামাহর হাদিস সম্পর্কে বলেন :

[এটাকে সহিহ ধরে নিলে] তা [যা তিনি বলেছেন] হচ্ছে, তাদের উচ্চতর অবস্থার দৃষ্টিতে, তাঁর স্ত্রীদের কঠিনভাবে সম্বোধন করে, ঠিক কঠিনভাবেই হিজাবের নির্দেশ সম্পর্কে বলেছেন-যা আবু দাউদ এবং ইমামদের অন্যরা উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত ও সহিহ হাদিসটির অর্থ বজায় আছে এবং এটা হলো, নবি সা. ফাতিমা বিনতে কায়েসকে উম্মে শারিকের গৃহে আশ্রয় নিতে বলেছেন, [কিন্তু] পরে তিনি সা. বলেনঃ ঐ মহিলাটি-আমার সাহাবিরা তার বাড়িতে যায়। ইবন উম্মে মাকতুমের গৃহে থাক, কারণ নিঃসন্দেহে সে অন্ধ। তুমি তোমার বহির্বাস খুলে রাখতে পারো এবং সে তোমাকে দেখবে না।

এই হাদিস থেকে কিছুসংখ্যক আলেম এই অনুজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, একটি পুরুষ কর্তৃক একজন মহিলাকে ততটুকু দেখার অনুমতি রয়েছে, যতটুকু একজন মহিলার দেখার অনুমতি রয়েছে, যেমন মাথা এবং কানের লতি, কিন্তু ঢেকে রাখার স্থান (আওরাহ) এর ক্ষেত্রে না।

তিনি সা. তাকে উম্মে শারিকের গৃহের বদলে ইবন উম্মে মাকতুমের গৃহে যেতে বলেছিলেন, কারণ ওটা তার জন্য উত্তম ছিল। কারণ উম্মে শারিকের গৃহে অনেক দর্শনার্থীর যাতায়াত ছিল, তাই অনেকেই তাকে দেখত। কিন্তু ইবন উম্মে মাকতুমের গৃহে কেউ তাকে দেখত না। সুতরাং তাকে দেখা বন্ধ করা ছিল অধিকতর বাস্তব ও উত্তম, তাই ওখানে তার সুবিধার জন্য এটা করেন। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন[৫৪]।

মহিলাদের কবর জিয়ারত সম্পর্কে হাদিস

এ বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ সেই হাদিস বা হাদিসগুলো যাতে মহিলাদের গোরস্থান জিয়ারত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, আবু হুরায়রা'র হাদিস : আল্লাহর রসুল সা. কবরস্থান দর্শনকারী (জিয়ারত) মহিলাদের নিন্দা করেছেন। আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইবন মাজাহ এটা বর্ণনা করেছেন, আল-তিরমিজিও এটাকে হাসান ও

সহিহ বলেছেন এবং ইবন হিব্বান এটি তার সহিহতে বর্ণনা করেছেন[৫৫]। ইবন আব্বাসও এটা গোরস্থানে মহিলা দর্শনার্থী (জাইরাত) শব্দে এবং হাসান ইবন সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন[৫৬]। জানাজা বহনের মিছিলের অনুসরণ করতে মহিলাদের বিরত রাখার হাদিসের সমর্থনে কবরস্থান জিয়ারতের এই হাদিসটি আনয়ন করা হয়েছে।

এসব হাদিসের বিরোধিতায় অন্যগুলোও রয়েছে যা থেকে পুরুষদের মতোই মেয়েদেরও কবরস্থান দর্শনের অনুমতি বুঝা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, তাঁর সা. বক্তব্য : আমি তোমাদের জন্য কবরস্থান জিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন [এখন আমি বলি] ওগুলো জিয়ারত করো[৫৭]। কবর জিয়ারতের সাধারণ অনুমতিতে মহিলারাও যুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই যাতে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়[৫৮]। এসব হাদিসের মধ্যে মুসলিম [এবং আল-নাসায়ি ও ইবন হাম্বল] বর্ণিত আয়িশা'র বাচনিক হাদিস রয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন : কিভাবে আমি তাদেরকে সম্বোধন করব? (তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যখন আমি কবর জিয়ারত করি)। তিনি সা. বলেন : বলবে, বিশ্বাসীদের গৃহের লোকদের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য সালাম এবং আমাদের মধ্যকার পূর্বগামী ও অনুগামীদের দয়া করুন এবং নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তোমাদের সাথী হব[৫৯]। আনাস হতে শাইখাইনের বর্ণিত আরেকটি উদাহরণ রয়েছে, তা এই যে, নবি সা. কবরের পাশে বসে ক্রন্দনরতা এক মহিলাকে অতিক্রম করলেন। তিনি সা. বললেন : আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং শান্ত হও। তখন সে বলল : চলে যান। কারণ আপনি আমার মতো যন্ত্রণাক্লিষ্ট নন। সে জানত না যে তিনি নবি সা.[৬০]। এখন, তিনি তার দুশ্চিন্তা দূর করলেন। কিন্তু তার কবর জিয়ারত নিষিদ্ধ করলেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফাতিমা থেকে আল-হাকিমের বর্ণনা, যিনি নবি সা.-এর দুহিতা। তা এই যে, তিনি (ফাতিমা) প্রতি শুক্রবার তার চাচা হামযার কবর পরিদর্শন করতেন, এর পাশে বসে দোয়া করতেন ও কাঁদতেন[৬১]।

মহিলাদের কবর জিয়ারত সম্পর্কিত এসব হাদিস অধিকতর সহিহ নিষিদ্ধ করার জন্য বর্ণিত সাধারণ হাদিসের চেয়ে। সুতরাং এগুলো সংযুক্ত ও সমন্বয় করা এভাবে সম্ভব : একজন হাদিসে বর্ণিত 'লানত' কে ব্যাখ্যা করে- যেমন আল-কুরতুবি বলেন-বারংবার জিয়ারতের বর্ণনা প্রসঙ্গে, যা আল-যাওয়ারাত এর (নিবিড় অবস্থার) ব্যঞ্জনা, সেই প্রকাশ যা হাদিসে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন, এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের কারণ সম্ভবত এই যে, সে তার স্বামীর অধিকার অবহেলা করেছে এবং নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে বারবার জিয়ারতের কাজে এবং যা ক্রন্দন (বিলাপ করা) থেকে উদ্বেলিত হচ্ছে। এটা বলা যেত যদি এসব বিষয়কে নিরাপদ

করা যেত, তাহলে মহিলাদের অনুমতি প্রদানে কোনো বাধা থাকতো না, কারণ পুরুষ ও মহিলার একইভাবে মৃত্যুকে স্মরণের প্রয়োজন রয়েছে। আল-শওকানী মন্তব্য করেছেন এটি বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ হাদিসসমূহ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত[৬২]।

যদি বাহ্যিক অর্থের দিক থেকে বিরোধপূর্ণ দুই (বা ততোধিক) হাদিস সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ব্যক্তি এ দুটোর মধ্যে অগ্রাধিকার গ্রহণ করতে পারে। এটা করা হয় আলেমগণ নির্দেশিত অগ্রাধিকার নীতি অনুযায়ী। আল-সুয়ূতী তার গ্রন্থ আল-তাদরীব আল-রাবি আলা তাকরীব আল-নাবাভী'র মধ্যে এসব নীতি একশর বেশি পর্যন্ত গণনা করেছেন। এই বিষয় - বিরোধ ও অগ্রাধিকার - উসূলে আল-ফিকহ, উসূল আল-হাদিস এবং কুরআনের বিজ্ঞান নামক উপ-বিষয়াদির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ।

আল-আজল (রতি ক্রিয়ার স্বেচ্ছায় ক্ষান্তি) সংক্রান্ত হাদিস

বিস্তারিত করার জন্য আমরা ঐসব হাদিসের দৃষ্টান্ত নিতে পারি যেগুলো আল-আজল (স্বেচ্ছায় রতিক্ষান্তি)- সহবাসকালে স্ত্রী হতে পুরুষের প্রত্যাহারকরণ, যাতে সে স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের বাইরে বীর্যপাত ঘটায় যাতে স্ত্রী তার দ্বারা গর্ভবতী না হয় সংক্রান্ত।

আসুন, এখানে আমরা আবু বারাকাত ইবন তাইমিইয়াহ তার বিখ্যাত বই আল-মুনতাকামিন আল-আখবার আল-মুসতাফা গ্রন্থে আল-আজল সম্পর্কে যা এসেছে শিরোনামে যা উল্লেখ করেছেন, তা আলোচনা করি।

তিনি জাবির থেকে বলেন :

> মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী একটি ব্যতিক্রম : আমরা রসুল সা.-এর অবগতিক্রমে প্রত্যাহার করতাম, যেখানে কুরআন নাজিল হয়েছিল (অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায়)। আমরা রসুল সা.-এর অবগতিক্রমে প্রত্যাহারে অভ্যস্ত ছিলাম। তার পর ওটি [এমনটা করার সংবাদ] তার কাছে পৌঁছাল। কিন্তু তিনি আমাদেরকে [ওটা হতে] নিষেধ করলেন না।

জাবির হতে আরো বর্ণনা এই যে :

এক ব্যক্তি আল্লাহর রসুল সা.-এর কাছে এসে বলল : আমার একজন ক্রীতদাসী বালিকা রয়েছে, সে আমাদের চাকরানী এবং সে আমাদের খেজুর গাছের জন্য পানি নিয়ে আসে। আমি তাকে যৌনসম্ভোগ করি। কিন্তু আমি চাই না সে গর্ভবতী হোক।

তখন তিনি সা. বললেন : তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে বীর্য প্রত্যাহার (আজল) করতে পার। কিন্তু তার জন্য যা নির্ধারিত তা আসবেই। (ইবনে হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন, মুসলিম এবং আবু দাউদও)।

আবু সাঈদ হতে, তিনি বলেন :

আমরা নবি সা.-এর সাথে বানি আল-মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলাম। আমরা আরব বাঁদীদের সাথে নিলাম এবং আমরা মহিলাদেরকে কামনা করেছিলাম; বিরত থাকা আমাদের জন্য দুঃসহ হয়ে উঠল এবং আমরা আল আজল করতে চাইলাম, সুতরাং এ বিষয়ে আমরা নবি সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি সা. বললেন : [এটা] তোমাদের ওপর বাধ্যতামূলক নয় যে, [ওটা] তোমরা করবে না। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ও মহীয়ান, কিয়ামত পর্যন্ত কি সৃষ্টি করবেন তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। (এই হাদিসটি সর্বসম্মত)।

আবু সাঈদ থেকে, তিনি বলেন :

ইহুদিরা বলে, প্রত্যাহার হচ্ছে জীবন্ত শিশুকে কবরস্থ করার মতো। তখন নবি সা. বললেন : ইহুদিরা মিথ্যা বলে। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তায়ালা যা চান সৃষ্টি করতে পারেন, কেউ তা নিবারণ করার ক্ষমতা রাখে না। (ইবনে হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদ)।

এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রসুল, আমার একটি ক্রীতদাসী বালিকা রয়েছে এবং তার সাথে প্রত্যাহার করে থাকি, আমি চাই না সে গর্ভবতী হোক এবং আমি তাই চাই যা পুরুষমানুষ [স্ত্রীলোক হতে] চায়। সত্যিই ইহুদিরা বলে যে প্রত্যাহার হচ্ছে ...।

আল-যাদ গ্রন্থে ইবন আল-কাইয়্যিম বলেন : এই ইসনাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিতৃপ্ত হও, কারণ এর বর্ণনাকারীদের সকলেই হুফ্‌ফায।

উসামা ইবন যায়েদ হতে, তিনি বলেন :

> এক ব্যক্তি নবি সা.-এর কাছে এসে বলল : আমি আমার স্ত্রীলোক থেকে প্রত্যাহার করি। আল্লাহর নবি সা. তাকে বললেন : তুমি এমন করো কেন? তখন লোকটি বলল : আমি তার সন্তান [ধারণ] সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন অথবা তার সন্তান [থাকা] সম্পর্কে। এটা শুনে নবি সা. বললেন : এতে যদি ক্ষতি থাকত তা হলে তা রোমক ও পারস্যবাসীদের [যারা এটা করে] ক্ষতি করে থাকত। (ইবন হাম্বল ও মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন)।

জুদামাহ[৬৩] বিনতে ওয়াহব আল-আসাদিইয়াহ হতে, তিনি বলেন :

> আমি [একদল লোকের সাথে] নবি সা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি সা. বলছিলেন : আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, গর্ভকালীন (গাইলাহ) আমি যৌনসম্ভোগ হতে বিরত থাকি। তখন আমি রোমক ও পারসিকদের দেখলাম - তারা এমনটা করলেও এটা তাদের সন্তানের [যে ভূমিষ্ট হয়নি] কোনো ক্ষতি করত না। তখন তাঁকে প্রত্যাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহর রসুল সা. বলেন : ওটা হচ্ছে জীবন্ত কবরস্থ করার লুক্কায়িত রূপ এবং সে [যাকে এভাবে কবরস্থ করা হয়েছে] চিৎকার করে বলবে, যেমন কুরআন বলছে যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসা করবে' কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে। (ইবন হাম্বল ও মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন)।

উমার ইবন আল-খাত্তাব থেকে, তিনি বলেন :

আল্লাহর রসুল সা. নিষেধ করেছেন আযাদ মহিলার অনুমতি ছাড়া তার থেকে আজল করতে।

আহমদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবন মাজাহ, কিন্তু এর ইসনাদ দুর্বল[৬৪]। আমারও অভিমত ওটাই, কারণ এই সনদের ইবন লাহিয়ার সম্বন্ধে সুপরিচিত আলোচনা রয়েছে -কিন্তু ইবন আবদ আল-বার ও আহমাদ ইবন হাম্বল এবং আল-বায়হাকি ইবন আব্বাস থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা এর সাথে সত্যায়ন করা যায় : তিনি সা. আযাদ স্ত্রীলোক থেকে তার অনুমতি ব্যতীত প্রত্যাহার নিষেধ করেছেন (যেমনটা নায়ল আল-আওতার'র মধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে)।

উদ্ধৃত এসব হাদিসগুচ্ছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো প্রত্যাহার-এর গ্রহণযোগ্যতা প্রদর্শন করে। এটাই সংখ্যাগুরু আইনবিদগণ গ্রহণ করেছেন, ঐটা ব্যতীত যে, অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া কোনো আজাদ মহিলার সাথে প্রত্যাহার আমল করা না হতে পারে, এই দৃষ্টিকোণ হতে যে, এ কাজে তার উপভোগের অধিকার রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, জুদামাহ বিনত ওয়াহব-এর হাদিসে এটির জীবন্ত প্রোথিত করার গুপ্ত রূপ হওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আলেমদের কেউ কেউ এর পূর্বেরগুলোর সাথে এ হাদিসটি সমন্বয়ের পক্ষপাতি। সুতরাং এটাকে কোমলভাবে দূষণীয় (আল-তানজিহ) বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই অভিমতই আল-বায়হাকি গ্রহণ করেছেন। এরূপর আলেমগণ রয়েছেন যারা জুদামাহ'র হাদিসকে যঈফ বলেন। ইবন হাজার বলেন এটি সহিহ হাদিসগুলোকে খণ্ডন করে [এগুলো] সন্দেহযুক্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু সহিহ হাদিসে কোনো সন্দেহ নেই এবং [যেকোন ক্ষেত্রে] এদের সমন্বয় সম্ভব।

তারপর আবার, আলেমদের মধ্যে এমন রয়েছেন যারা দাবি করেন যে, এটা বাতিল। কিন্তু এই দাবি নাকচ করা হয়েছে (হাদিসসমূহের) কালপরম্পরা অনুসরণে। আল-তাহাবী বলেন : জুদামাহ'র হাদিসের প্রারম্ভিক নির্দেশের ব্যাপারে ঐকমত্য সম্ভব, আহলে কিতাবদের পাশাপাশি, সেই বিষয়ে যা তাঁর সা. ওপর নাজিল হয়নি। এরপর, আল্লাহ তায়ালা এর নির্দেশনা সম্পর্কে তাঁকে সা. অবহিত করলেন এবং তিনি সা. এ সম্পর্কে তাদের উচ্চারিত কথাকে মিথ্যা বললেন। ইবন রুশদ্‌ ও ইবন আল-আরাবি সমালোচনা করেছেন যে, রসুল সা. [একথা বলে] ইহুদিদের অনুসরণে কোনো কিছু নিষিদ্ধ করার পর বলবেন না যে, তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেছে।

সহিহ হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ থাকায় আলেমদের মধ্যে কিছুসংখ্যক জুদামাহ'র হাদিসটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তারা এর বিপরীতটিকে এর ইসনাদের ভিন্নতা এবং অন্তর্নিহিত অসংলগ্নতার কারণে দুর্বল বলেছেন। ইবন হাজার বলেন : এটা বাতিল করা হয়েছে কেবল এই কারণে যে, এটি অন্য হাদিসকে দুর্বল করেছে, এটা নয় যে এর কিছু অংশ অন্যটির কিছু অংশকে শক্তিশালী করেছে। কারণ নিশ্চয়ই এটি অনুসৃত হয়েছে। এখানে বিষয় এটিই এবং যেকোনো ক্ষেত্রে সমন্বয় সম্ভব।

ইবন হাযম জুদামাহ'র হাদিস সমর্থন করেন এবং এটি আজল করার পক্ষপাতি নয়। অন্যান্য হাদিসে আজল-এর অনুমতির নীতিতে ঐকমত্য রয়েছে, যেখানে তার হাদিস এটির নিষিদ্ধতা প্রকাশ করে। তিনি বলেন : যেই দাবি করুক না কেন যে, তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন এটি নিষেধ করার পর, তাহলে তার দায়িত্ব এই অসংলগ্নতার ব্যাখ্যা সরবরাহ করা।

অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, আল-আজল নিষিদ্ধকরণে তার হাদিসটি স্ফটিকস্বচ্ছ নয়। এছাড়াও এটিকে জীবন্ত প্রোথিত করার গুপ্ত রূপ বলাতে দুটোকে সমান করার উপস্থাপনকে প্রয়োজনীয় করে তোলে না, যাতে আল-আজল জীবন্ত প্রোথিত করার পথেই নিষিদ্ধ হওয়ার ঔচিত্য প্রকাশ করে। ইবন আল-কাইয়িম হাদিসগুলোকে সমন্বয় করেন এবং বলেন :

তিনি বলেছেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে, এটা তাদের অভিযোগ যে, আল-আজল'র পর গর্ভধারণের ধারণা একেবারেই অকল্পনীয়। তারা নিশ্চয় জীবন্ত প্রোথিত করা দ্বারা এটাকে সন্তানলাভ থেকে বঞ্চিত করার পর্যায়ে নিয়েছে এবং তাই তিনি তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। তিনি [আমাদেরকে] জানান যে, যদি আল্লাহ তায়ালা একে সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তা গর্ভধারণ প্রতিহত করে না। যদি তিনি একে সৃষ্টির ইচ্ছা না করতেন, তাহলে বাস্তবে এটিকে জীবন্তপ্রোথিত করা বলা যায় না। নবি সা.

জুদামাহ'র হাদিসে কেবল জীবন্ত প্রোথিত করার গুপ্ত অবস্থা বলেছেন, কারণ জুদামাহর হাদিসে ব্যক্তি গর্ভধারণ এড়ানোর জন্য প্রত্যাহার করেছে এবং তাই তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা এনেছেন [যেটাকে ভালোভাবেই ধরে নেওয়া যায়] জীবন্ত প্রোথিত করা সম্পর্কে বক্তব্যের মতোই। কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রকৃত জীবন্ত প্রোথিত করা ইচ্ছা ও কর্মকে একত্রে সংযুক্ত করার মাধ্যমে হয়, যেখানে প্রত্যাহার কেবল ইচ্ছাই ব্যক্ত করে। সুতরাং এটা ঐ কারণে যে, তিনি এটাকে জীবন্ত প্রোথিত করার গুপ্ত অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন এবং [পার্থক্যপূর্ণ বর্ণনাসমূহের] এই সমন্বয় শক্তিশালী।

পাশাপাশি জুদামাহ'র হাদিসটি যঈফ ঘোষণা করা হয়েছে। আমি বুঝাচ্ছি এর শেষের সংযোজনকে, কারণ সা'ঈদ ইবন আবী আইউব আবু আল-আসওয়াদ-এর কাছে থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ। মালিক এটি বর্ণনা করেছেন এবং ইয়াহইয়া ইবন আইউব আবু আল-আসওয়াদ হতে এবং এই সংযোজনকে তিনি উল্লেখ করেননি। এটাকেও দুর্বল গণ্য করা হয়, কারণ এ বিষয়ে এই গুচ্ছের হাদিসসমূহের সাথে এর বিরোধ। সুনান চতুষ্টয়ের লোকেরা এই সংযোজনকে সংক্ষিপ্ত করেছেন [বাদ দিয়েছেন][৬৫]।

বায়হাকী তার সুনান আল-কুবরা গ্রন্থে এই হাদিস ও বর্ণনাগুলোকে খুঁজে বের করেছেন ও বর্ণনা করেছেন আল- আজল'র অনুমতি বিচারে এবং এগুলো অনেক। তারপর যারা তাদের জন্য এ বিষয়ে একটি অধ্যায় উৎসর্গ করেন আল-আজল অপছন্দ করেন এবং যারা এর ওপর তার থেকে প্রাপ্ত বর্ণনায় দ্বিমত করেন, তাদের জন্য। তিনি এর অপছন্দ হওয়া বর্ণনা করেননি। কিন্তু ঐ অধ্যায়ে জুদামাহ বিনত ওয়াহব'র হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, যা মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এরপর আল-বায়হাকি বলেন :

> এর বিপরীত আমাদের কাছে নবি সা. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। আল আজল-এর অনুমতি যোগ্যতার বর্ণনাকারীগণ অধিকতর সাধারণ এবং সংরক্ষণে অধিকতর উত্তম। সাহাবিগণের মধ্যে যারা এর অনুমতি দিয়েছেন আমরা তাদের নাম উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস, যায়িদ ইবন সাবিত, জাবির ইবন আবদ আল্লাহ তায়ালা, ইবন আব্বাস, আবু আইউব আল-আনসারী এবং অন্যরা)। এটাই [অনুমতিযোগ্যতা] উত্তম। এর বিরোধিতা তাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে যারা এর থেকে দূরে থাকার ফলে এটা অপছন্দ করেছেন (তানজিহ) এটাকে নিষিদ্ধ (তাহরিম) না করে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন[৬৬]।

হাদিস বাতিলকরণ

হাদিসের মধ্যে বিরোধ বিষয়ে সংযুক্ত থাকা হচ্ছে বাতিলকরণ অথবা হাদিসে বাতিলকৃতকে বাতিলকরণ। এটি এমন এক বিষয় যা কুরআন ও হাদিস উভয় বিজ্ঞানে বিদ্যমান। কুরআনের ভাষ্যকারগণের মধ্যে এমন আছেন যারা এর মধ্যে বাতিলকরণ সম্পর্কে তাদের সীমা অতিক্রম করেছেন। এটা এতদূর পর্যন্ত হয়েছে যে, তাদের কয়েকজন অভিযোগ করেন যে, একটি একক আয়াত, যেটাকে তরবারির আয়াত বলা হয়, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের একশ'রও বেশি আয়াতকে বাতিল করে এবং তরবারির আয়াত কীসে সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়া সত্ত্বেও তারা ঐ দাবি করে থাকেন! হাদিসের ক্ষেত্রে যখন দুটো বিরোধপূর্ণ হাদিস তাদের জন্য অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়, তখন কিছু বিশেষজ্ঞ এদুটোকে সমন্বয় করতে গিয়ে বাতিলকরণের আশ্রয় নেন, এদুটোর মধ্যে কোনটি পরবর্তী তা জানা সত্ত্বেও।

বাস্তবে কুরআনের মতো একইভাবে বাতিলকরণের সুযোগ হাদিসে সংকীর্ণতর। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও এটা এমন এজন্য যে, মানুষ এটাকে চৌহদ্দির মধ্যে অন্যপথ বলে প্রত্যাশা করে, কারণ নীতিগতভাবে কুরআন সাধারণ ও স্থায়ী শর্তাদির অবস্থায় নিরত হয়। সেক্ষেত্রে সুন্নাহ্ যা নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে আংশিক অবস্থাগত ও অস্থায়ী বিষয়াদি, যার সাথে নবি সা. কর্তৃক উম্মাতের নেতৃত্ব প্রদান এবং প্রাত্যহিক বিষয়সমূহে তাঁর বিবেচনাও রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, যেসব হাদিসের ব্যাপারে বাতিলকরণের দাবি করা হয়, এর অনেকগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এগুলো বাতিলকৃত নয়।

হাদিসের মধ্যে এমনও আছে যাতে কঠোরতা ও কোমলতা উভয়ের মনোভাব রয়েছে এবং রয়েছে দু'রকমেরই নির্দেশ। কতক হাদিসে পরিস্থিতির কারণে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং কতকে অন্য পরিস্থিতির কারণে অন্যরকম এসেছে। কিন্তু পরিস্থিতির এই পরিবর্তন দ্বারা বাতিল করা বুঝায় না। ওটা বলা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, কুরবানির পশুর গোশত তিনরাত্রি পর জমা রাখা নিষিদ্ধ করার বিষয়টিতে পরবর্তী সময় অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটি বাতিলকরণ নয়, বরং এক পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধতা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অন্য পরিস্থিতিতে অনুমতিযোগ্যতা দেওয়া হয়েছে, যা আমরা অন্যত্র স্পষ্ট করেছি।

আল-বায়হাকি যা পৌঁছে দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করার মূল্য রয়েছে-তাঁর গ্রন্থ মারিফাত আল সুনান ওয়া আল আছার-আল শাফীঈ পর্যন্ত তার সনদে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দয়া করুন। তিনি বলেন :

দুটো হাদিসের একত্রে বাস্তবায়ন যেখানে সম্ভব, সেখানে সেগুলোকে একত্রে কার্যকর হতে দেওয়া যাবে এবং একটার জন্য অন্যটা স্থগিত করা হবে না। যদি দুটো হাদিসের মধ্যকার পার্থক্য ছাড়া কোনো কিছুর সম্ভাব্যতা না থাকে, তাহলে তাদের মধ্যকার পার্থক্যকে দ্বিমুখী বলে গ্রহণ করতে হবে।

এ দুটোর মধ্যে একটি দিকনির্দেশনা : দুটো হাদিসর মধ্যে একটি বাতিলকারী এবং অন্যটি বাতিলকৃত, সুতরাং একটি কাজ করছে বাতিলকারী হিসেবে এবং একটি বাতিলকৃতকে ছেড়ে দিচ্ছে।

এবং অন্য দিকনির্দেশনা : এটা এই যে দুটো পরস্পর পার্থক্য করছে এবং কোনো সাক্ষ্য নেই দুটোর কোনোটি বাতিলকারী এবং কোনোটি বাতিলকৃত। তখন আমরা দুটোর একটার দিকেও যাব না যেপর্যন্ত না একটি কারণ এমন হয়, যাতে দেখা যায় যে, আমরা যেটাতে যেতে পছন্দ করি সেটা আমরা যেটা পরিত্যাগ করি তার চেয়ে শক্তিশালী এবং ঐ কারণ হচ্ছে দুটোর মধ্যে একটি হাদিস [প্রমাণের দিক থেকে] অন্যটির চেয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা সেদিকে যাই যেটি প্রমাণে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত, অথবা আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সাথে অথবা রসুল সা.-এর সুন্নাহ্র সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা আরো বিবেচনা করি, যে ভিত্তিতে তাঁর সা. সুন্নাহ্র মতোই হাদিস একইরকম এবং যে ভিত্তিতে তারা এটা থেকে পৃথক, অথবা জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জানামতে যেটি উত্তম, অথবা সাদৃশ্যমূলক যুক্তিতে অধিকতর নির্ভুল, অথবা রসুল সা.-এর অধিকসংখ্যক সাহাবি যেটার ওপর কায়েম ছিলেন।

আল-বায়হাকি বর্ণনা করেন যে, আল-শাফি'ঈ বলেন :

> এর সারাংশ এই যে, প্রমাণিত হাদিস ছাড়া কেউ গ্রহণ করে না, ঠিক যেমন [একটি আইনসঙ্গত ক্ষেত্রে] যার নৈতিক দৃঢ়তা জ্ঞাত তার থেকে ছাড়া কেউ বক্তব্য গ্রহণ করে না। তাই যদি হাদিসটি অপরিচিত হয়, অথবা এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে পৌছানো হয়, যাদের থেকে কেউ দূরত্ব বজায় রাখে, তখন এটা এমন যেন এটা পৌছায়নি, কারণ এটা প্রতিষ্ঠিত নয়।

আল-বায়হাকি বলেন,

> যে ব্যক্তি এই গ্রন্থ (মা'রিফাত আল-সুনান ওয়া আল-আছার)-এর মধ্যে দৃষ্টি দেবে তার জন্য যে জ্ঞান বাধ্যতামূলক তা হচ্ছে তাকে আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারি এবং আবু আল-হুসাইন

> মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ আল-নিসাপুরী কর্তৃক শ্রেণিবদ্ধকৃত ও সংকলিত হাদিসসমূহ, যার সবগুলোই সহিহ, তা জানতে হবে।

সহিহ হাদিসসমূহ যা রয়ে গেছে তাঁরা তা বর্ণনা করেননি, তাদের দুজনের মতে, তা ছিল তাদের গ্রন্থে নির্দেশিত বিশুদ্ধতার স্তর ও বৈশিষ্ট্যের নিম্নে যা তাঁরা নির্ভর যোগ্যতার জন্য স্থির করেছেন।

আবু দাউদ সুলাইমান আল'আশ'আথ আল-সিজিস্তানী এগুলোর কিছুসংখ্যক [অর্থাৎ যে হাদিসগুলো আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিমে নেই] খুঁজে বের করে বর্ণনা করেছেন। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আল-তিরমিজি এগুলোর কয়েকটি খুঁজে বের করে বর্ণনা করেছেন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন খুযায়মাহ এগুলোর কয়েকটি খুঁজে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের সকলকে রহম করুন। এদের প্রত্যেকেই এমন অবস্থানে ছিলেন যে, তাদের ইজতিহাদেই এর পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ণিত সব হাদিস তিনটি শ্রেণি অনুযায়ী

এদের মধ্যে ঐ গুলো রয়েছে জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ যেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত। ওগুলো এমন হাদিস যাতে কারো পক্ষে পৃথক মত পোষণ করার অবকাশ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো বাতিল/রদ হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে এমন হাদিস রয়েছে যেগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে তারা একমত। সুতরাং এগুলো এমন হাদিস যা কারো জন্যই নির্ভরযোগ্য নয়।

ওগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন হাদিস যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে তারা ভিন্নমত পোষণ করেন। অতঃপর আলেমদের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন যিনি একটি হাদিসকে দুর্বল গণ্য করেছেন, কারণ তার কাছে ঐ হাদিসের বর্ণনার কিছু গলদ ধরা পড়েছে এবং ঐ গলদ অন্যদের চোখে গোপন ছিল। অথবা এক আলেম এটা জানা থেকে নিবৃত্ত হননি। একজন বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনার গ্রহণীয়তা বাধ্যতামূলক; অথচ অন্য আলেমগণ এটা জানা থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন। অথবা এক আলেম এর এমন অর্থ দেখিয়েছেন যাকে তিনি গলদ বিবেচনা করেছেন এবং অন্য আলেমগণ এতে গলদ দেখতে পাননি। অথবা এক আলেম বিরত থেকেছেন হাদিসটির বর্ণনান্তরে অসংলগ্নতা হতে অথবা বিরত থেকেছেন এর কিছু শব্দে অসংলগ্নতা থাকাতে অথবা বিরত থেকেছেন কিছু বর্ণনার টেক্সই এর মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত করা থেকে, হাদিসের মূল বর্ণনার শব্দসমূহে অথবা এক হাদিসের ইসনাদ

অন্যটির ইসনাদে ঢুকান হতে বিরত থেকেছেন। এগুলোর সবই অন্য আলেমদের কাছে অজানা।

এটা তাই হাদিসবেত্তা লোকদের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। তারা তাদের পার্থক্য অনুসন্ধান করবেন এবং এই পার্থক্যসমূহের অর্থগত জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করবেন, গ্রহণ বা বর্জনের দৃষ্টিকোণ; তারপর তারা তাদের অভিমত গুলোর সবচেয়ে নির্ভুলটিকে বেছে নেবেন। সাফল্যের এই উপায় হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে[৬৭]।

৪. কারণ, প্রাসঙ্গিকতা/অনুষঙ্গ এবং লক্ষ্যসমূহ

যে কারণের ওপর হাদিসের ভিত্তি, অথবা বিশেষ উপলক্ষ যার সাথে এগুলো সংযুক্ত, মূল হাদিসে যা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে বা হাদিস হতে আবিষ্কারযোগ্য, অথবা প্রকৃত পরিস্থিতি যেভাবে হাদিসটিকে বিবেচনা করা হয়েছে, তা বুঝাই হচ্ছে রসুল সা.-এর সুন্নাহ্‌কে সর্বোত্তমভাবে বুঝার পথ। এটা সম্ভব হয় অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে।

একজন গভীর অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষক দেখবেন, হাদিসগুলো বিশেষ সময়গত অবস্থা বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত জনকল্যাণ উপলব্ধির জন্য অথবা নির্দিষ্ট ক্ষতি প্রতিহতকরণার্থে অথবা ঐ সময় বিরাজমান অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশ্যে। এর অর্থ এই যে, বিশেষ কারণকে উদ্দেশ্য করে হাদিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ঐ কারণ অন্তর্হিত হওয়ার সাথে নির্দেশনার প্রস্থান ঘটে, এটা যেন ঠিক ঐ কারণ চলমান থাকার সাথেই অবস্থান করে।

এটি গভীর উপলব্ধি এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ ধারণা দাবি করে, সেই সাথে দাবি করে ব্যাপক ও সংহত অধ্যয়ন মূলপাঠের এবং আইনের লক্ষ্য ও দ্বীনের বাস্তবতা বিষয়ে পরিণত অন্তর্দৃষ্টি। এটা নৈতিক সাহস ও অন্তঃস্থ শক্তি যাতে সত্যসহ বের হওয়া যায়, এমনকি যদি এটা জনগণের অভ্যাস এবং উত্তরাধিকারের বিরোধীও হয়। এটা সহজ নয়। এটা সেই মূল্য যা আদায় করা হয়েছে শাইখ আল-ইসলাম ইবন তাইমিইয়াহ'র কাছ থেকে, তার সময়ের বিদ্বানদের শত্রুতার কারণে। তিনি অনেকবার জেলে বন্দী না হওয়া পর্যন্ত তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

জোরালো ও সূক্ষ্ম উপলব্ধির জন্য, ব্যক্তিকে অবশ্যই সহযোগী পরিস্থিতি জানতে হবে, যা হাদিসের মূল বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। কারণ হাদিসটি এসেছে ঐ অবস্থা স্পষ্টকরণ এবং তার থেকে উদ্ভূত অবস্থা মোকাবেলার জন্য। ঐ জ্ঞান হাদিসের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে যথার্থতার সাথে সহায়তা করে এবং জল্পনাকল্পনার জটিলতাকে

সুযোগ দেয় না, অথবা বাহ্যিক অর্থের পিছনে অনভিপ্রেত ছুটাছুটি নিবারণ করে। এটা ভালোভাবেই জানা আছে যে, আমাদের বিদ্বানগণ ভালো বুঝের জন্য প্রয়োজনীয় অংশের বর্ণনা করেছেন। এটা হচ্ছে কুরআন সম্বন্ধে বুঝ এবং এর নাজিল-যাওয়ার কারণ জানা। এটা ঐ সমস্ত অঘটনকে নিবারণ করতে পারে যা ঘটেছিল খারিজী ও অন্যান্য চরমপন্থীদের দ্বারা, যারা মুশরিকদের সম্পর্কে প্রত্যাদিষ্ট আয়াতগুলোকে মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল। ঐ কারণে ইবন উমার তাদেরকে সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম বলে মত প্রকাশ করেছেন- কারণ তারা আল্লাহ তায়ালার কিতাবকে বিকৃত করেছে সেই বিষয়ে যার জন্য এটি নাজিল হয়েছিল[৬৮]। এখন যদি যে কারো ইচ্ছাক্রমে কুরআন নাজিলের উপলক্ষ খোঁজ করা হয় এটা বুঝা অথবা এর ওপর মন্তব্য করার জন্য, সেক্ষেত্রে উপলক্ষ সম্পর্কে হাদিসে যা কিছু দেখা যায়, তা খুব গুরুত্বের সাথেই খোঁজ করা উচিত। একারণেই প্রকৃতিগতভাবেই কুরআন সাধারণ (General) ও স্থায়ী; এর আলোচ্যের মধ্যে আংশিক ও বিশদ বিষয়ের কোনো স্থান নেই এবং সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ বিবেচনাও নেই-এর থেকে নৈতিক পাঠ গ্রহণ করা ছাড়া। অন্যদিকে সুন্নাহ্ প্রায়শই স্থানীয় অসুবিধা ও সময়-বেষ্টিত বিষয়ে কাজ করে; এর মধ্যে বিশেষ ও বিশদ অবতারণাও থাকে যা প্রতীকীরূপে কুরআনে দেখা যায় না।

সেজন্য, প্রয়োজন হচ্ছে বিশেষ ও সাধারণের, যা সাময়িক এবং যা অনন্ত এবং যা আংশিক ও সর্ব-ব্যাপক যার মধ্যকার এগুলো পার্থক্য নির্ণয় করা। এগুলোর প্রতিটিরই নির্দেশের যথাযথ প্রকরণ ও রূপ রয়েছে। প্রসঙ্গের মধ্যে অনুসন্ধান এবং সেইসাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থা ও উপলক্ষ, যথাযথ ও বিশুদ্ধ উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করতে পারে, যাকে আল্লাহ তায়ালা বুঝবার সামর্থ্য দেন।

হাদিস : তোমাদের পার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কে তোমরাই ভালো জানো।

ওটার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই হাদিস : তোমাদের পার্থিব জীবনের বিষয়াদি সম্পর্কে তোমরা বেশি জানো[৬৯]। এটা এমন যে, কিছু লোক অর্থনীতি, পৌরনীতি ও রাজনীতি এবং এরকমই অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পর্কিত আইনী নির্দেশসমূহকে এড়াবার জন্য এটিকে ভিত্তি করে। কারণ এ বিষয়সমূহ - যেমনটা তারা দাবি করে - পার্থিব বিষয়ের অন্তর্গত এবং তাদেরকে আমরা ভালোভাবে চিনি এবং রসুল সা. তাদেরকে আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কি তাই, যা এই মহান হাদিসের আকাঙ্ক্ষা? কোনোভাবেই নয়। যেসকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলগণ আ. কে প্রেরণ করেছেন তা হচ্ছে : তাঁরা লোকদের জন্য ন্যায়ের নীতিসমূহ, সাম্যের ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ এবং তাদের পার্থিব জীবনে

অধিকার ও কর্তব্যের বিধিমালা উপস্থাপন করবেন, যাতে তাদের মান সাংঘর্ষিক না হয় কিংবা পথে ভিন্নতা না আসে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> আমি আমার রসুলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি, আর তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (সুরা হাদিদ, ৫৭ : ২৫)।

সুতরাং কিতাবের আয়াতসমূহ এবং সুন্নাহ্ এসেছে প্রতিদিনের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য - বিক্রয় ও ক্রয়, অংশীদারিত্ব ও বন্ধকী, লিজ ও ঋণ এবং অন্যান্য বিষয় - ঐ সীমা পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের দীর্ঘতম আয়াত প্রেরণ করা হয়েছে এমন বিষয়ে যা পার্থিব বিষয়াদির মধ্যে সামান্য, যেমন ঋণ লেনদেন লিখে রাখা।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

> হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যে যেন কোনো একজন লেখক ন্যায্যভাবে তা লিখে দেয় (সুরা বাকারা, ২ : ২৮২)।

তোমরা তোমাদের নিজেদের পার্থিব বিষয় ভালো জানো হাদিসটি যে উপলক্ষে ব্যক্ত হয়েছিল তা হচ্ছে খেজুর গাছের পরাগ সংযোগ। এর ব্যাপারে নবি সা. লোকদের যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর অনুমান। কারণ তিনি কৃষিবিদ ছিলেন না, তিনি এমন এক উপত্যকায় বেড়ে উঠেছিলেন যেখানে ফসল উৎপাদন হতো না। কিন্তু আনসারগণ রা. তাঁর মতামতকে ওহি কিংবা দ্বীনী নির্দেশ বিবেচনা করেছিলেন এবং তাই তারা পরাগসংযোগ বন্ধ রাখলেন। উৎপাদনে এর মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তখন তিনি সা. বললেন : আমি কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই ধারণা করেছিলাম, সুতরাং আমার থেকে অনুমান করা হয়েছে এমন কিছু গ্রহণ করো না...। [এ পর্যন্ত] তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়াদি ভালো জানো। এটাই হচ্ছে হাদিসের পেছনের কাহিনী[৭০]।

হাদিস : আমি ঐ মুসলিম থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে

আমরা আরেকটি উদাহরণ হিসেবে এ হাদিসটি পেশ করছি : আমি ঐ মুসলিম থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে [এই ভাবে যে] [মুসলিম ও অংশীবাদী মুশরিকদের] আগুন পরস্পর হতে দেখা যায় না [অর্থাৎ এই দুই দলই যুদ্ধে রত][৭১]।

এটা থেকে কেউ কেউ যেকোনো অমুসলিম দেশে বসবাসের নিষেধাজ্ঞা বুঝেছেন, আমাদের সময়ে বহুমুখী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও - শিক্ষা, দ্বীন প্রচার, কাজ করা, ব্যবসা, কূটনৈতিক মিশন, অত্যাচার থেকে বাঁচতে হিজরত এবং অন্যান্য কারণে - বিশেষত যেহেতু পৃথিবী এখন (যেমনটা শিক্ষিত মাত্রই মনে করে যে) দ্রুত একটি বড় গ্রামে পরিণত হচ্ছে।

রশীদ রিযা বলেন, হাদিসটি মুশরিকদের দেশ থেকে নবি সা.-এর দেশে তাঁকে সা. সাহায্য সহযোগিতা করণার্থে হিজরত (অভিবাসন) এর বাধ্যবাধকতা বুঝানোর জন্য এসেছে। বিভিন্ন সুনানের সংকলকগণ এটা বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আবু দাউদ এটি জারীর ইবন আবদ আল্লাহ তায়ালা থেকে বর্ণনা করেছেন, এটা উল্লেখ করে যে, রাবিদের গোষ্ঠী জারীরকে উল্লেখ করেননি, অর্থাৎ তিনি এটি মুরসাল [নবি সা. থেকে পরবর্তী কেউ একজন বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যে সাহাবি পরবর্তী ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছেন তিনি চিহ্নিত হননি] হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল-নাসায়ি কেবল এই মুরসাল বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। আল-তিরমিজি এটি খুঁজে বের করে মুরসাল হাদিস রূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে সহিহ বলেছেন। তিনি আল-বুখারির সূত্রে জানিয়েছেন যে, তিনি এটিকে সহিহ মুরসাল বলেছেন। তবে আল-বুখারি এটি বর্ণনা করেননি, কারণ এটি তাঁর সহিহ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির শর্ত পূরণ করেনি। হাদিসের উসূল শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী মুরসাল ইখতিলাফের একটি বিখ্যাত দিক। হাদিসের মূল বর্ণনা :

আল্লাহর রসুল সা. খাছ'আম গোত্রের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক অবনতমস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করল, কিন্তু হত্যা ধেয়ে গেল তাদের ওপর [তারা যুদ্ধের ডামাডোলে নিহত হলো]। এ খবর নবি সা.-এর কাছে পৌঁছে গেল। তখন তিনি তাদেরকে অর্ধেক রক্তপণ প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : আমি সেই মুসলিম থেকে মুক্ত, যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। তারা বলল : হে আল্লাহর রসুল, কেন? বললেন : তাদের আগুন একে অপরে দেখতে পায় না। (অর্থাৎ তারা প্রতিবেশি কিংবা নিকটাত্মীয় হিসেবে নয় [যারা একে অন্যের নিকটে তাঁবু খাটায়] যাতে তোমরা তাদের কারো না কারো আগুন দেখে থাক এবং এটাই তাদের মধ্যকার দূরত্ব নির্দেশ করে)।

তারা মুসলিম হলেও তিনি সা. তাদের জন্য রক্তপণ অর্ধেক করেছিলেন। কারণ তারা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিল এবং কর্তব্যের অর্ধেক লঙ্ঘন করেছিল[৭২] আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল-এর সাথে যুদ্ধরত মুশরিকদের মধ্যে বসতি স্থাপন করে। এ ধরনের আবাস সম্পর্কে তিনি ছিলেন কঠোর, কারণ এটা বসে থাকার (কার্যকর অংশগ্রহণ না করা) সমতুল্য ছিল আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সা.

কে সাহায্য করার আহ্বান সত্ত্বেও। যারা ওটা করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> ...আর যারা ইমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কোনো দায়িত্ব তোমার নেই, তবে তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে তাদের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের মৈত্রীচুক্তি রয়েছে (সুরা আন'ফাল, ৮ : ৭২)।

হিজরত করা কর্তব্য হওয়া সত্ত্বেও যে মুসলিম হিজরত করেনি আল্লাহ তায়ালা তার সাথে বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করেছেন।[৭৩] সুতরাং তাঁর সা. বক্তব্য আমি সেই মুসলিম থেকে মুক্ত... এর অর্থ হচ্ছে সেই মুসলিমকে কেউ হত্যা করলে তার জীবনের দায় গ্রহণ না করা, কারণ সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ব্যক্তিদের সাথে বসবাস করায় তার নিরাপত্তা সে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেছে।

এর অর্থ হলো, যে পরিস্থিতিতে এই বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটলে, তখন এর নেপথ্য কারণ সামষ্টিক কল্যাণ হতে বিচ্যুত হয় অথবা এর ক্ষতি এড়ান এর অর্থ হতে পারে। সুতরাং নির্দেশ সংক্রান্ত উপলব্ধি যা দাঁড়াচ্ছে পূর্বের এই বাণীতে, তা এই যে, এটি পথ পরিবর্তন করেছে। কেননা, এর কারণের ওপর নির্দেশ অস্তিত্বশীল ও বর্তমান।

মাহরামের সাথে মহিলার সফর

ইবন আব্বাস ও অন্যান্যদের মারফু বর্ণনায় সহিহ হিসেবে যে দুটি হাদিস এসেছে তা হচ্ছে ওর একটা উদাহরণ : মাহরাম সাথে না থাকলে স্ত্রীলোক সফর করতে পারে না[৭৪]।

এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, ঐ মহিলার জন্য ভয় যখন সে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া একাকী এমন এক সময় সফর করত যখন বাহন ছিল উট, খচ্চর বা গাধা এবং তাকে প্রায়ই পার হতে হতো মরুভূমি অথবা জনবসতিহীন পতিত ভূখণ্ড অথবা জীবন্ত হিংস্র প্রাণী। এমনকি এ ধরনের সফরে মহিলা যদি নিজের প্রতি অন্যায় কিছুতে না ভুগত, তার মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

কিন্তু অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটল - যেমন আমাদের সময়ে - যখন সফর হচ্ছে উড়োজাহাজ কিংবা ট্রেনে, যেখানে একশ বা আরো বেশি যাত্রী বহন করা হচ্ছে, তখন একাকী ভ্রমণরত মহিলার জন্য ভয়ের তেমন কোনো কারণ নেই। এই হাদিসের বিরোধিতার ক্ষেত্রে এটা বিবেচনা করা হয় না। বরং এই অবস্থা আদী

ইবন হাতিমের মারফূ হাদিস দ্বারা নিশ্চিত হয়, যা আল-বুখারি বর্ণনা করেছেন : [সময়টি] এমন [এখানে যখন] সকল স্ত্রীলোক হিরা থেকে গৃহের দিকে (অর্থাৎ কা'বা) সফর করবে, কোনো স্বামী তাকে সঙ্গ দেবে না[৭৫]। এই হাদিসটি ইসলামের কল্যাণ বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এর জ্যোতি বিকশিত হওয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে, এর ফলে দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে। এটা একজন মহিলাকে একাকী সফরের অনুমতি দান করে। ইবন হাযম এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছেন।

এতে বিষয়ের কিছু নেই যে, কতিপয় ইমাম মহিলাদেরকে স্বামী বা মাহ্রাম ছাড়াই হজে গমনের অনুমতি দিয়েছেন, যদি সে বিশ্বাসযোগ্যা, বা বিশ্বস্ত সঙ্গী পায়। ওটা এমন যাতে আয়িশা রা. হজ ও তাওয়াফ করেছিলেন উমার রা. এর খিলাফতকালে বিশ্বাসীদের জননীদের একজন হিসেবে। সেখানে তাঁদের সাথে কোনো মাহ্রাম ছিলেন না, বরং উসমান ইবন আফ্ফান এবং আবদ আল-রাহ্মান ইবন আউফ তাঁদেরকে সঙ্গে ছিলেন। সহিহ্ আল-বুখারিতে এমনই বর্ণনা এসেছে।

কিছু লোক বলে, একক একজন বিশ্বস্ত মহিলা সফরসঙ্গী হিসেবে যথেষ্ট। অন্যরা বলে, সে একাকী সফর করতে পারে যদি পথ নিরাপদ হয়। শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীগণ এই অভিমতকে হজ ও উমরাহ্র সফরের জন্য সঠিক বলেছেন। অন্যান্য শাফিঈগণ এই অনুমতির মধ্যে যেকোনো সফরকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, ঠিক হজের জন্য নয়[৭৬]।

নেতৃবৃন্দ হবেন কুরাইশদের মধ্য হতে

এটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই হাদিস : নেতৃবৃন্দ কুরাইশদের মধ্য থেকে[৭৭]। ইবন খালদূন তাঁর মুকাদ্দামার মধ্যে এর ওপর মন্তব্য করেছেন। রসুল সা. তাঁর আমলে দেখেছিলেন কুরাইশের ক্ষমতা ও গোষ্ঠী-সংহতি কেমন, যার ভিত্তিতে, ইবন খালদূনের মতে, খিলাফত বা রাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন :

যদি এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কুরাইশগণের অবস্থার শর্তাদি ছিল কেবল তাদের গোষ্ঠী-সংহতি ও বিজয়ের চেতনা, তাহলে আমরা জানি যে, কেবল এটাই [সামর্থ্য] তাদের শাসন করার বৈশিষ্ট্য অর্জনে যথেষ্ট ছিল। সুতরাং আমরা খুঁজে পাই কুরাইশদের সংলগ্নতা [গোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্যের মালিকানা]। আমরা যেতে পারি কুরাইশদেরকে [শাসনের জন্য] বাছাই করার মূল কারণের দিকে এবং সেটা হচ্ছে গোষ্ঠী -সংহতি। সুতরাং আমরা মুসলিমদের অধিনায়ক হিসেবে সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব, তিনি সেই লোকদের মধ্য হতে হবেন, যাদের মধ্যে গোষ্ঠী-সংহতি রয়েছে তার সময়ের যে কারো চেয়ে বেশি যাতে তারা তাদের মতো

অন্যদের অধীনস্থে পরিণত করতে পারেন এবং সর্বোচ্চ সুরক্ষার বিষয়ে লোকেরা যেন সম্মত হতে পারে]... [৭৮]।

সাহাবি ও তাবেয়ীগণের পদ্ধতি

এটি হচ্ছে হাদিসসমূহের সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি এবং তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিষয় অনুসন্ধানের পদ্ধতি। সাহাবিগণ ছিলেন এর উদ্যোক্তা এবং উৎকর্ষ'র ক্ষেত্রে যারা তাদের উত্তরাধিকারী (তাবেয়ি), তাঁরাও হাদিসের বাহ্যিক দিকের ওপর বিচার বিশ্লেষণ তারা পরিত্যাগ করতেন যখন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হতো যে, এই হাদিসগুলো নবুওতের জমানার অবস্থার সাথে সম্পর্কিত এবং পরবর্তীকালে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।

একটি দৃষ্টান্ত এমন যে, রসুল সা. খায়বারের জমি এর বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করলেন, কিন্তু উমার রা. ইরাকের উর্বর জমি (সাওয়াদ) বন্টন করলেন না। তার মনোভাব ছিল যে, এটি এর মালিকদের হাতেই থাকবে, এর পর নির্ধারণ করণের খারাজ (ভূমিকর); যাতে এটি মুসলিমদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্থায়ী সম্পদ হতে পারে[৭৯]। ঐ ব্যাপারে ইবন কুদামাহ বলেন : রসুল সা. কর্তৃক খায়বারের বন্টন ছিল ইসলামের শুরুতে চরম প্রয়োজনে এবং এতে জনকল্যাণ ছিল। এরপর এতে যে জনকল্যাণ ছিল তা ছিল জনস্বার্থে জমির দাতব্য ব্যবহার এবং এটা ছিল বাধ্যতামূলক[৮০]।

দলছুট উটের প্রতি উসমানের মনোভাব

দলছুট উট সম্পর্কে রসুল সা. যখন জিজ্ঞাসিত হলেন, তখন তিনি সেগুলোকে সংগ্রহ করতে নিষেধ করলেন এবং প্রশ্নকর্তাকে বললেন : তাদের ব্যাপারে তোমার কি দরকার? তাদেরকে ছেড়ে দাও। কারণ তাদের জুতা ও পানির মশক রয়েছে। তারা পানি খুঁজে নেবে, ঝোপঝাড় হতে লতাগুল্ম খাবে, যতক্ষণ না তাদের মালিক তাদের খুঁজে পায়[৮১]।

রসুল সা.-এর জমানাব্যাপী বিষয়টি এভাবেই চলতে থাকে। আবু বকর আল-সিদ্দীক রা. ও উমার ইবন আল-খাত্তাব রা.-এর সময়ে দলছুট উটগুলোকে এভাবেই একা ছেড়ে রাখা হতো এবং রসুল সা.-এর নির্দেশানুসারে কেউ এর মালিকানা গ্রহণ করতো না - যতক্ষণ এটি নিজেই নিজের সুরক্ষা এবং পানির খোঁজ করে নিজ উদরে ইচ্ছেমতো সঞ্চয়ে সমর্থ্য থাকত এবং থাকত এর জুতাজোড়া, অর্থাৎ এর ক্ষুরদ্বয় যা একে ভ্রমণ ও মরুভূমি পারাপারে শক্তি জোগাত। যতক্ষণ না মালিক একে খুঁজে পায়।

এরপর এল উসমান ইবন আফফান রা.-এর খিলাফতকাল। মালিক তাঁর মুয়াত্তা'য় বর্ণনা করছেন যে, তিনি ইবন শিহাব আল-যুহরীকে বলতে শুনেছেন : দলছুট উটগুলো উমার ইবন আল-খাত্তাবের সময় ছিল গর্ভবতী এবং কেউ এগুলোকে স্পর্শ করতো না। এরপর এল উসমান ইবন আফফানের যুগ। তিনি এগুলোকে চিহ্নিত করার নির্দেশ দিলেন, তারপর [এগুলোকে] বিক্রি করার। তারপর যখন এদের মালিক এল তিনি তাদের এগুলোর [নির্ধারিত] দাম দিয়ে দিলেন[৮২]। উসমানের পর অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলো। আলী ইবন আবীতালিব রা. এগুলোকে জড়ো করার নির্দেশ দিলেন এবং মালিকদের জন্য নিরাপদে রাখতে বললেন। যাই হোক, তিনি এই অভিমত গ্রহণ করলেন যে, এক সময় এমন আসবে যখন এগুলো বিক্রি করে মূল্য মালিকদের প্রদান করলে ক্ষতি হতে পারে - কারণ এই দাম মালিকদের জন্য এমনটা নাও হতে পারে, যতটা উটগুলো থাকলে হতে পারত। পরে তিনি স্থির করলেন যে, দলছুট উটগুলো খুঁজে আনা হবে এবং এগুলোর ওপর ব্যয় বায়তুল মাল হতে নির্বাহ হওয়া সংগত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মালিকগণ আসে এবং ওগুলো তাদেরকে প্রত্যার্পণ করা হয়[৮৩]।

উসমান ও আলী যা করেছিলেন তাতে রসূল সা.-এর নির্দেশের কোনো বিরোধিতা নেই। বরং তাঁরা তাঁর সা. উদ্দেশ্য এবং লোকদের চরিত্র যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত দেন - অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো স্বভাব হয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ হাত বাড়াচ্ছিল নিষিদ্ধের দিকে। দলছুট উট ও ছাগলকে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল এবং এগুলোর পরিত্যক্ত হওয়া ছিল মালিকদের জন্য সাবধানতা। এটা কোনোভাবেই রসূল সা.-এর ইচ্ছা ছিল না যখন তিনি ওগুলোকে খুঁজতে নিষেধ করেছিলেন। বরং এটা ছিল বিশেষ ক্ষতি এড়ান।

প্রথাভিত্তিক প্রধান পাঠ্যাংশ যা পরে পরিবর্তিত হয়েছে

আমরা এইমাত্র যা আলোচনা করলাম, তা হচ্ছে সেসব ইস্যু যা পূর্ববতী বা পরবর্তী প্রথা বা রীতিনীতির অধীনে এসেছে। অনুসন্ধান প্রয়োজন এ বিষয়ে যেখানে কিছু মূল পাঠের ভিত্তি রয়েছে সেইসব রীতিনীতির ক্ষেত্রে যা নবুওতের যুগে চলমান ছিল, তারপর পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের মতে, এতে কোনো ক্ষতি হবে না মূলপাঠে উদ্দেশ্যের দিক থেকে দেখলে, এগুলোর আক্ষরিক অর্থ আঁকড়ে না ধরেই।

আয়তনে বা ওজনে পরিমাপ সম্পর্কে আবু ইউসুফের অভিমত

এবিষয়ে আবু ইউসুফের অভিমত বিদ্বানগণ জানেন, এটি এসেছে সুদ-বাহিত শ্রেণিবদ্ধ মালামাল সম্পর্কে তার আলোচনা থেকে। এ ধরনের মাল সম্পর্কে নবি

সা.-এর সুপরিচিত হাদিস রয়েছে : গমের বদলে গম, মাপের বদলে মাপ, একই বস্তুর পরিবর্তে একই বস্তু। এই ভাবেই যব, খেজুর এবং লবণের জন্য ব্যবস্থা। সোনা ও রূপার ক্ষেত্রে তিনি সা. বলেন : ওজনের বদলে ওজন।

আবু ইউসুফ এই মত গ্রহণ করেছেন যে, প্রকাশের ঐ স্বরূপ যা বলা হয়েছিল ঐ সমস্ত দ্রব্যের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে যা আয়তনের দ্বারা বা ওজনের দ্বারা পরিমাপযোগ্য, এর ভিত্তি ছিল ঐ সময়ের প্রথা, তা পরে বদলে গেছে। খেজুর ও লবণ, উদাহরণস্বরূপ, ওজনে বিক্রি শুরু হয়েছে - যেমনটা আমাদের যুগে - এবং নতুন যে প্রথা এসেছে, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই আবু ইউসুফ, দৃষ্টান্তস্বরূপ, খেজুর ও লবণ সমান ওজনে বিক্রিকে আইনসম্মত করেছেন, যদিও এগুলো আয়তনে ভিন্ন।

এটির ঐ অবস্থান পর্যন্ত বিরোধিতা করা হয়েছে যা (তার শিক্ষক) আবু হানীফা গ্রহণ করেছেন। যেমন যেকোনো দ্রব্য/জিনিস যার ভিন্নতা নিষিদ্ধ হয়েছে, তা সর্বদাই সদৃশ্যের বদলে সদৃশই পরিমাপ করতে হবে, এমনকি যদি লোকেরা ঐভাবে পরিমাপ করা পরিত্যাগও করে থাকে। একইভাবে, কোনো কিছু যে ক্ষেত্রে তিনি এর ওজন হতে ভিন্নতা নিষিদ্ধ করেছেন, সেভাবেই সর্বদা মাপতে হবে, এমনকি লোকেরা এতে পরিমাপ করা পরিত্যাগ করে থাকলেও। এই মত অনুযায়ী খেজুর, লবণ, গম, যব আয়তনে পরিমাপ বাধ্যতামূলক পুনরুত্থান দিবসের আগমন পর্যন্ত। এতে লোকদের কষ্ট হয়ে যায়- তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আইনের কোনো পূর্বসংস্কার থাকা উচিত নয় যা এথেকে উদ্ভূত। সঠিক অবস্থান সেটাই যা আবু ইউসুফ বলেছেন এবং এটা আমাদের সময়ের লোকদের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যের জন্য পুরান আয়তনিক পরিমাপ ওজনের পরিমাপ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছে।

অর্থের জাকাত নির্ধারণে দুই নিসাবের অস্তিত্ব

একটি মূল পাঠ থেকে উদ্ভূত দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে রয়েছে নবি সা.-এর ঘোষিত দুটি ভিন্ন নিসাব যা পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয়েছে। তা হচ্ছে অর্থের ওপর জাকাত নির্ধারণ। দুটির একটি, রূপার জন্য তিনি সা. নির্ধারণ করেছেন ১০০ দিরহাম (৫৯৫ গ্রামের সমান) এবং দ্বিতীয়, সোনার জন্য তিনি সা. তা ২০ মিসকাল বা দিনার নির্ধারণ করেন (৮৫ গ্রামের সমান)। ঐ সময় দিনারের জন্য বিনিময় হার ছিল দশ দিরহাম পরিমাণ।

আমার লিখিত গ্রন্থ ফিক্হ আল-জাকাত-এর মধ্যে ব্যাখ্যা করেছি যে, নবি সা. যাকাতের জন্য দুটি ভিন্ন নিসাব বর্ননা করেননি। বরং এটি একটি একক নিসাব,

যার মালিকানা এর ওপর জাকাতের দায় হিসেবে যথাযথ বিবেচিত হয়। তিনি সা. রিসালাতের জামানায় লোকদের অনুসৃত রীতিনীতির অনুসরণে দুই ধরনের কর্মপন্থা সাব্যস্ত করেন। মূল পাঠ এসেছে ঐ প্রতিষ্ঠিত প্রথার ওপর ভিত্তি করে। দু'ধরনের দায়যুক্ত সম্পদের জন্য নিসাবের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল, এ দুটো সর্বদা সমান। কিন্তু আমাদের সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে - রূপার দাম দারুণভাবে কমে গেছে আপেক্ষিকভাবে সোনার দামের চেয়ে। এমন চরমভাবে ভিন্ন দায়যুক্ত সম্পদের জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের নিসাব নির্ধারণ করার অনুমতি আমাদের জন্য নেই - যাতে, ধরুন দৃষ্টান্ত হিসেবে, অর্থের (নগদ) সেই নিসাব যা ৮৫ গ্রাম সোনার দামের সমান, অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের দামের সমান। বর্তমান সময়ে সোনার মূল্যের নিসাব রূপার মূল্যের নিসাবের চেয়ে মোটামুটিভাবে দশগুণ বেশি। এ থেকে এইভাবে বলা যায় না, বিশেষ মুদ্রায় নির্ধারিত পরিমাণ দায় আছে এমন ব্যক্তিকে : যদি তুমি রূপার দ্বারা পরিমাণ করো, তবে তোমাকে সম্পদশালী বিবেচনা করা যাবে এবং অন্য এক ব্যক্তিকে যদি বলি যার অনেক গুণ বেশি রয়েছে : তোমার নিসাব সোনা দ্বারা পরিমাপ করা হলে বলব, হিসেব মতে তুমি দরিদ্র!

এর সমাধান হচ্ছে আমাদের সময়ে টাকার অংকে একক নিসাব সংজ্ঞায়িত করা। এর দ্বারা (নিসাবের) সম্পদের ন্যূনতম সীমা জাকাতের জ্ঞাত বিধান দ্বারা নির্ধারণ করা যাবে[৮৪]। মহান প্রফেসর শাইখ মুহাম্মদ আবু যারাহ এবং তার সহকর্মী শাইখ 'আবদ 'আল-ওয়াহহাব খাল্লাফ এবং শাইখ আবদ আল-রাহমান হাসান (রহ.) ১৯৫২ সালে দামেশ্‌কে জাকাতের ওপর বক্তৃতা প্রদানকালে জাকাত সম্বন্ধে এই অবস্থানই গ্রহণ করেছিলেন, সোনার নিসাবের হিসাব করে। এটাই তা যা আমি বেছে নিয়েছি এবং যুক্তি দ্বারা সমর্থন করেছি জাকাত বিষয়ে আমার গবেষণায়[৮৫]।

পুনরায়, এটা মূলপাঠের বিরোধিতা নয়, যেমনভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বরং মূলপাঠ বিশেষ প্রথার ওপর ভিত্তি করে রয়েছে, প্রথা চলে গেলে ঐ প্রথার সাথে সম্পর্কযুক্ত আদেশও চলে যাবে।

উমারের খিলাফতকালে লোকদের মধ্যে রক্তপণ পরিশোধে পরিবর্তন

ক্ষণস্থায়ী প্রথার ভিত্তিতে মূলপাঠের আরেকটি দৃষ্টান্ত যা পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়েছে, তা হচ্ছে রক্তপণ পরিশোধে কে দায়ী সেই বিষয়। রসুল সা.-এর সিদ্ধান্ত এমন ছিল- দুর্ঘটনাজনিত হত্যার ক্ষেত্রে লোকটির পিতৃকূলের আত্মীয়রা রক্তপণ পরিশোধের দায়িত্ব নেবে। কতক আইনবিদ এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে এটাকে বাধ্যতামূলক করেছেন যে, সর্বদাই পিতৃকূলের আত্মীয়রা রক্তপণ পরিশোধ করবে। তারা এই বাস্তবতার দিকে নজর দেননি যে, নবি সা. পিতৃকূলের আত্মীয়দের ওপর

রক্তপণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন একারণে যে, ঐ সময় তারাই ছিল সমর্থন ও সাহায্যের মূলকেন্দ্র। ঐসব আইনবিদের বিরোধিতা করেছেন অন্যরা, যেমন হানাফিগণ। তারা খলিফা উমারের কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে যুক্তি পেশ করেন যে, তিনি তাঁর সময়ে এ দায় দিওয়ান (সামরিক রেজিস্ট্রার)-এর লোকজনের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। ইবন তাইমিইয়াহ তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন :

নবি সা. দায়ী ব্যক্তিদের ওপর রক্তপণ ধার্য করেছিলেন এবং তারা ছিল ওরা যারা মানুষটির (হত্যাকে) সমর্থন দিয়েছে ও সাহায্য করেছে। তাঁর সময়ে দায়ী লোকেরা ছিল লোকটির পৈতৃক আত্মীয়স্বজন। এ কারণেই আইনবিদগণ এর ওপর মতপার্থক্য করেছেন। ওটার নীতি হচ্ছে : আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত অথবা যারা লোকটিকে সমর্থন করেছে ও সাহায্য দিয়েছে তারাই কি দায়ী? যারা প্রথম অভিমত পোষণ করতেন তারা নিকটাত্মীয়দের থেকে দায়িত্ব দূরে হস্তান্তর করেননি, কারণ তারা ঐসব লোক যারা নবি সা.-এর আমল অনুযায়ী দায়ী ছিল। যারা দ্বিতীয় মত পোষণ করেন তারা তাদেরকে দায়ী করেছেন যারা যেকোনো সময়ে ও স্থানে ঐ হত্যা সমর্থন করেছে। যেহেতু নবি সা.-এর সময় যারা তাকে সমর্থন ও সাহায্য করেছে তারা ছিল কেবল তার নিকটাত্মীয়, তারা ঐ লোক যারা রক্তপণ পরিশোধের জন্য দায়ী ছিল, কারণ নবি সা.-এর সময় কোনো দিওয়ান ছিল না।

উমার রা. যখন দিওয়ান চালু করেন তখন এটা জানা ছিল যে, শহরের সেনাবাহিনীর সদস্যগণ পরস্পরকে সমর্থন করতেন ও সহায়তা করতেন, এমনকি যদিও তারা নিকটাত্মীয় ছিলেন না এবং তারাই ছিলেন দায়ী ব্যক্তিবর্গ। দুটি অবস্থানের মধ্যে এটিই বিশুদ্ধতর যে দায় ভিন্ন হবে অবস্থার ভিন্নতা অনুযায়ী। কারণ অন্যথায় : এক ব্যক্তি বাস করে পশ্চিমে এবং সেখানে এমন লোকেরা রয়েছে যারা তাকে সমর্থন ও সাহায্য করে; কিন্তু যারা পূর্বে রয়েছে তারা কিভাবে দায়ী হতে পারে, যারা অন্য একটি সার্বভৌমত্বের মাঝে এবং যখন তার সূত্রের তথ্য তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে? বিপরীতভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কারণ নিশ্চয়ই নবি সা. ঐ মহিলার ওপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে হত্যা করেছিল, তাতে তার রক্তপণ প্রাপ্য হয়েছিল তার পৈতৃক আত্মীয়দের কাছ থেকে এবং তার উত্তরাধিকার ছিল তার স্বামী ও তার পুত্রগণ। সুতরাং যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সে দায়ী লোকদের মধ্যে গণ্য নয় রক্তপণ পরিশোধের জন্য[৮৬]।

এটা এই যুক্তি অনুযায়ী যাতে আমি আমাদের সময়ে একটি ফতোয়া দিয়েছি যে, রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পেশাগত সংগঠন হতে দায়িত্ব প্রদান করা যায়।

সুতরাং যদি একজন ডাক্তার ভুল করে মেরে ফেলে, তাহলে তার রক্তপণ ডাক্তারদের সংগঠন হতে প্রাপ্ত হবে এবং প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে তাদের সংগঠন হতে... এবং এভাবেই।

জাকাত আল-ফিতর

প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ্‌র অন্যতম এই যে, রসুল সা. জাকাত আল-ফিতর পরিশোধ করতেন এবং তিনি এটি প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন ফিতরার দিবসে ফজর সালাতের পর এবং ঈদের সালাতের পূর্বে। ঐ মেয়াদ এর সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য যথেষ্ট ছিল তাদের জন্য যারা এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ সমাজের সদস্য ছিল সংখ্যার দিক থেকে কম। প্রাপকগণও ছিলেন সুপরিচিত, তাদের বাসস্থান ছিল খুব কাছাকাছি। সুতরাং তাঁর সা. নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই ছিল না।

সাহাবিগণের রা. সময়ে সমাজ বিস্তৃত হলো, এর সদস্যগণ দূরে দূরে বাস করতে থাকল, ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং নতুন বংশ-গোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত হলো। তখন ফজর ও ঈদ সালাতের মধ্যবর্তী সময় আর যথেষ্ট বিবেচিত হলো না। সাহাবিগণের ফিকহ্ এই ছিল যে, তারা জাকাত আল-ফিতর প্রদান করবেন ঈদের এক বা দুদিন পূর্বে। তারপর মুজতাহিদ আইনবিদগণের মধ্য থেকে অনুসরণীয় ইমামগণ, যখন সমাজ হয়ে উঠল আরো বিস্তৃত ও জটিল, অনুমতি দিলেন রমাজানের প্রথম হতেই (যেমন রয়েছে শাফিঈ মাযহাবে) তা প্রদানের।

অধিকন্তু জাকাত আল-ফিতর হিসেবে সুন্নাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত খাদ্যবস্তু প্রদান তারা বন্ধ করলেন না। বরং তারা ওগুলোর ওপর কিয়াস করলেন, সাদৃশ্য দ্বারা এটা অনুমোদন করলেন যে, স্ব স্ব এলাকায় যে খাদ্যবস্তু সহজপ্রাপ্য হবে তা প্রদান করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের কেউ কেউ অনুমতি প্রসারিত করলেন নগদ মূল্যে পরিশোধের বিষয় সংযুক্ত করে (খাদ্যবস্তু প্রদানের পরিবর্তে), বিশেষত যদি এতে গরিবদের অধিকতর কল্যাণ হয়। এটাই হচ্ছে আবু হানীফা ও তার ছাত্রদের মতবাদ। এভাবে 'অভাবীদের জন্য যোগান দেওয়া'র উদ্দেশ্যে দানের এই দিনে এবং প্রাপ্য পরিশোধে, খাদ্যবস্তুতে বা নগদ মূল্যে ঠিকমতোই প্রদান করা হয়। কোনো কোনো সময় খাদ্যবস্তুর চেয়ে নগদ মূল্য পরিশোধই বিধানের উদ্দেশ্য পূরণে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ মনে হয়, বিশেষত আমাদের সময়ে। এতে নবি সা.-এর হাদিসের উদ্দেশ্য সংরক্ষিত ও মূল স্পিরিট কার্যকর হয় এবং এটাই হচ্ছে সত্যিকার ফিকহ্।

সুন্নাহ্র আক্ষরিকতা এবং এর মর্ম অথবা বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ উদ্দেশ্য

নিশ্চিতই যে, সুন্নাহ্র আক্ষরিকতায় লেগে থাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রের মর্ম ও উদ্দেশ্য অবাস্তবায়িত করার অবস্থা তৈরি করে; প্রকৃতপক্ষে এটা ঠিক হবে না, যদি লেগে থাকা (আঁকড়ে ধরা) কেবল এর বাহ্য দিকেই হয়। দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে, ঐসব ব্যক্তির কঠোরতা বিবেচনায় দেখা যায় তারা নগদ মূল্যে জাকাত আল-ফিতর পরিশোধকে পুরাপুরি বাতিল করে দিচ্ছেন অথচ আবু হানীফা ও তার ছাত্রদের মতবাদ অনুযায়ী এবং উমার ইবন আবদ আল-আযিয এবং প্রথম যুগের আইনবেত্তাদের অনেকের মতে এটা অনুমতিযোগ্য। যারা এ ব্যাপারে কঠোর তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, নবি সা. বিশেষ ধরনের খাদ্যবস্তুর দ্বারা জাকাতুল ফিতর প্রদান করতেন-যেমন খেজুর, আঙ্গুর (কিশমিশ), গম ও বার্লি। তারা বলেছেন আমাদের কর্তব্য আল্লাহর রসুল সা.এর নির্দেশিত সীমার মধ্যে থেকে যাওয়া, আমাদের ব্যক্তিগত মত দ্বারা তাঁর সুন্নাহ্র বিরোধিতা করা উচিত নয়। কিন্তু তারা যদি যেভাবে মেনে চলা কর্তব্য সেভাবে মেনে চলার আকাঙ্ক্ষা করেন, তারা দেখবে যে, বাস্তবে এরা নিজেরাই মূলত তাঁর নির্দেশের বাহ্যিক রূপ দেখে তাঁকে মানতে গিয়ে তাঁর বিরোধিতাই করছেন। আমি বুঝাতে চাই, যথাযথ সম্মানসহ বলা যায়, তারা সুন্নাহ্র শরীরের আনুগত্য করেন, আত্মার নয়।

নবি সা. পরিস্থিতি ও সময়ের দিকে খেয়াল করেছিলেন। তাই তিনি জাকাত আল-ফিতর ফরজ করেছিলেন, লোকদের হাতে যে খাদ্যবস্তু থাকে তার ওপর। তখন সেটাই ছিল দাতা ও গ্রহীতার জন্য বেশি উপকারী। আরবদের মধ্যে, বিশেষত বেদুঈনগণের মধ্যে, ঐ সময় নগদ অর্থ বিরল ব্যাপার ছিল; সেক্ষেত্রে খাদ্যদ্বারা জাকাত প্রদান করা ছিল তাদের জন্য সহজ। এইভাবে দানের বিষয় তাদের জন্য সহজ করা হয়েছিল, এতদূর পর্যন্ত যে, তিনি বাড়ির পনির (এটা হলো মাখন নিংড়িয়ে নিয়ে দুধ শুকনো করা) যার আছে এবং যার জন্য তা সহজ, তা দিয়ে জাকাত প্রদানের অনুমতি দেন। উদাহরণস্বরূপ, যাযাবরদের মধ্যে উট, ছাগল ও গবাদি পশুর মালিকরা ছিল।

তখন থেকেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অর্থ বাড়তে থাকে এবং খাদ্যবস্তু কমতে থাকে। সুতরাং অর্থে জাকাত পরিশোধ এবং তা গ্রহণ করা অধিকতর সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এটাই হচ্ছে রসুল সা.-এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা এবং তাঁর উদ্দেশ্য। কেবল কায়রো শহরেই দশ মিলিয়নেরও অধিক মুসলিম রয়েছে। যদি তাদের কাছ থেকে দশ ঘন মিলিয়ন মাপের বার্লি বা খেজুর বা কিশমিশ পরিশোধের দাবি করা হয়, তারা এসব কোথায় পাবে? এটা তাদের জন্য কতটা কষ্টকর ও কঠিন

হবে যদি গ্রামীণ পরিপার্শ্ব থেকে ঐসব জিনিস খুঁজে নিয়ে আসতে হয়! অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন থেকে কঠিনকে বাতিল করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সহজ করতে চান, তাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না। মনে করুন যে, তারা ঐসব জিনিস সহজেই খুঁজে পেল। তখন দরিদ্র লোক কিভাবে এর থেকে উপকৃত হবে, যখন তার আটা ভাঙবার ব্যবস্থা নেই, অথবা ময়দার তাল বানান বা পাউরুটি বানানোর ব্যবস্থা নেই। সে কেবল পারে তৈরি করা রুটি কিনতে বেকারী হতে। নিশ্চয়ই আমরা তার ওপর একটা বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি জাকাত হিসেবে শস্য দিয়ে। তারপর শস্য দেওয়ার সাথে এসে যাচ্ছে বিক্রি (অর্থের জন্য কোনোকিছুর বিনিময়ে)। কিন্তু তখন কে কিনবে যখন চারিপার্শ্বের কোনো লোকেরই শস্যের প্রয়োজন থাকছে না?

এতদসত্ত্বেও আমার কাছে খবর এসেছে, কিছু স্থানে এমন মুসলিম রয়েছে যাদের আলেমগণ তাদেরকে নগদ মূল্য দিতে নিষেধ করেন। সুতরাং যা ঘটে তা হচ্ছে একজন জাকাত আল-ফিতর দিয়ে পরিমাপ মতো খেজুর বা কিশমিশ কিনছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন বিক্রেতার কাছ থেকে দশ রিয়ালে, তারপর তা গরিব লোককে দিচ্ছে। তারপর গরিব লোকটি ওখানেই তা বিক্রি করে দিচ্ছে ক্রয়মূল্য থেকে এক বা দুই রিয়াল কমে - এবং কখনও প্রকৃত মূল্যের অর্ধেকে এবং ঐ মুহূর্তে দোকানদার কিনতে অস্বীকার করছে, কারণ তার কাছে ইতিমধ্যেই এর বিপুল পরিমাণ জমা হয়ে গেছে। এভাবে খাদ্যবস্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপী বেচাকেনা চলছে। যা ঘটছে, তাহল দরিদ্র লোক খাদ্য গ্রহণ করছে না, সে কেবল অর্থই গ্রহণ করে, কিন্তু অংকে হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে সে জাকাত-দাতার কাছ থেকে গ্রহণ করবে যদি সরাসরি নগদ মূল্য হয়। অন্যকথায় কেবল যে দামে বিক্রি করা হচ্ছে জাকাত রূপে প্রাপ্ত বস্তুটি, সেটাই গরিব লোকটি পাচ্ছে।

এখন, বিধান কি দরিদ্রের কল্যাণে অথবা এর বিপরীতে? এবং আইন কি এই পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে? এতে কঠিনতা কি প্রকৃতই সুন্নাহ্‌র অনুসরণ অথবা সুন্নাহ্‌র মর্ম অস্বীকার করা, যার নীতিবাক্য সর্বদাই ছিল এটাকে সহজ করো, কঠিন করোনা?

এরপর যারা জাকাত আল-ফিতরের মূল্য পরিশোধ অনুমোদন করে না, তারা কি খাদ্যবস্তুর আকারে প্রদানের অনুমতি দেন যা হাদিসে ব্যক্ত হয়নি, যদি প্রশ্নবিদ্ধ সেই খাদ্যবস্তু এলাকায় বিদ্যমান থাকে? ওটা মূল হাদিসের একপ্রকার ব্যাখ্যা বা সাদৃশ্যমূলক যুক্তি দাবি করে। তাদের ইমামগণ এর কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং এতে কোনো ক্ষতি লক্ষ্য করেননি। এটা আমাদের মতে একটি বিশুদ্ধ সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত এবং একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। তাহলে কেন জাকাত আল-ফিতরের মূল্য

পরিশোধের ভাবধারাকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে, যদি এর উদ্দেশ্য এমন হয় যাতে অভাবী ব্যক্তি ঐদিন ভিক্ষার জন্য ছুটাছুটি থেকে মুক্ত থাকতে পারে, সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে মূল্য পরিশোধকেই সুবিবেচিত বলে বিবেচনা করবে নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তু পরিশোধের চেয়ে। পরেরটির ক্ষেত্রে, আমরা এটাকে কেবল একটি অবস্থায় যুক্তিসংগত মনে করি, যেমন দুর্ভিক্ষের সময়, যখন লোকদের খাদ্যের প্রয়োজন বেশি থাকে অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে, যখন ব্যক্তির অর্থ থাকে, কিন্তু তা দিয়ে সে খাবার কিনতে পারে না।

৫. পরিবর্তনশীল উপকরণ ও স্থিতিশীল উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য

সুন্নাহ্কে বুঝতে সন্দেহ ও ভুলের যেসব কারণ ঘটে তা হচ্ছে এই যে, কিছু লোক স্থিতিশীল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে গুলিয়ে ফেলে, যার উপলব্ধির জন্যই সুন্নাহ্ সাময়িক ও অবস্থাগত উপায়ে সংগ্রাম করে, যা কোনো কোনো সময় অন্বেষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং তাদেরকে আপনি দেখবেন দৃঢ়তার সঙ্গে সমগ্র আলোকসম্পাত করতে এই উপকরণগুলোর ওপর, যেন সেগুলো নিজেরাই উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, যারা সুন্নাহ্ বুঝতে গভীরতাসম্পন্ন এর অধিকতর অন্তঃস্থ উদ্দেশ্য বোঝতে- তাদের জন্য এটা নিছক উপকরণ যা অবস্থার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়, কিংবা বিশেষ ঘটনা বা রীতিনীতি বা অন্যান্য প্রভাবশালী উপাদানের পরিবর্তনে।

এখান থেকে আপনি দেখুন, সুন্নাহ্র কিছু ছাত্রের মধ্যে রসুল সা.-এর ঔষধ সম্পর্কে উদ্বেগ। তারা তাদের শক্তি ও উদ্বেগ নিবদ্ধ করে ঔষধ, পুষ্টিবিধান, ভেষজাদি, শস্য ও অন্যান্য জিনিসের ওপর যা হতে নবি সা. কিছু শারীরিক অসুবিধা বা অসুস্থতার ঔষধের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা এ সম্পর্কে সুপরিচিত হাদিসসমূহ উদ্ধৃত করে থাকে, উদাহরণস্বরূপ :

> সর্বোত্তম ঔষধ হিসেবে যা তুমি ব্যবহার করতে পারো তা হচ্ছে রক্তমোক্ষণ[৮৭]।
>
> সর্বোত্তম ঔষধ যা তুমি ব্যবহার করতে পার তা হচ্ছে রক্তমোক্ষণ ও কাল জিরা[৮৮]।
>
> অত্যাবশ্যক তোমার জন্য চিকিৎসা করা ভারতীয় ঘৃতকুমারীর কাঠ দিয়ে, কারণ এর মধ্যে সাত প্রকার নিরাময় উপাদান রয়েছে...[৮৯]।
>
> তোমার জন্য অত্যাবশ্যক এই কাল বীজ দিয়ে চিকিৎসা করা, কারণ এর মধ্যে আল-সাম ব্যতীত সকল রোগের নিরাময় রয়েছে এবং ওটা [আল-সাম] হচ্ছে মৃত্যু[৯০]।

কালবীজ (কাল জিরা) এর মধ্যে আল-সাম (অর্থাৎ মৃত্যু) ছাড়া সকল রোগের নিরাময় রয়েছে[১১]।

নীলাঞ্জন সুর্মা লাগাও, কারণ এটি দৃষ্টি স্বচ্ছ করে এবং চুল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়[১২]।

আমি মনে করি, এসব ব্যবস্থাপত্র এবং এদের সদৃশসমূহ রসুল সা. প্রদত্ত ঔষধের মর্ম নয়। বরং এর মর্ম হচ্ছে : মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং শরীরের সুস্থতা ও এর শক্তিসামর্থ্য বৃদ্ধি, ক্লান্ত হলে বিশ্রাম গ্রহণ, ক্ষুধা পেলে খাওয়া এবং পীড়িত হলে চিকিৎসা। এর মর্ম এই যে, চিকিৎসা নেওয়া তাকদিরে বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়, না আল্লাহ্‌ তায়ালার ওপর নির্ভরশীলতার বিপরীত। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা আছে এটা করা আল্লাহ্‌ তায়ালার বিধানের নিশ্চিতকরণ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে; স্বাস্থ্যগত কারণে সংক্রমণকে বৈধতা দান নয়; উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ব্যক্তির স্বাস্থ্যের, বাড়ি ও রাস্তা; পানি দূষিতকরণ ও ভূমি দূষণ নিষিদ্ধকরণ; প্রতিকারের ওপর প্রতিরোধকে গুরুত্ব দান; সেগুলো নিষিদ্ধকরণ যেগুলোর (উত্তেজক ড্রাগ, ক্ষতিকর অথবা দূষণকারী পানীয়) ভোগব্যবহার ব্যক্তির ক্ষতি করে; শরীরে চাপ প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ এমনকি আল্লাহ্‌ তায়ালার ইবাদতে হলেও; শরীরকে সতেজ রাখার জন্য আমোদ ফুর্তি বা বিশ্রামকে গুরুত্ব দান এবং শরীরের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ - এবং অন্যান্য শিক্ষা যা রসুল সা. প্রদত্ত ঔষধের বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, এর ঐসব প্রেক্ষাপটে যা সকল সময় ও স্থানের জন্য সত্য।

উপকরণ ও উপায় সময়ে পাল্টায়, এক যুগ থেকে অন্য যুগে, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়। প্রকৃতপক্ষে এটা অনিবার্য যে, ওগুলোর পরিবর্তন ঘটবে। সুতরাং যখন একটি হাদিস একটি বিশেষ উপকরণ বা উপায়ের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেটাকেই এর সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা এর দ্বারা সীমাবদ্ধ নই, এর প্রতি আবদ্ধ নই।

সত্যিকারভাবে, কুরআনের কোনো আয়াত নিজেই যদি নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানের বাস্তব পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, আমরা ঐ পদক্ষেপ পর্যন্ত থেমে থাকবো এবং অন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবব না তখন থেকে এবং অন্য কোথা থেকে।

কুরআন বলেছে :

আর তাদেরকে মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে যা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে পারবে আল্লাহ

তায়ালার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যদেরকে (সূরা আন'ফাল, ৮ : ৬০)।

এমন কেউ নেই যে জানে না যে, অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়া শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়, যা এই আয়াতে কুরআন তুলে ধরেছে। বরং যাদের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে এবং ভাষা ও বিধান বুঝে তারা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে যে, অশ্বারোহী বাহিনী এখন হচ্ছে ট্যাংক, সাঁজোয়া বাহিনী এবং যুগ অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র। অশ্বারোহী বাহিনীর গুণাবলী এই আয়াতে প্রতীয়মান এবং এর জন্য রয়েছে যে বিশাল পুরস্কার; দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাদিস : কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অশ্বের মস্তকে কল্যাণ সংযুক্ত রয়েছে, পরকালীন পুরস্কার এবং যুদ্ধের[১৩] গণিমত- এটা দাবি করে যে, মানুষ অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতিস্থাপনে উদ্ভাবিত প্রত্যেক উপায় অবলম্বন করবে, যা এর শক্তিকে অনেক সময়ে ছাড়িয়ে যায়। এধরনের মূল পাঠের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেটাই যা যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পথে একটি তীর নিক্ষেপ করে, সে এমন এবং এমন[১৪] এর গুণ বর্ণনায় এসেছে। যে কোনো নিক্ষেপের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা যায় - তীর বা শটগান বা কামান বা মিসাইল - এধরনের যেকোনো উপায় উপকরণ যা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে।

আমি মনে করি দাঁত পরিষ্কার করতে মিসওয়াককে সুনির্দিষ্ট করা একই ধরনের ব্যাপার। কারণ এর লক্ষ্য হচ্ছে মুখের পরিচ্ছন্নতা যাতে প্রভু সন্তুষ্ট হন - যেমন হাদিসে এসেছে : "মিওয়াক হচ্ছে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং প্রভুকে খুশি করা[১৫]। কিন্তু মিওয়াক কি নিজেই উদ্দেশ্য? অথবা এটি আরব উপদ্বীপের উপযোগী ও সহজ উপকরণ? মানুষের জন্য রসুল সা.-এর ব্যবস্থাপত্র সেটাই ছিল যা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে, অথচ তাদের জন্য কঠিন নয়। এখানে কোনো বিরোধিতা নেই যে, বিভিন্ন সমাজে যেখানে মিওয়াক সহজ নয় সেখানে এই উপকরণটি অন্যটির সাথে (যেমন টুথব্রাশ) বদল করা যায়, যা বিপুল পরিমাণে উৎপাদনযোগ্য এবং অনেক মিলিয়ন লোকের উপযোগী।

কিছু আইনবিদ ঐ ধরনের কিছুর ওপর জোর দিয়েছেন। হাম্বলি ফিকহে হিদায়াত আল-রাগীব-এর লেখক বলেন : দণ্ডটি হচ্ছে আরাক, অর্জুন এবং জয়তুন (অলিভ) এবং অন্যকিছু [গাছ বা ঝোপঝাড়] থেকে। এটা না ব্যথা দেয়, না ক্ষতি করে, আর না তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। ব্যথাদায়ক, ক্ষতিকর বা তীক্ষ্ণ কিছুর ব্যবহার নিন্দনীয় (মাকরুহ) এমন কিছু যা ক্ষতি করে, যেমন ডালিম (রুম্মান) অথবা রিহান এবং ঝাউগাছ এবং ঐগুলোর মতো...। তিনি সঠিকভাবে সুন্নাহ্কে পালন করেন না যিনি দণ্ড (দাঁতন) ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দাঁত মাজেন। যাই হোক, গ্রন্থের সম্পাদক শাইখ আবদ আল্লাহ আল-বাসসাম আল-নবভীর সূত্রে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেন : যা

কিছু দিয়েই কেউ তার দাঁত মাজুক না কেন তা যেন পরিবর্তন (দুর্গন্ধ দূর) করতে পারে অর্থাৎ দাঁতের পরিচ্ছন্নতা বহাল করতে পারে, তাহলেই পরিষ্কার করার উদ্দেশ্য অর্জিত হলো- এমনকি যদি ব্যবহৃত উপকরণটি এক টুকরো কাপড় বা একটি আঙুল হয়...। এই অভিমতই আবু হানীফার মতোবাদ, হাদিসে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের সাধারণত্ব অনুযায়ী। আমরা আল-মুগনীতে পড়ি, যে ঐ পর্যন্ত সুন্নাহ্ প্রতিপালন করে, যা কিছু পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে এবং কারো উচিত হবে না বিশাল কিছুর জন্য হালকা সুন্নাতকে পরিহার করা। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই মত বিশুদ্ধ[৯৬]।

এ থেকে আমরা জানলাম যে, আমাদের সময়ে টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট আরাকের স্থান নিতে পারে এবং বিশেষত বাড়িতে এবং খাওয়ার পর ও ঘুমাবার পূর্বে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে, যেহেতু কিছু লোক মিওয়াকের যথাযথ ব্যবহার করে না।

একই ক্যাটাগরিতে ঐ হাদিসগুলোও যুক্ত হয়েছে যা টেবিলম্যানার সংশ্লিষ্ট, নৈতিকতাভিত্তিক, যেমন, খাবারের থালা মুছে খাওয়া, আঙুল চেটে খাওয়া এবং এমন কিছু। রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থে আল-নবভী এই ধরনের বেশ কয়েকটি হাদিস এনেছেন। এর মধ্যে একটি শাইখাইন ইবন আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেন, আল্লাহর নবি সা. বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খায়, সে যেন আঙুল চেটে খাওয়ার পূর্বে তা না ধুয়ে ফেলে[৯৭]। মুসলিম কা'ব ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি আল্লাহ্ তায়ালার নবি সা. কে তিন আঙুলে খেতে দেখেছি এবং তারপর তিনি এগুলো চেটে খাওয়া শেষ করলেন[৯৮]। তিনি জাবির থেকেও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নবি সা. আঙুল এবং থালা চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমরা জানোনা খাবারের কোন অংশে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে[৯৯] এবং আনাস থেকে, তিনি বলেন, যখন তিনি সা. খেতেন, তিনি তাঁর তিনটি আঙুল চেটে খেতেন। তিনি সা. বলেন : তোমাদের কারো একগ্রাস যদি পড়ে যায়, তাকে তা উঠিয়ে নিতে দাও এবং এর থেকে ক্ষতি দূর করতে দাও [অর্থাৎ কোন ময়লা] এবং তাকে এটা খেতে দাও এবং শয়তানের জন্য রেখে দিও না এবং তিনি সা. আমাদেরকে নির্দেশ দেন যাতে আমরা আমাদের বড় থালা পরিষ্কার করি (অর্থাৎ এটি আমরা ধুয়ে ফেলি) এবং তিনি বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা জানোনা তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে কল্যাণ রয়েছে[১০০]।

যে ব্যক্তি এসব হাদিসের শব্দ প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করবে, সে তিন আঙুল দিয়ে খাওয়া ছাড়া কিছুই বুঝবে না এবং খাওয়ার পর এগুলো চেটে নেওয়া এবং বাসন চেটে নেওয়া বা এটি পরিষ্কার করা বা মুছে ফেলাই নবি সা.-এর সুন্নাত ভাববে।

সুতরাং সে একসময় বিরক্তির সাথে চামচ দিয়ে খাওয়া লক্ষ্য করবে। কারণ, তার মতে, ঐ লোকটি সুন্নাহ্‌র বিরোধিতা করছে, যেমনটা অবিশ্বাসীরা করতে পারে! বাস্তবতা এই যে, এসব হাদিস হতে সুন্নাহ্‌র যে মর্ম গ্রহণ করতে হবে তা হচ্ছে তাঁর বিনয়, খাদ্যে আল্লাহ তায়ালার আশীস গ্রহণ এবং সেই ব্যগ্র ইচ্ছা যাতে উপকারবিহীন কোনো কিছু ফেলে দিতে গিয়ে সেই আশীস পরিত্যক্ত না হয়, যেমন খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ফেলে রাখা, অথবা সেই গ্রাস যা কিছু লোকের কাছ থেকে পড়ে যায় এবং তারা তা তুলে নিতে লজ্জা বোধ করে, এমনটা প্রদর্শন করে যেন প্রচুর ও পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে এবং নিজেদেরকে দরিদ্র ও অভাবীদের থেকে দূরে নিয়ে যায়, যারা ক্ষুদ্রতম জিনিসের জন্য সংগ্রাম করে, যদিও তা রুটির একটা টুকরা হয়।

নবি সা. এই প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছেন যে, পড়ে যাওয়া গ্রাস কেবল শয়তানের জন্যই পড়ে থাকে। এসব বিষয়ে তাঁর সা. সুন্নাহ্ প্রকৃতপক্ষে একই সময়ে একটি নৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশিক্ষণ। যদি মুসলিমরা এর ওপর আমল করত, তাহলে আমরা প্রতিদিন এই অপচয় দেখতাম না- এবং প্রত্যেকবার খাবারে ওয়েস্ট বাস্কেট বা রাবিশ বিন দেখতাম না। যদি মুসলিম সম্প্রদায় এই অপচয়ের মাত্রা গণনা করত তাহলে এর প্রতিদিনের অর্থনৈতিক মূল্য লক্ষ লক্ষ টাকা বা কয়েক মিলিয়ন টাকায় গিয়ে দাঁড়াত। তাহলে মাসে বা সমগ্র বছরে এর পরিমাণ কত হবে? এসব হাদিসের অন্তঃস্থ মর্ম এটাই। অনেক লোক যারা মাটিতে বসে আঙুলে খায় এবং পরে এগুলো চেটে নেয়, সুন্নাহ্‌র শব্দাবলীর অনুসরণে, তারা এখনও বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বৈশিষ্ট্য হতে দূরে রয়েছে। খাদ্যের কল্যাণমূলক ব্যবহার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, যা এসব আদবের পেছনের লক্ষ্য।

মক্কার ওজন এবং মদিনার পরিমাপ

আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই হাদিসটি : ওজনটি হচ্ছে মক্কার লোকদের ওজন এবং [আয়তনগত] পরিমাপ হচ্ছে মদিনার লোকদের পরিমাপ[১০১]। যে সময়ে একথা বলা হয়েছিল তার আলোক এর মধ্যে রয়েছে, যাকে কিছু লোক সমসাময়িক প্রগতিশীল শিক্ষা বলবেন। এটা পরিমাপের মানদণ্ডগুলোকে একীভূতকরণের শিক্ষা দেয় যা দিয়ে লোকেরা ক্রয়, বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন করে। ওতে স্কেলের ক্ষুদ্রতম এককের উল্লেখ রয়েছে যা লোকেরা ভালোই জানত।

মক্কার লোকেরা ছিল ব্যবসায়ী, তারা ধাতব মুদ্রায় তাদের ক্রয় বিক্রয় করত এবং তাই সুসংরক্ষিত প্রামাণ্য ওজনের ওপর নির্ভর করত- মিসকাল, দিরহাম, দানিক এবং এরকমের। সেমতে, তারা এসব ওজন সংরক্ষণে বেশি মনোযোগ দিত এবং

এগুলোর গুণক ও বিভাজককে। তারপর এটা কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, তাদের ওজনই প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য, যার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লোকেরা নিষ্পত্তি করত। এটা ওই ভিত্তিতে যে, হাদিসটি বিশেষ শব্দযোগেই এসেছে : ওজন হচ্ছে মক্কার লোকদের ওজন...। একইভাবে মদিনার লোকেরা ছিল কৃষিকাজ ও ভূমিকর্ষণের লোক, শস্য ও ফলের মালিক। তাদের মনোযোগ চালিত হতো আয়তন বিশিষ্ট পরিমাপ সংরক্ষণে- যেমন মাদ্দ, সা' এবং অন্যান্য। কারণ জমিতে উৎপাদিত বাগানের ফল ও আঙ্গুর বাজারজাতকরণের চাপ থাকত তাদের ওপর। যখন তারা বেচত বা কিনত তারা এসব পরিমাপ ব্যবহার করত এবং তারা তাদের বিধিবিধানের সঠিকতর মালিক ছিল। সুতরাং নবি সা.-এর শব্দচয়নে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, পরিমাপ তাদেরই মাপন প্রণালী।

এখানে যা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি তা এই যে, এই হাদিসের অর্থ নিয়ে বাস্তব মাপন পদ্ধতি শ্রেণির বিষয়ে করণীয় রয়েছে, যা সময়ের ও স্থানের এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তনের শর্তযুক্ত এবং এটার নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কোনো পরিবর্তন না করার ক্ষেত্রে কোনো আবশ্যিক নির্দেশ নেই। হাদিসের লক্ষ্যের কথা বলতে গেলে- এটা স্ব-প্রমাণিত, যেমনটা আমরা বলেছি, সেটা হচ্ছে মাপন-প্রণালী মানুষ যেভাবে ব্যাপক স্পষ্টতা সহকারে জানতে পেরেছে সেভাবে একীভূতকরণ। সুতরাং আজকের মুসলিমগণ দশমিক ভগ্নাংশের মাপে কোনো ক্ষতি দেখে না (যেমন কিলোগ্রাম এবং এর ভগ্নাংশ ও গুণকসমূহ), কারণ তা স্পষ্ট এবং গণনায় সহজ। এমন নয় যে, ঐ পরিমাপ বিশেষ ক্ষেত্রে হাদিসের বিরোধিতা করছে। সেজন্যেই আমরা পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে সমসাময়িক মুসলিমগণ কারো কাছে কোনো প্রকার প্রতিবাদ ছাড়াই এর ব্যবহার দেখতে পাই। দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য মেট্রিক পদ্ধতির ব্যবহার আরেকটি দৃষ্টান্ত। যেহেতু এর লক্ষ্য হচ্ছে সঠিকতা ও স্ট্যান্ডার্ডের একতার লক্ষ্যে পৌঁছানো, সেজন্য কোনো বিরোধিতা থাকার কথা নয়। যে যথার্থ নীতি মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে : জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাসীর হারানো সম্পদ যেখানেই সে এটা পায় এবং সব লোকের মধ্যে এটার ওপর তার বেশি অধিকার রয়েছে।

মাস গণনায় চাঁদ দর্শন

এই প্রসঙ্গে এ আলোচনাটি যুক্ত করা যথাযথ হবে যা এই অতিপরিচিত সহিহ হাদিসে এসেছে : এটা দেখে (অর্থাৎ চাঁদ দেখে) সিয়াম পালন করো এবং এটা দেখে সিয়াম বন্ধ করো। এরপর যদি তা তোমাদের থেকে লুক্কায়িত থাকে (অর্থাৎ দেখা না যায়) হিসাব কর (গণনা করো) মাসের দিনগুলো। অন্য শব্দে : অতঃপর যদি এটা তোমাদের আড়ালে থাকে, তাহলে শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

এখানে আইনবিদগণ বলতে পারেন, নিশ্চয়ই এই সুন্দর হাদিসটি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং উপায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।

এখন এই হাদিসটির উদ্দেশ্য'র ক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যা সরল। ঐ লোকেরা সমগ্র রমজানে সিয়াম পালন করেন এর প্রথমে বা শেষে কোনো দিন বাদ না দিয়ে, অথবা তারা একটি সংলগ্ন মাস থেকে সিয়াম পালন করবে, যেমন শা'বান বা শাওয়াল। ঐ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে রমজানের শুরু ও শেষ নিশ্চিত করার দ্বারা এমন পদ্ধতিতে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের জন্য বাস্তবোচিত ও সহজসাধ্য হয়, এমন না হয় যে, তাদের কষ্টসহ বোঝা হচ্ছে বা দ্বীনের দায়িত্ব পূর্ণকরণে বাধা সৃষ্টি করছে।

ঐ সময় নিজ চোখে চাঁদ দর্শন সহজ ও সম্ভব ছিল সাধারণ লোকদের জন্য। এজন্যই হাদিসে এর দর্শন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য পদ্ধতিতে এটা করা তাদের জন্য বোঝা হতো, যেমন গাণিতিক হিসাব- এবং ঐ সময়ের সম্প্রদায় অশিক্ষিত ছিল, লিখতে বা গণনা করতে পারদর্শী ছিল না তাই এটা করা তাদের জন্য কষ্টকর হতো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য আরাম চান; কষ্ট চান না এবং নবি সা. তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে সহজ শিক্ষাসহ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি আমাকে কষ্ট যাতনাসহ প্রেরণ করেননি[১০২]।

তাহলে এরপর, যদি অন্য কোনো পৃথক ও উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি পাওয়া যায় যা দিয়ে হাদিসের উদ্দেশ্য পূরণ হবে এবং মাস শুরুর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বা অনুমান বা মিথ্যাচার থাকবে না তাহলে ক্ষতি কী? এবং যদি এই পদ্ধতি অর্জনে অসুবিধা না হয়, তা সম্প্রদায়ের সামর্থ্যের বাইরে না যায়, এ ব্যাপারে শিক্ষা ও জ্ঞান আরোপ করা হয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভূতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদ জ্যোতির্বিদদের তাহলে? মানবিয় জ্ঞান এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, মানুষ চাঁদে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে, এর জমিনের ফাটলগুলো খুঁজে দেখছে এবং এর শিলা ও মাটির নমুনা সংগ্রহ করছে। এ অবস্থায় আমরা কেন হাদিসে বর্ণিত উপায় অবলম্বন করব- এবং উপকরণ যখন নিজেই প্রার্থিত, লক্ষ্য নয়- এবং কেন ভুলে যাব হাদিসের মূল উদ্দেশ্যকে?

হাদিসটি উল্লেখ করেছে মাস শুরু করার বিষয় এক বা দুই জন লোক খালি চোখে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়ার পর- যেখানে এটা সম্প্রদায়ের গড়পড়তা সদস্যদের বাস্তবসম্মত উপযোগী উপায় ছিল। তাহলে কিভাবে একজন চিন্তা করে এমন উপায় মেনে নিতে যা ভ্রান্তি বা অনুমান বা মিথ্যা থেকে দূরে এবং অস্বীকার করতে এমন উপায় যা নিশ্চয়তা ও সুনির্দিষ্টতা অর্জন করেছে? অধিকন্তু, এটা সম্ভব যে, পদ্ধতি প্রয়োগ করে পূর্ব ও পশ্চিমের ইসলামী সম্প্রদায় কাছাকাছি আসতে পারে এবং

তাদের মধ্যকার বিরামহীন বিরোধিতা ও মতপার্থক্য কমাতে পারে সিয়াম শুরু ও সিয়াম ভঙ্গ করা এবং ঈদের দিনের ব্যাপারে[১০৩]। এটা এমন কিছু যা কেউ বুঝতে বা গ্রহণ করতে পারে না জ্ঞানের যুক্তি দ্বারা কিংবা দ্বীনের যুক্তি দ্বারা। এ ব্যাপারে এটা কোনোপ্রকার বিরোধ ছাড়াই নিশ্চিত যে, এক পক্ষ অবশ্যই সঠিক এবং অন্য পক্ষ ভুল।

আজকের দিনে সুনিশ্চিত গণনা নিশ্চয়ই মাস নির্ণয়ের উপায়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সাদৃশ্য হিসেবে অবশ্যই এটা সমর্থিত হবে এই ভাবে যে, সুন্নাহ্‌ একটি অনুমতিযোগ্য উপায়কে আমাদের জন্য আইনসম্মত করেছে। এমনকিছু যাতে অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং ব্যাখ্যা প্রয়োজন- যেমন খালি চোখে চাঁদ দর্শন- কখনই ঐ উপকরণকে বাতিলের কারণ হতে পারে না, যা উচ্চতর এবং অধিকতর পূর্ণাঙ্গ, ইঙ্গিত উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে অধিকতর যথার্থ। তদুপরি, এই উপায় (সুনিশ্চিত গণনা) সম্প্রদায়কে কঠিন মতপার্থক্য থেকে মুক্তি দেয়, যখন সিয়াম ও কুরবানির সময় নির্ধারণের প্রসঙ্গ আসে এবং এর জনপ্রতীক ও ইবাদাতের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ঐক্য সম্ভব করে, এর দ্বীনের অধিকতর বিশেষ নির্দেশাবলীকে স্থিতি ও গতি প্রদান করবে। এটা এর জীবন ও আধ্যাত্মিকতাকে আরো প্রাসঙ্গিক করবে।

বিদ্বান ও মহান মুহাদ্দিস, আহমাদ মুহাম্মদ শাকির (রহ.), বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে একই রায়ের পক্ষে যুক্তি পেশ করছেন। তা এই যে, চান্দ্রমাস হতে হবে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাবে। তিনি এই সত্যতার ওপর তার যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন যে, সুন্নাহ্‌ স্বয়ং এ সম্পর্কে (আইনগত) যে কারণকে শর্ত করে দিয়েছে, চাঁদ দেখা সম্পর্কিত নির্দেশ এর ওপর নির্ভরশীল। এখন এমন হচ্ছে যে, ঐ কারণ কখনই দেখা যাচ্ছে না, তাই সংশ্লিষ্ট নির্দেশ নাকচ করা উচিত। কারণ এটা সম্মত ও প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, নির্দেশের সাথে এর কারণ থাকবে, বর্তমান হোক বা অবর্তমান। সর্বোত্তম হচ্ছে তার নিজ ভাষায় মূলপাঠ উদ্ধৃত করা, কারণ তাতে একটি শক্তি ও স্পষ্টতা রয়েছে। তিনি আওয়ায়িল আল-শুহুর আল-আরাবিইয়্যাহ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

যে বিষয় (সম্পর্কে) কোনো সন্দেহ তা এই যে, আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের প্রাথমিক সময়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও ভৌত বিজ্ঞানের যে জ্ঞান অর্জন করত সে এর প্রাথমিক বা ভাসাভাসা জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারত। সে এটা জানত পর্যবেক্ষণ বা অনুকরণের মাধ্যমে, অথবা জনশ্রুতি ও বর্ণনা থেকে। এটা [তার জ্ঞান] গাণিতিক মূল, বা পূর্ণাঙ্গ স্বতঃসিদ্ধ থেকে আহরিত নিশ্চিত প্রমাণের ভিত্তিতে ছিল না। এ কারণের জন্য আল্লাহর নবি সা.

মাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন যাতে [মানুষের] ইবাদতের নিয়মকানুনকে সুনির্দিষ্ট ও সাক্ষ্য প্রমাণ ভিত্তিক বিষয়ে পরিণত করে তাদের প্রত্যেকের বা অধিকাংশের সামর্থ্যের মধ্যে রাখা যায় এবং তা ছিল, খালি চোখে চাঁদ দর্শন। অতঃপর এটা তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও নিয়মাদির ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও আরো নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। এর সাথে যুক্ত হয় নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা যা ছিল তাদের সামর্থ্যের মধ্যে [সে সময় অর্জন করার জন্য]। আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর বোঝা চাপান না যতক্ষণ না তিনি তাকে সুযোগ দেন সেই বোঝা বহনের সামর্থ্য অর্জনের।

আইনের নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমনকিছু ছিল না ঐ সময়ে যার ফলে এমন হতো যে, মানুষ গণনা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রমাণের ওপর নির্ভর করত। তাদের বড় শহরগুলোতে তারা এর কিছু জানত না। তাদের অনেকেই ছিল বেদুঈন [যাযাবর]। বড় বড় শহরের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছত না সাময়িক বিরতির আগে পরে ছাড়া এবং সেটা ছিল মাঝে মধ্যে। সুতরাং যদি তিনি সা. তাদের জন্য গণনা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়াস নিতে, এটা তাদের প্রতি বাড়াবাড়ি হতো। কারণ অভিনবত্ব ও নতুনত্ব [তখনকার বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার যেমন ছিল] তাদের জানা ছিল না, একেবারে স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত এবং সেটাও জনশ্রুতি থেকে যদি সেটা তাদের কাছে শেষাবধি পৌঁছেই থাকে। [এমনকি] গণনাকারী কিছু লোক কর্তৃক অনুকরণ ব্যতীত এটা বড় শহরের লোকদেরও জানা ছিল না এবং এদের অধিকাংশ বা এদের সকলেই ছিল আহলে কিতাবের সদস্য।

তারপর মুসলিমরা বিশ্ব জয় করে এবং তারা বিজ্ঞানের গ্রহণ করে। তারা তাদের সকল কলা ও কারিগরি ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও যোগ্যতার বিস্তার ঘটায়। তারা পূর্ববর্তীদের বিজ্ঞানশাস্ত্রাদির অনুবাদ করে এবং [নিজেরা] এগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। তারা অজানা লুক্কায়িত বস্তুর অনেকটাই আবিষ্কার করেছিল এবং তাদের জন্য সংরক্ষণ করেছে যারা তাদের পরে আসবে। এগুলোর মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও নক্ষত্র বিদ্যা এবং তারকা গণনা বিজ্ঞানও ছিল।

আইনবিদ ও মুহাদ্দিসগণের অনেকেই জ্যোতির্বিদ্যা জানতেন না, অথবা তাদের কেউ কেউ [কেবল] এর কিছু প্রাসঙ্গিক জ্ঞান রাখতেন। তাদের কয়েকজন বা অনেকেই তাকে বিশ্বাস করতেন না যিনি [জ্যোতির্বিদ্যা] জানতেন এবং তার সঙ্গে সহজ সম্পর্কও ছিল না তাদের। বরং তারা একে বিচ্যুতি ও জনশ্রুতি বলে পূর্বাহ্নেই রায় দিয়ে দিতেন, এটা চিন্তা করে যে, এসব বিজ্ঞান তাদেরকে [চর্চাকারীদের] অদেখা বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী (ভবিষ্যত সম্পর্কে গণনাকারী) বলে দাবি করতে

উদ্বুদ্ধ করবে। তাদের কিছুসংখ্যক অবশ্য দাবি করছিলেন যে, এটা তাদের এবং তাদের বিজ্ঞানের ক্ষতি সাধন করবে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু আইনবিদ ঐ অন্যায় ক্ষমা করছিলেন। আইনবিদ ও আলেমদের মধ্যে যারা এসব বিজ্ঞান জানতেন, তারা এর সাথে দ্বীন বা ফিকহ্'র সম্পর্কের একটি নিখুঁত (সহিহ্) সংজ্ঞা দেওয়ার সামর্থ্যও রাখতেন না। বরং তারা এসবকে ভয়ংকর [এমনকিছু যাকে ভয় করা ও এড়িয়ে চলা প্রয়োজন] বলে ইঙ্গিত করতেন।

তখন সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্যা ধর্মীয় বিজ্ঞানের মতো বিস্তৃতি লাভ করেনি। সেই সময় এসব বিজ্ঞানের বিষয়ও বিস্তারলাভ করেনি। আলেমদের মতে, ধর্মীয় বিজ্ঞানের বিপরীতে ঐসব বিজ্ঞানের ভিত্তি সুনির্দিষ্টতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই বিশাল ও অপূর্ব আইন, আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত না-করা পর্যন্ত, যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। এটা প্রত্যেক জনগোষ্ঠী এবং প্রত্যেক যুগের জন্য বিধান প্রণয়ন করে থাকে। ঐ বিশেষ কারণের জন্য আমরা মহাগ্রন্থে এবং সুন্নাহ্‌র মূলপাঠে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেখি যাতে মনে হয়, মানব জাতির যেসব বিষয় নিয়ে আইন কাজ করে তা পুনর্নবায়নযোগ্য। অতঃপর, যখন ঐসব বিষয়ের দৃঢ়করণের প্রসঙ্গ আসে, তখন ওগুলো ব্যাখ্যাত হবে, জানা হবে এবং বুঝা হবে, এমনকি যদিও পূর্ববর্তীগণ ওগুলো ব্যাখ্যা করেছেন তাদের বাস্তব জ্ঞান অনুসরণ না করে।

আমরা এখন যা আলোচনা করছি তার ইঙ্গিত বিশুদ্ধ সুন্নাহ্‌তে রয়েছে। আল-বুখারি ইবনে উমার-এর বাচনিক হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, নবি সা. বলেন : নিশ্চয় আমরা এক নিরক্ষর সম্প্রদায়। আমরা লিখি না এবং গুনিনা। মাসটি [তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন] এরকম ... এবং এরকম, অর্থাৎ কখনও উনত্রিশ দিন এবং কখনও ত্রিশ দিন[১০৪]। আল-মুয়াত্তায় মালিক এটি বর্ণনা করেছেন[১০৫]। আল-বুখারি এবং মুসলিমেও অন্যরা বর্ণনা করেছেন এই ভাষায় : মাস হচ্ছে উনত্রিশ দিনে, সুতরাং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সিয়াম শুরু করো না এবং ভঙ্গ করো না এটা না দেখা পর্যন্ত। যদি তা তোমার জন্য অজ্ঞাত হয়, তাহলে এটার হিসাব করো [অথবা গণনা করো]।

আমাদের প্রাথমিক যুগের বিদ্বানগণ, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, হাদিসের অর্থ ব্যাখ্যায় সঠিক ছিলেন, কিন্তু তারা এটা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেননি। তাদের সমষ্টিগত মতামত আল-হাফীয ইবন হাজার-এর মতামতের ন্যায় [একটা দৃষ্টান্ত][১০৬]; গণনা করা (আল-হিসাব) পরিভাষাটির কাঙ্ক্ষিত অর্থ এখানে তারকাসমূহ গণনা এবং সেইসাথে তাদের গতিবিধি নির্ণয় এবং একটি নিগুঢ়ভাবের উপায় ছাড়া ঐটি সম্পর্কে [মানুষ] জ্ঞানসম্পন্ন ছিল না। সুতরাং

সিয়ামের নির্দেশ এবং অন্য নির্দেশসমূহ তাদের দর্শনের সাথে সংযুক্ত, যাতে করে তারার গতিবিধি জানার ভার তাদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করা যায় এবং সিয়াম পালনের নির্দেশ স্থায়ী হয়েছে, যদিও তাদের কেউ কেউ তারকার চলাচলের জ্ঞান জানতে সমর্থ হয়েছে। তবে নির্দেশের বাহ্যিক শব্দ চয়ন সিয়াম পালনের আদেশকে পুরাপুরি গণনার সাথে সংযুক্ত করাকে নাকচ করে চাঁদ দেখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করছে। সর্বশেষ একটা উদ্ধৃত হাদিসে তাঁর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট : অতঃপর যদি তোমাদের কাছে তা দৃশ্যমান না হয়, তাহলে ত্রিশ-সংখ্যা পূর্ণ করো; তিনি বলেননি তাহলে গণনাকারী লোকদের জিজ্ঞাসা করো। এতে যে প্রজ্ঞা রয়েছে তা এই যে, যখন এটা দৃশ্যমান নয় (দেখা যাচ্ছে না), সেক্ষেত্রে সিয়াম পালনের দিনসংখ্যা সবার জন্য একই হবে যাদের জন্য সিয়াম ফরজ। সুতরাং এটা তাদের [মধ্যকার] মতপার্থক্য ও বিবাদ দূর করছে। ঐ ব্যাপারে একদল লোক ঐ অবস্থানে গিয়েছিল যে, প্রচেষ্টা হওয়া উচিত [তারকার] লোকদের দিকে এবং তারা হচ্ছে রাফিযী[১০৭]। [এ অবস্থার সাথে] তাদের বুঝাপড়া কিছু আইনজ্ঞ মাধ্যমে জানা গেছে। কিন্তু আল-রাজী বলেন, সত্য পন্থী সালাফিদের ঐকমত্য তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। ইবন বাযিযাহ্ বলেন, এটা অসার মতবাদ। তারকা সংক্রান্ত বিজ্ঞানের উপর গবেষণার কারণেই এ আইন বাতিল হয়েছে। কারণ এটা সন্দেহ ও অনুমানমূলক কাজ; সেখানে কোনো অকাট্য নিশ্চয়তা নেই এবং অনুমান [আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিশ্চয়তাপূর্ণ করার ক্ষেত্রে] গুরুত্বকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া, যদি হাদিসের নির্দেশনা জ্যোজির্বিজ্ঞানীদের জন্য] নিষিদ্ধ হয়, তাহলে তা সংকীর্ণতায় আবদ্ধ, কারণ মাত্র কিছু সংখ্যক ব্যতীত [জ্যোতির্বিদ্যা] সর্বজনজ্ঞাত বিষয় নয়।'

এ ব্যাখ্যাটি হাদিসে ঐ দেখার প্রতি বাস্তবিক পক্ষে নির্দেশিত মনোযোগের কারণে এবং তা' হিসাবনিকাশ অভিমুখী নয়। যদি দাবি ঐরকমই হয় তাহলে ব্যাখ্যা প্রমাদপূর্ণ। এমনকি যদি এমন ব্যক্তিই সেখানে থাকার ঘটনা ঘটে যিনি হিসাব জানেন, বুঝার ওপর নিষেধাজ্ঞা থেকেই যায় (অর্থাৎ একাকি দেখার বিবেচনায়)। [এটা প্রমাদপূর্ণ] কারণ মূল কিতাবে বিদ্যমান স্পষ্ট কারণের ওপর একাকি দেখার উপর বিশ্বাস নির্ভরশীল এবং লিখতে ও গণনা করতে না জানা নিরক্ষর (সম্প্রদায়ের) জন্য। এখন, একটি কারণ নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে ইল্লাহ্ ফলাফলের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ চাঁদের গণনা করতে অপারগদের ক্ষেত্রে মা'লুল বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান থাকা। কিন্তু অতঃপর যদি সম্প্রদায় নিরক্ষরতার আবহ্ হতে বেরিয়ে আসে এবং স্বাক্ষর ও গণনায় সমর্থ হয়; আমি বুঝতে চাইছি যদি এর সমাজে এসে থাকে (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের যৌথ জীবনে) ঐ সব লোক যারা বিজ্ঞান জানে; যদি লোকদের জন্য এটা সম্ভব হয় তাদের সাধারণ এবং বিদগ্ধদের জন্য মাস শুরু

হওয়ার গণনায় সুনিশ্চয়তা এবং অকাট্যতা অর্জন সম্ভব হয়; [যদি] এমনটা সম্ভব হয় যে এই গণনায় তাদের বিশ্বাস রয়েছে [একই রকমভাবে যেমন] দেখায় তাদের বিশ্বাসের ন্যায়, বা আরো সরল; যখন এটা তাদের যৌথ জীবনে একটা অবস্থা হয়ে ওঠে এবং নিরক্ষর হওয়ার (ইল্লাহ) কারণ দূরীভূত হয় [ঐ সমাজ হতে] - [তাহলে] এটা [একটা কর্তব্য হয়ে] দাঁড়াবে কেবল গণনার যন্ত্রপাতি দিয়ে [মাস] প্রতিষ্ঠাকে ধারণ করা এবং দেখার জন্য প্রচেষ্টা থাকবে না, কেবলমাত্র ঐ সময় ব্যতীত যখন জ্ঞান গণনার দ্বারা তাদের জন্য দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে - যেমন যখন এমন হবে যে, লোকেরা মরুভূমির মধ্যে রয়েছে অথবা একটা দূরবর্তী গ্রামে এবং এমন অবস্থার যখন গণনাকারী মানুষদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ সংবাদ তাদের কাছে না পৌঁছে।

যার ভিত্তির ওপর কারণ নির্দেশিত হয়েছিল [সেই ইল্লাহ]'র অদৃশ্যমানতার সাথে এটা যদি কর্তব্য হয়, তাহলে গণনাই একমাত্র অবলম্বন হবে, তারপর এটাও একটা কর্তব্য হবে গণনার জন্য [প্রাপ্ত] উপকরণাদি দিয়ে সত্যিকার হিসাবে উপনীত হওয়া। দেখার সম্ভাবনা পরিত্যাগ করাও কর্তব্য হবে যখন এর সম্ভাবনা অবিদ্যমান থাকবে-কারণ সত্যিকার মাসের প্রথম হচ্ছে সেই রাত্রি যখন চাঁদ সূর্যাস্তের সাথেই দৃশ্যের আড়ালে চলে যায়, এমনকি যদিও [এই ঘটনা নিশ্চিত করা হয়] একক দর্শনের সাহায্যে"[১০৮]।

আমার এই মত যে, লোকজনের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে নির্দেশনাতে পরিবর্তন ঘটে যাতে তারা বাঁধা- এটা [আইনবিদদের] অভিমতের উদ্ভাবন নয়। বাস্তবিকপক্ষে এটা সাধারণত : আইনের মধ্যে দেখা যায় জ্ঞানী লোকেরা এটা জানে এবং অন্যরা। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্নের উদাহরণসমূহের মধ্যে [নিম্ন লিখিতটি] আছে : ঐ হাদিস যাতে বলা হয়েছে "এটা যদি তোমাদের কাছে দৃশ্যমান না হয়, তাহলে যা [গণনাকর] মাসকে ত্রিশ দিন গণনা করো"। এই বর্ণনার সারাংশ বিদ্বানগণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন "অতঃপর হিসাব (অথবা গণনাকর)" বিশদ বর্ণনার সাথে এটাকে [যুক্ত করে] বলা যায় "তারপর সংখ্যাপূর্ণকর"। তবে শাফিঈদের মহামতি ইমান - বাস্তবিক তিনিই তার সময় তাদের নেতা ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আবু আল-আব্বাস আহমদ ইবন সুরাইহ্[১০৯] ভিন্ন অবস্থার সাথে দুটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মিলন ঘটিয়েছেন। তাঁর যুক্তি এইযে, তাঁর কথার অর্থ অতঃপর এটার হিসাব (অথবা গণনাকর)", এটা এরকম যে লোকেরা হিসাব বা গণনা করবে চাঁদের পরিক্রমা অনুযায়ী এবং এই আদেশ তাদের উদ্দেশ্যে যাদেরকে আল্লাহ এই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য মনোনীত করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর বাণী অতঃপর

ত্রিশপূর্ণকর" হল সাধারণের জন্য এমন সম্বোধন লোকদের মধ্যে যারা জ্যোতির্বিজ্ঞান জানেন[১১০]।

এখন আমার মতামত কেবল ইবন সুরাইজ-এর মতামতের চোখে চোখ রেখেছে ওইটি ব্যতীত, যেখানে তিনি মাস অস্পষ্ট হলে এটাকে সুনির্দিষ্ট করেছেন, [কারণ এটি কেবল এ ঘটনার ক্ষেত্রে] তিনি লোকের দেখাকে সমর্থন করেন না। এছাড়াও তিনি নির্দেশকে কিছু লোকের গণনা কাজে লাগানোর জন্য গ্রহণ করেছেন; তার সময়ে তাদের ছিল সংখ্যার অতিস্বল্পতা, - যারা জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানবান ছিলেন। তাদের মতামত বা হিসাব নিকাশের অগ্রহণযোগ্যতা এবং একদেশ হতে আরেক দেশে সংবাদ প্রাপ্তির ধীরতা প্রভৃতি কারণেও এটা করতে হয়েছে। আমরা মতামতের কথা বলতে গেলে, এতে সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হিসাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই এবং জনগণের জন্য ওটার সাধারণত্ব এসব দিনে যা সহজ ছিল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন সংবাদ গ্রহণ ও তা প্রচারের গতি। দেখার ওপর নির্ভরযোগ্যতা একেবারেই অল্প কিছু ক্ষেত্রে, তাদের জন্য যাদের কাছে এ সংবাদটি আসে না এবং তারা কোনো উপায় দেখে না মহাশূন্য সংক্রান্ত জ্ঞান এবং সূর্য ও চাঁদের অবস্ত থেকে মাস শুরু করার ব্যাপারে।

আমার এই মতামতকে মতামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সঠিক দেখি এবং এটাকে নিকটতম, মনেকরি হাদিসের সঠিক বুঝের যা এই বিষয়ের ওপর এসেছে[১১১]।

এটা তাই, যা শাইখ শাকির অর্ধ শতাব্দীর বেশি পূর্বে (যুলহিজ্জা, ১৩৫৭ হিজরি, জানুয়ারি, ১৯৩৯) লিখেছিলেন। ঐ সময় জ্যোতির্বিদ্যা দ্রুততার সাথে বিকাশ লাভ করেনি। এটা মানুষকে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে ও চাঁদে অবতরণ করতে সমর্থ করেছে। বিজ্ঞান নির্ভুলতার এমন পর্যায়ে এসেছে যে, একটি হিসাব মতে, এর দ্বারা গণনার ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা এতই কম যে, তা এক সেকেন্ডের শত-সহস্রাংশ!

শাইখ শাকির ওটা লিখেছেন এবং সর্বোপরি তিনি ছিলেন হাদিস ও আছা'র অনুসারী মানুষ। তিনি তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করুন, নবি সা.-এর হাদিস ও সুন্নাহ্র সেবায়। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ সালাফি, অনুসরণ করেছেন, উদ্ভাবন করেননি। তা সত্ত্বেও তিনি সালাফিয়্যাত বুঝতে পারেননি, যেন এটা ছিল অনড়ভাবে সংযুক্ত আমাদের পূর্বেকার সালাফের বক্তব্য অনুযায়ী। বরং সত্যিকার সালাফিইয়াত সেটাই যাতে আমরা তাদের পদ্ধতিকেই পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করি এবং আমরা তাদের স্পিরিটকে আত্মস্থ করি। আমরা আমাদের সময় অনুযায়ী সংগ্রাম করি যেমন তাদের সময় অনুযায়ী তারা সংগ্রাম করেছেন এবং আমরা আমাদের মানসিকতা অনুযায়ী বাস্তবতার কাছে সাড়া দিই, তাদের মন অনুযায়ী নয়,

বন্ধনযুক্ত হই না আইনের সুনির্দিষ্টতার বাঁধন ছাড়া, এর মূলপাঠ বিবেচনা ও এর উদ্দেশ্যের সামগ্রিকতা ছাড়া।

কেবল এতটুকুই নয়, ১৪০৯ হিজরির রমজান মাসে একজন প্রখ্যাত শাইখের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আমি পাঠ করি[১১২]। এতে তিনি নবি সা.-এর একটি সহিহ্ হাদিস উল্লেখ করেন : আমরা একটি অক্ষর জ্ঞানহীন সম্প্রদায়; আমরা লিখি না এবং আমরা হিসাব নিকাশ করি না। তিনি এমন যুক্তি দেখান যে, এটি হিসাব নিকাশকে বাতিল করছে এবং মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে সম্প্রদায়ের। যদি এটা সঠিক হতো, তাহলে হাদিসটি হতো লেখাকে না করার পক্ষের যুক্তি এবং ওটার মর্যাদা নিম্নগামী করা। কারণ, হাদিসটির মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে, যার দ্বারা সম্প্রদায়ের নিরক্ষরতা প্রদর্শন করা হয়েছে- লেখা ও হিসাব নিকাশ। অতীতে কিংবা বর্তমানে কেউ বলেনি যে, তার মতে, লেখা এমন একটি ব্যাপার যা সমাজের জন্য নিন্দনীয়। বরং এটি এমন এক ব্যাপার যার আকাঙ্ক্ষা করা হয়; কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা এটি দেখিয়েছে। যে ব্যক্তি প্রথম লেখা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তিনি ছিলেন নবি সা., যা জানা যায় তাঁর জীবনী হতে এবং বদর যুদ্ধের বন্দীদের প্রতি তাঁর মনোভাব থেকে।

এই বিষয়ে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয় তা এই যে, নবি সা. হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করেননি। তিনি সা. নির্দেশ দিয়েছেন চাঁদ দেখার জন্য এবং মাস গণনার জন্য এটাকে পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। এই মতামতে কিছু ভুল ও বিকৃতি রয়েছে।

প্রথমত : এতে এ ভাব প্রকাশিত হয়নি যে, নবি সা. হিসাবের ওপর নির্ভরতার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সময়ে সমাজ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন, তারা লিখত না, হিসাব নিকাশ করতো না। সুতরাং তিনি এজন্য বিধান দিলেন সময় ও স্থানের সাথে উপযোগী উপায় উপকরণের এবং তা হচ্ছে চাঁদ দেখা যা তাঁর সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের জন্য প্রয়োগযোগ্য পদ্ধতি। তবে, যখন কোনো সংক্ষিপ্ততর উপায় পাওয়া যায়, অধিকতর নিরাপদ এবং ভুল ও প্রক্ষেপণমুক্ত, সেক্ষেত্রে এর দিকে মোড় নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক কিছু সুন্নাহ্‌তে নেই।

দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ্ সন্দেহের ক্ষেত্রে গণনার ওপর কাজ করার জন্য ইঙ্গিত করে যখন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে। জামি' আল-সহিহ্ গ্রন্থের কিতাব আল-সাওম অধ্যায়ে আল-বুখারি তার সুপরিচিত রাবিদের সোনালী সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। এরা হচ্ছে মালিক নাফি হতে, তিনি ইবন উমার হতে, তিনি নবি সা. হতে তিনি রমজানের উল্লেখ করলেন, তারপর বললেন : চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সিয়াম শুরু করো

না এবং সিয়াম বন্ধ করো না এটি না দেখা পর্যন্ত এবং যদি তোমাদের সন্দেহ হয় (এটি স্পষ্ট না হয়), তাহলে মাস গণনা করো[১১৩]।

এই হিসাব বা গণনা হচ্ছে সেটাই যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা সম্ভব যে আদেশের মধ্যে গণনার ওপর নির্ভর করা যুক্ত হয়েছে, তার জন্য যে এটা ভালোভাবে করতে পারে। এটা আদেশের সাথে তাই যোগ করে, যা অন্তরকে স্থির করে ও শান্তি দেয়। এটা তাই, যা আমাদের যুগে এসেছে, সুনির্দিষ্টকৃত জিনিসের শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থাপনায় যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান রয়েছে যুগের বিজ্ঞান এবং মানুষ তার মধ্যে যা পেয়েছে সে সম্বন্ধে, যাকে প্রভু (আল্লাহ তায়ালা) শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

বেশ কবছর ধরে দ্ব্যর্থহীনভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানিক গণনার ব্যবস্থা করার জন্য বলে আসছি, যাতে করে বাস্তবে প্রতিবছর সিয়ামের শুরুতে ও ঈদ আল-ফিতরে বড় পার্থক্য যা দেখা দেয় তা কমে আসে। আমরা চাঁদকে দেখার মাধ্যমে শুরু করার কাজ চালিয়ে যেতে পারি আমাদের যুগের অধিকাংশ আইনবেত্তার মতামতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে। কিন্তু গণনা যদি দেখার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে- যদি এতে বলা হয় এটা অসম্ভব, কারণ প্রকৃতপক্ষে ইসলামি বিশ্বের কোথাও আদৌ চাঁদ ওঠেনি- চাক্ষুস দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক থাকছে না, কারণ বাস্তবে (যা স্পষ্ট গাণিতিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করেছে) তা ওগুলোর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিস্থিতিতে, এটা কোনোমতেই কাম্য নয় যে, আপনি জনসাধারণের সাক্ষ্যকে বিবেচনায় আনবেন, অথবা আইনী আদালত, বা ফতোয়ার জন্য অধিবেশন বা ধর্মীয় বিষয়াদি এমন লোকের কাছে উন্মুক্ত করা হবে, যে চাঁদ দেখা সম্বন্ধে সাক্ষ্য ঘোষণা করতে চায়।

এটাই তাই যাতে আমি সন্তুষ্ট এবং যার সম্বন্ধে অনেক ফতোয়ায় বলেছি শিক্ষাদানের সময় এবং বক্তৃতাকালে। তারপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমি শাফিঈ আইনবিদদের একটি বিরাট লেখার মধ্যে এর সম্বন্ধে মন্তব্য পেয়ে যাই। যার সম্পর্কে লোকেরা বলে, তাকী আল-দীন আল-সুবকী (মৃত্যু : ৭৫৬ হি.) নিশ্চয়ই ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তিনি তার ফতোয়ায় বলেন, যদি চোখে দেখার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়, কাজির কর্তব্য হবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাতিল করা, কারণ গণনা হচ্ছে স্পষ্ট এবং সাক্ষ্য ও সংবাদ হচ্ছে সন্দেহপূর্ণ এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয় স্পষ্টর সাথে বিরোধ করতে পারে না, বিষয়ে সন্দেহপূর্ণ বিষয় অগ্রাধিকার পাওয়া তো দূরের কথা। তিনি বলেন যে, এটা কাজির কর্তব্যের অংশ, সব ব্যাপারে তার সামনে প্রত্যক্ষকারীর সাক্ষ্য নেওয়া। তারপর যদি তিনি দেখেন যে, তাৎক্ষণিক

উপলব্ধি অথবা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা এর বিরোধী, তিনি এটা বাতিল করবেন এবং এর কোনো মূল্য যুক্ত হবে না। তিনি বলেন, প্রমাণের শর্ত সেটা, যা সম্ভব বলে প্রমাণিত- তা ধারণাযোগ্য, যুক্তিসম্মত ও আইনসম্মত। তারপর যদি গণনার প্রমাণ এর অসম্ভাব্যতা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করে, তাহলে অভিমতের অসম্ভাব্যতাই রুলিং (নির্দেশ) হবে, কারণ যা পরীক্ষিত হয়েছে তা অসম্ভব, অনুমোদন যা সম্ভব নয় তা করে না[১১৪]।

গাণিতিক হিসাবের বিপরীতে সাক্ষীর স্বীকারোক্তি সন্দেহযুক্ত বা ভুল হয়েছে বা মিথ্যা বলে ব্যাখ্যাত হতে পারে। আল-সুবকী বা ভুল হয়েছে বা মিথ্যা বলে বলতে পারতেন, যদি তিনি আমাদের সময় বেঁচে থাকতেন এবং দেখতে পারতেন, তা কি জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতি আমরা ওপরে যা উল্লেখ করেছি তার কিছুটা?

শাইখ শাকির তার গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, মহান অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মুস্তফা, শাইখ আল-আজহার যিনি তার সময় বিখ্যাত ছিলেন, যখন তিনি শরিয়াহ হাইকোর্টের প্রধান তখন ছিলেন আল-সুবকীর মতের অনুকূলে, অর্থাৎ সাক্ষীর প্রত্যায়ন বাতিলকরণের পক্ষে যখন গণনা চোখের দেখাকে বাতিল করছে। শাইখ শাকির বলেন : আমি এবং আমরা কয়েক ভাই তাদের মধ্যে ছিলাম যারা মহান অধ্যাপকের অভিমতের বিরোধী। এখন আমি এটা স্পষ্ট করতে চাই যে, তিনি সঠিক ছিলেন। [তিনি যা বলেছেন তার সাথে আমি বাধ্যবাধকতাকে যুক্ত করি, সর্বাবস্থায় গণনা করে নতুন চাঁদকে প্রতিষ্ঠিত করা সেই ব্যক্তি ব্যতীত যার জন্য এর জ্ঞান সাধ্যাতীত[১১৫]।

৬. আক্ষরিক ও আলংকারিক প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

আরবি এমনই এক ভাষা যার মধ্যে আলংকারিক প্রকাশ প্রচুর। আলংকারিক প্রকাশ আক্ষরিক প্রকাশের চেয়ে বেশি কার্যকর বাগ্মিতাপূর্ণ, যেটা অলংকারশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। নবি সা. কথ্য আরবিতে অতীব প্রকাশযোগ্য ছিলেন এবং তাঁর উচ্চারণ ছিল সর্বাধিক উদ্দীপনামূলক। এর পরেও আশ্চর্যের নয় যে, তাঁর হাদিসে বিপুল সংখ্যক আলংকারিক প্রকাশ রয়েছে এগুলোর উদ্দেশ্যের কারণে, সর্বাধিক আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায়।

এখানে আলংকারিক প্রকাশ বলতে বুঝায় যা কিছু আলংকারিক রচনাশৈলী ও মূর্ত প্রতিরূপ- রূপকালংকার, লক্ষ্যার্থ, রূপকাশ্রিত উপমা- সবকিছু যা একটি শব্দে বা বাক্যে এগুলোর তাৎপর্যের বাস্তবতা থেকে দূরে। আলংকারিক প্রকাশ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়, শব্দসমূহের মধ্যে অথবা প্রসঙ্গের মধ্যে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে পশু ও

পাখির জন্য আরোপিত বাক্য বা সংলাপ এবং জড় ও অশরীরি সত্তার কথাবার্তা, যেমনটা এরকম জনশ্রুতি রয়েছে : কাঠ বললো পেরেককে : তুমি কেন চিরছ আমাকে? সে বলল : তাকে প্রশ্ন করো যে আমাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটাচ্ছে! এই প্রতিরূপ ও উপমা যা দেওয়া হয়েছে তা কোনো ভাষ্যে মিথ্যাচার বলে হিসাব করা হয়নি। আল-রাগিব আল-আস্ফাহানী তার মূল্যবান গ্রন্থ আল-যারি'আহ ইলা মাকারীম আল-শারী'আহ (আইনের অত্যুচ্চ উপকরণ) এর মধ্যে বলেছেন : ঐ বাক্যকে জানো, যখন এটা উপমা আকারে চলে কোনো পাঠ [পৌঁছে দিতে] কোনো সংবাদ নয় [অর্থাৎ কেবল তথ্য], তখন বাস্তবে এটা কোনো মিথ্যা নয়। এজন্য যারা সতর্ক তারা যা সেখানে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে নিজেদের দূরে রাখে না। এর একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি একটি বিখ্যাত গল্প উপস্থাপন করেছেন, যাতে একটি সিংহ, একটি শিয়াল ও একটি খেঁকশিয়াল শিকারে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা শিকার করে একটি গাধা, একটি গাজন হরিণ এবং একটি খরগোশ পেল। সিংহ শিয়ালকে বলল : ভাগ করো! শিয়াল বলল : এটা এভাবে ভাগ করা হলো-গাধাটি তোমার, হরিণটি আমার এবং খেঁকশিয়ালের জন্য খরগোশ। এমন বলার কারণে সিংহ শেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ওকে মেরে ফেলল। তারপর সে খেঁকশিয়ালকে বলল : ভাগ করো! খেঁকশিয়াল বলল : ওগুলো এভাবে ভাগ করা হলো : গাধাটি তোমার নাশতার জন্য গাজেন হরিণটি মধ্যাহ্নভোজের জন্য এবং খরগোশটি তোমার রাতের খাবার। সিংহ বলল : এই ভাগাভাগি তোমাকে কে শিখিয়েছে? খেঁকশিয়ালটি বলল : শিয়ালের ওই লালরঙের পোশাকটি!

আল-রাগির আল-আস্ফাহানী বলেন :

> এটা হচ্ছে অলংকারের আলোকে যা কেউ তাঁর [আল্লাহ তায়ালার] কথার ব্যাখ্যায় আনেন, যিনি মহিমাময় (সুরা সাদ, ৩৮ : ২৩)।
>
> এ হচ্ছে আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বী। আরেকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যা অনেক মুফাসসির মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী সম্পর্কে বলেছেন (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৭২)।

আমি আসমান ও পর্বতের প্রতি আমানত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহনে অস্বীকৃতি জানাল, তারা এতে শঙ্কিত হলো। কিন্তু মানুষ সে দায়িত্ব নিল।

কোনো কোনো উপলক্ষে আলংকারিক ব্যাখ্যা মোটামুটি যথার্থ। অন্যথায়, কারো ভ্রমে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একসময় নবি সা. তাঁর সহধর্মিনীদের বললেন: তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে বেশি লম্বা সে সবার আগে আমার সাথে মিলিত

হবে। আয়িশাহ্ বললেন : সুতরাং তারা মাপলেন, তাদের মধ্যে কার হাত সবচেয়ে লম্বা! প্রকৃতপক্ষে কিছু হাদিসে এমন এসেছে যে, তারা বেত দিয়ে মাপলেন কার হাত সবচেয়ে লম্বা! কিন্তু নবি সা. এমনটা ইঙ্গিত করেননি। তিনি 'হাত লম্বা' দ্বারা বুঝিয়েছেন যা দিয়ে ভালো কাজ করা যায় এবং ঠিকমতো অন্যের জন্য ব্যয় করা যায়। স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সা. সাথে যোগদানকারিনী হচ্ছেন যয়নাব কিনতে জাহ্শ- তিনি এমন এক মহিয়সী নারী যিনি তাঁর হাত দ্বারা প্রচুর পরিশ্রম করতেন এবং দানখয়রাত করতেন[১১৬]।

কুরআন ও সুন্নাহ্ বুঝার ক্ষেত্রে এমন ভুল হয়ে থাকে। আদী ইবন হাতিমের ক্ষেত্রে এমন ঘটেছিল যিনি সিয়াম সংক্রান্ত এ আয়াতকে ভুল বুঝেছিলেন :

> সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করো এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত বস্তু খোঁজ করো এবং তোমরা পানাহার করতে থাক যে পর্যন্ত তোমাদের জন্য কালো রেখা থেকে উষাকালের সাদা রেখা প্রকাশ না পায় (সুরা বাকারা, ২ : ১৮৭)।

আল-বুখারি 'আদী ইবন হাতিম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন এই আয়াত নাজিল হলো (এবং খাও ও পান কর), আমি দুটো সুতা খুঁজলাম-একটি কালো ও একটি সাদা। তারপর এ দুটো সুতা আমার বালিশের তলায় রেখে দিলাম। তারপর আমি নিজেকে নিয়োজিত করলাম ঐ দুটো সুতার দিকে দৃষ্টি রাখতে এবং যখন আমার কাছে কালো হতে সাদা স্পষ্ট হলো, তখন নিজেকে বিরত রাখলাম সিয়ামের জন্য। তারপর আমি উঠলাম এবং সকালবেলায় আল্লাহর রসুল সা.-এর কাছে গিয়ে আমি যা করেছি তা বর্ণনা করলাম। তিনি সা. বললেন : তাহলে তোমার বালিশ খুব প্রশস্ত! ঐ আয়াত কেবল দিনের শুভ্রতা নির্দেশ করছে যা পৃথক করার মতো রাত্রির কৃষ্ণ রঙ থেকে[১১৭]। (তাহলে তোমার বালিশ খুব প্রশস্ত-এ কথার অর্থ হচ্ছে, এটা এত প্রশস্ত যে, দুটো সুতা'র স্থান সংকুলান হতে পারে যা এই আয়াতে বলা হয়েছে- এ দুটো হচ্ছে দিনের শুভ্রতা এবং রাত্রির কৃষ্ণতা। সুতরাং তিনি ভাবলেন যে বালিশটি পূর্ব ও পশ্চিমের মতোই প্রশস্ত!)

আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুপরিচিত হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালার বাণী : যদি আমার বান্দা আমার দিকে এক মুষ্ঠি পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই; যদি সে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে চার হাত (এক ফ্যাদম) এগিয়ে যাই; যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি দৌড়ে যাই[১১৮]। মুতাযিলাগণ এই ধরনের আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আহল আল-হাদিসের সাথে মতভেদ করেছে এবং তাদেরকে অভিযুক্ত করেছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এমন

কিছু আরোপ করার জন্য যা তাঁর মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৈহিকভাবে নিকটবর্তী হবেন, হেঁটে বা দৌড়ে এবং এটি তাঁর মর্যাদার জন্য উপযোগী নয়। ইবন কুতায়বা তাঁর তা'বীল মুখতালিফ আল-হাদিস গ্রন্থে এটা খণ্ডন করেন :

এটা নিঃসন্দেহে ঠিক উপমা এবং [আলংকারিক] সাদৃশ্য। এর অর্থ কেবল এটা : যে আমার দিকে অনুগত হয়ে দ্রুত আসে, আমি পুরস্কারসহ তার দিকে আরো দ্রুত এগিয়ে যাই। তারপর এটাকে হাঁটা ও দৌড়ান দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

মহান সত্তার বাণী এর একটি দৃষ্টান্ত :

> আর যারা আমার আয়াতের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালায় (সা'আও) সেগুলোর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য, তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা (সুরা হাজ্জ, ২২ : ৫১)।

ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা (সা'ই) অর্থ হলো, চলার (তাড়াতাড়ি করার) গতি। এটা সর্বদা চলা বুঝায় না। এটা কেবল বুঝায় যে, যারা তাদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্ম নিয়ে ছুটে চলে। আল্লাহ তায়ালাই উত্তমরূপে অবগত[১১৯]।

আমরা দ্ব্যর্থবোধক কিছু হাদিস দেখতে পাই, বিশেষ করে আধুনিক কালের শিক্ষিত মানসে, যখন তা ব্যাখ্যা করা হয় আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী, যেমনটা পৌছান হয়েছে তাদের আক্ষরিক অর্থনির্দেশকভাবে। তবে, যদি সেগুলো তাদের আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হতো, তাহলে দ্ব্যর্থতা দূর হতো এবং কাঙ্ক্ষিত বাহ্যিক অর্থ পরিষ্কার হত। আসুন, আমরা দুই শাইখ বর্ণিত আবু হুরায়রার বাচনিক হাদিসটির দৃষ্টান্ত দেই, তিনি বলেন : জাহান্নাম এর প্রভুর কাছে অভিযোগ করে বলল : হে প্রভু, আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন তিনি (আল্লাহ তায়ালা) একে দুবার শ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন- এক শ্বাস শীতকালে এবং আরেক শ্বাস গ্রীষ্মকালে। এটা হচ্ছে সেই শ্বাস যা তোমরা দুঃসহ [গ্রীষ্মকালীন] তাপে দেখ এবং চরম শীতে দেখতে পাও[১২০]।

আমাদের সময়কার ছাত্ররা ভূগোল পাঠের সময় ঋতুর ভিন্নতা এবং গ্রীষ্ম ও শীতের আবির্ভাব, উষ্ণতা ও শীতলতার কারণ অধ্যয়ন করে থাকে। এগুলো সৃষ্টির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেসব কারণ দ্বারা, যেগুলো ছাত্রদের কাছে সুবিদিত। তারা এটাও জানে যে, সুপ্রমাণিত ও সুপরিচিত কথা হচ্ছে, ভূ-ভাগের কোনো অংশে যখন ভয়াবহ শীত, অন্য স্থানে তখন ভীষণ গরম।

দুই সহিহ্ গ্রন্থে আবু হুরায়রার সূত্রে নবি সা. হতে হাদিস বর্ণিত যে, তিনি বলেন : সৃষ্টিকরা থেকে বিরাম না নেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টকে সৃষ্টি করেছেন। গর্ভ বলল : এটা কি সংযোগ ছিন্ন করার পর তোমার সাথে আশ্রয় নেওয়ার স্থান? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তুমি কি তৃপ্ত নও যে, আমি তোমার সাথে যোগদানকারী একজনের সাথে যুক্ত হব এবং তার সাথে বিচ্ছিন্ন হব, যে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে। গর্ভ বলল : অবশ্যই, হে প্রভু। তিনি বললেন :

> তাহলে এটা তোমার জন্য। তিলাওয়াত করো যদি তোমার ইচ্ছা হয় ক্ষমতা পেলে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (সুরা মুহাম্মদ, ৪৭ : ২২)[১২১]।

কিন্তু গর্ভের কথা বলা (এটা নিকট আত্মীয় বুঝাচ্ছে) এখানে কি আক্ষরিক অথবা আলংকারিক? ভাষ্যকারগণ মতপার্থক্য করেছেন এ বিষয়ে। কাযী আয়ায হাদিসটিকে আলংকারিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন এটা উপমার শ্রেণিভুক্ত। ইবন আবী জামরাহ শারহ মুখতাছার আল-বুখারি গ্রন্থে বলেন, ‘নিকট আত্মীয়দের সাথে যোগদানকারীদের সাথে আল্লাহ তায়ালার যুক্ত হওয়ার অর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হওয়া এক মহানের জন্য রূপক তাঁর আনুকূল্যের এবং তিনি মানুষকে সেই শব্দে সম্বোধন করেছেন যা তারা বুঝতে পারে এবং কেন এটি মহানতম আনুকূল্যের অন্যতম, তা এই যে, সেইজনকে দিতে চাইছেন যে তাঁকে ভালোবাসে, পুনর্মিলন এবং তাঁর নৈকট্য, সে সবকিছুসহ যা সে কামনা করে এবং তাকে সহায়তা করা হচ্ছে যা তাকে খুশি করে এমনকিছু দিয়ে। এর আক্ষরিক ভাব আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত হকের বিচারে একটি অসম্ভব বিষয়, তিনি মহীয়ান গরীয়ান। সুতরাং প্রত্যেকে জানে, ওটা একটা বিশাল আনুকূল্যের আলংকারিকভাবে পরোক্ষ উল্লেখ তাঁর পক্ষ থেকে, তাঁর বান্দার জন্য। একইভাবে, সংযোগ ছিন্ন করার কথা- এটি একটি আলংকারিক পরোক্ষ কথা ঐ আনুকূল্য হতে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়ে।

আল-কুরতুবি বলেন :

> গর্ভ নিয়ে যে প্রকাশ ঘটেছে তাকে আমরা আলংকারিক বা আক্ষরিক যাই বলি কথা একই। অথবা অর্থ যা হবে তা হিসাব নিকাশ বা সাদৃশ্যতার পথে যা হয়। যদি গর্ভ-এর মধ্যে যুক্তি ও কথা বলার কিছু সহজাত বৃত্তি থাকত তাহলে এটা সে এভাবে বলত। এর একটি দৃষ্টান্ত : যদি আমরা এই কুরআন পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম, তাহলে তুমি একে দেখতে ভীত... এবং আরেকটি দৃষ্টান্তে এসব উদাহরণ আমি

মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (সুরা হাশর, ৫৯ : ২১)। এখন এই কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আদেশমূলক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করা; 'গর্ভ' এর বন্ধন [রক্ষার] আদেশের। মহীয়ান ও গরীয়ান তিনি, এটা নাজিল করেছেন তার জন্য আবাস [হিসেবে] যে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে, তারপর তিনি তাকে আশ্রয় দেন এবং প্রবেশ করান তাঁর নিরাপত্তা দিয়ে। যদি এটা ওই রকম হয়, তাহলে যে আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী সে পরিত্যক্ত হয় না। তিনি বলেন : যে প্রত্যুষে প্রার্থনা করে সে আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তায় রয়েছে, যদি আল্লাহ তায়ালা তার কাছ থেকে তার দায়িত্ব থেকে কিছু চান [অর্থাৎ এমন কিছু যা সে করতে ব্যর্থ] তিনি তাকে ধরে রাখেন, তারপর তিনি তাকে ফেলে দেন উপুড় করে আগুনের মধ্যে। মুসলিম এর উৎস সন্ধান করেন এবং বর্ণনা করেছেন।

আমার অভিমত হচ্ছে এখানকার ব্যাখ্যার ধরণ হচ্ছে হাদিসটি আলংকারিক হিসাবে গ্রহণ করে, দ্বীনের ক্ষমতা হ্রাস করে না, শর্ত এই যে, এটা গৃহীত হয় কৃত্রিমতা ও খামখেয়ালি ব্যতীত এবং এরকম উপস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে, আক্ষরিক থেকে আলংকারিকে যাওয়ার জন্য। কেবল যখন মূলপাঠে পাওয়া অর্থ পরিষ্কার যুক্তি, অথবা আইনে যা সঠিক, অথবা জ্ঞানে সুনিশ্চিত বিষয়, অথবা বাস্তবতায় যথার্থ এমন কিছু দ্বারা বাতিল হয়, এটা বাতিল করে আক্ষরিক অর্থের অভিপ্রায় অনুসরণে।

এখানে মতপার্থক্য দেখা দেয় এমন একটা ক্ষেত্রে, আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ কি নিষিদ্ধ হয়েছে, না হয়নি? এমন কিছু যা এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অসম্ভব বলে গণ্য হয়েছে, অন্য আলেমগণ তা সম্ভব বলে গণ্য করতে পারেন। এটা এমন বিষয় যা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও অধ্যয়ন দাবি করে। ব্যাখ্যার জন্য (আক্ষরিকতা হতে দূরে) ভালো যুক্তি ছাড়া, অসমর্থনযোগ্য, স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়; অন্যদিকে একটা বক্তব্যকে আক্ষরিকভাবে বলা, যখন সেখানে এমন কিছু বিদ্যমান যা যুক্তির বা আইনের বা জ্ঞানের বা বাস্তবতার নিরিখে নিষেধাজ্ঞামূলক, তা ও গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে আলংকারিক করার প্রয়াসকে বাতিলকরণ হচ্ছে একপ্রকার পরীক্ষা বা অভীক্ষা লোকদের মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য, তাদের জন্য ইসলাম সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান বিশুদ্ধ, ঐতিহ্যগত ও স্পষ্ট এবং যুক্তিসংগত বিষয়ের মধ্যে তারা কোনো বিরোধ খুঁজে পায় না। আসুন, আমরা ইবনে উমারের বাচনিক দুই শায়খ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি পাঠ করি, যিনি বলেন যে, আল্লাহর রসুল সা. বলেন : যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে আর জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন

মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জবাই করা হবে, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান জানিয়ে বলবে : হে জান্নাতের অধিবাসীগণ, আর কোন মৃত্যু নেই; হে জাহান্নামের বাসিন্দাগণ, আর কোন মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতের লোকদের আনন্দ ও উল্লাস বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামের লোকদের দুঃখ ও পরিতাপ বেড়ে যাবে[১২২]। শাইখানের এবং অন্যান্যদের বর্ণনানুযায়ী আবু সাঈদ রা. এর হাদিসে রয়েছে : মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে একটা চিত্রবিচিত্র ভেড়ার আকৃতিতে...[১২৩]।

এই হাদিস থেকে একজন কী বুঝবে কিভাবে মৃতকে জবাই করা যেতে পারে, কিভাবে মৃত মৃত্যুবরণ করে?

আবু বাকর ইবন আল-আরাবি নিশ্চয়ই এই হাদিস থেকে বিরত ছিলেন। তিনি বলেন, এই হাদিসটিকে সন্দেহপূর্ণ গণ্য করা হয়েছে, অবধারিত ভাবের বিরোধিতার কারণে। কারণ হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য এবং গুণ দেহাকারে পরিবর্তিত হয় না। তাহলে কিভাবে মৃত্যুকে হত্যা করা যায়?

একদল এই হাদিসের বিশুদ্ধতাকে সর্বোতভাবে অস্বীকার করেন এবং তা বাতিল করেন এবং একদল অনুযায়ী এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যে তারা বলেন : এটা হচ্ছে উপমার আকারে এবং এখানে জবাই করা আক্ষরিক অর্থে নয়।

এবং আর একটি দল বলেন : বরং যবাই করাকে আক্ষরিকভাবে বোঝতে হবে এবং যে জবাই করেছে সে মৃত্যু সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং লোকদের সবাই তাকে চেনে এবং সে সেই সত্তা যাকে আত্মাগুলোকে বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল-ফাতহ্ গ্রন্থে ইবন হাজার বলেন : পরবর্তী কিছু লোক এটা অনুমোদন করেছেন। তিনি আল-মাযিরী থেকে তার মতামত প্রকাশ করেন : আমাদের মতে মৃত্যু হচ্ছে একটি বৈশিষ্ট্য। মুতাযিলাদের মতে, এর অর্থ নেই। উভয় মতবাদ অনুযায়ী এটা বলা সঠিক নয় যে, মৃত্যু একটি ভেড়া বা অন্যকিছু দেহবিশিষ্ট হতে পারে এবং এটার অভিপ্রায় হচ্ছে রূপক ও উপমার আকারে বর্ণনা। তারপর তিনি বলেন : নিশ্চয়ই বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা জীবন সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি একই বস্তুকে জবাই করেছেন, অতঃপর এটাকে একটি দৃষ্টান্ত করেছেন যাতে মৃত্যু জান্নাতী লোকদের ওপর না আসে।

আল-কুরতুবি এটার মতো করে বর্ণনা করেছেন আল-তাযকিরাহ গ্রন্থে। এসব ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য বিশ্লেষণের থেকে দূরে, কারণ সহজ যুক্তিতেই এর আক্ষরিক ভাব বিপরীতমুখী, যেমন ইবন আল-আরাবি বলেছেন এবং এটা হচ্ছে হাদিসটিকে অস্বীকৃতির এবং এটা বাতিলকরণের শুরু। কিন্তু অনেকগুলো সূত্র থেকে এটা

প্রতিষ্ঠিত যে, অনেক সাহাবি থেকে এটা সহিহ্ সূত্রে বর্ণিত। সুতরাং এটাকে বাতিল করার ব্যাপারটি তাড়াহুড়োর একটি কাজ এবং এর ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে বাতিল করাও।

আল-ফাত্হ গ্রন্থে ইবন হাজার বক্তার মতামতকে চিহ্নিত করেননি বলে জানিয়েছেন, যিনি বলেন : আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গুণকে বস্তুর রূপ প্রদানে কোনো বাধা নেই, তাদের জন্য নির্দিষ্ট বস্তু নির্ধারণেও; যেমনটা সহিহ্ মুসলিম-এর একটি হাদিসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : নিশ্চয়ই [কুরআনের সুরা সমূহ] আল-বাকারাহ এবং আলে ইমরান আসবে এমনভাবে যেন এরা দুটো মেঘখণ্ড এবং হাদিসসমূহের মধ্য থেকে এর মতো[১২৪]।

এটাই সেই অভিমত যা শাইখ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির তাঁর মুসনাদের তাখরীজ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল-ফাতহ্ গ্রন্থ থেকে এই হাদিস সম্পর্কে ইবন আল-আরাবির সন্দেহ এবং এর ব্যাখ্যা বর্ণনার পর তিনি বলেন :

অদৃশ্য সম্পর্কে এসব বোঝা ও সীমালঙ্ঘন, যে অদৃশ্য আল্লাহ তায়ালা কেবলমাত্র তাঁর নিজের জ্ঞানের অধিকারভুক্ত করেছেন। যা এসেছে এবং যেভাবে এসেছে তার ওপর বিশ্বাস রাখা ব্যতীত আমাদের তা অস্বীকার করার কিংবা ব্যাখ্যা করার কোনো দায়িত্ব নেই। এই হাদিসটি সহিহ্। আল-বুখারির মতে, আবু সাঈদ আল-খুদরী এবং আবু হুরায়রার হাদিস যা ইবনে মাজাহ্ ও ইবন হিব্বান সংকলন করেছেন তার দ্বারা এর অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত [বস্তু বা শক্তি] যা বস্তুর পেছনে থাকে তা এর সম্পর্কে অবগত করে না, যেমন আমাদের মন পৃথিবীর ওপর শরীর দ্বারা সীমাবদ্ধ। বরং মানুষের মন এমন যা [ইতোমধ্যেই পর্যাপ্তভাবে] শরীরী বাস্তবতা দ্বারা বিস্ময়করভাবে পরিপূর্ণ যা তাদের তথ্যগত সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে। অতএব, কেন তারা তাদের [মনের] ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বের বিষয়াদি বিচারে উদ্যত হবে? এখানে আমাদের সময় আমরাই প্রথম বস্তুর শক্তিতে রূপান্তর সম্পর্কে জানতে পেরেছি, একটি বা অন্যটির বাস্তবতা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও- এবং আমরা জানি না পরকালে কি হবে। আমরা জানি যে, মানবিয় যুক্তি অভাবী ও অপূর্ণ এবং আমরা জানি না বস্তু কি বা শক্তি কি এবং গুণ ও পদার্থই বা কি, ঐ সমস্ত গতানুগতিক পরিভাষা ছাড়া যা বাস্তবতার কাছাকাছি [যা এগুলো চিহ্নিত করে]। সুতরাং মানুষের ভালো কিছু যা করা উচিত তা এই যে, তার ইমান থাকবে এবং সৎ আমল করবে, তারপর অদৃশ্য বিষয়াদি অদৃশ্যের জ্ঞানীর জন্য নির্ধারিত রাখবে- যাতে সে পুনরুত্থান দিবসে রক্ষা পেতে পারে।

> বলো, সমুদ্রগুলো যদি আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হওয়ার পূর্বেই

সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমি যদি এর সাহায্যের জন্য এর অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি তবুও (সুরা কাহাফ, ১৮ : ১০৯)[১২৫]।

শাইখের আলোচনা, আল্লাহ তায়ালা তাকে দয়া করুন, অদৃশ্য বিষয়ের নির্দেশনায় মূল পাঠের ব্যাখ্যা অস্বীকৃতির প্রতিবাদে শক্ত ভিত্তির ওপর ও সন্দেহের উর্ধ্বে স্থাপিত। তবে, এই প্রসঙ্গে, ব্যাখ্যা থেকে হাদিসের মূল পাঠ বিয়োজন বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এখানে, ব্যাখ্যা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ যুক্তি ও ঐতিহ্য যেসব সুনিশ্চিত সুবিদিত বিষয়ে একমত, তা হচ্ছে মৃত্যু- যা মানুষকে জীবন থেকে পৃথক করে, তা একটা ভেড়া বা ষাঁড়ের মতো বা অন্য কোনো পশুর মতো নয়। বরং এটা অশরীরী বাস্তবতাসমূহের অন্যতম, একটা বৈশিষ্ট্য, যেমনটা পূর্বেকার আলেমগণ এটাকে উপস্থাপন করেছেন। উপমা ও রূপকের শিরোনাম ছাড়া অশরীরী দেহগতভাবে রূপান্তরিত হয় না, যা অশরীরী ও মানসিক বাস্তবতাকে (কিছুটা উপলব্ধি যোগ্য) রূপ প্রদান করে। এটাই আধুনিক মেজাজসম্পন্ন মনের সাথে অধিকতর খাপ খেতে পারে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

হাদিসে নির্দেশনাজ্ঞাপক আলংকারিকতা

তথ্য সরবরাহকারী ও নির্দেশ প্রদানকারী হাদিসসমূহে আলংকারিকতার প্রকাশ ঘটে থাকে। ফিকহ'র লোকদের কর্তব্য হচ্ছে, এর প্রতি সজাগ থাকা এবং অন্যদেরকে এর প্রতি সজাগ রাখা। একজন মুজতাহিদের জন্য যেসব শর্ত লোকেরা আরোপ করেছে তা এই যে, তিনি আরবিতে সুশিক্ষিত, এর বিভিন্ন যুক্তি ও প্রমাণ বুঝার ব্যাপারে জ্ঞানসমৃদ্ধ হবেন, যেভাবে নবি সা. ও সাহাবিদের সময়ে বিশুদ্ধ আরবিতে তা বুঝা হতো। কেউ কেউ প্রকৃতিগতভাবেই ভাষা জানতেন, কেউ অধ্যয়নের মাধ্যমে, যেমন পুরান বেদুঈন বলেছিল আমি কোনো ব্যাকরণবিদ নই যার জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ আছে, বরং আমি প্রকৃতিগতভাবে সে, যে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে।

আলংকারিক ও আক্ষরিকের মধ্যকার পার্থক্যকে উপেক্ষা করলে অনেক ভুল দেখা দেয়; যেমন আমরা ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখি যারা আমাদের সময় দ্রুত ফতোয়া দেন, নিষিদ্ধ ও বাধ্যতামূলক বলে ব্যবস্থাপত্র দেন, অন্যদের বিরুদ্ধ মত বা সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেন, এমনকি কখনও অন্যদের অবিশ্বাস সম্পর্কে, মূলপাঠ অনুযায়ী যদি তারা ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবল হয় তাতে যুক্তির সহজতা ও স্পষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও।

কিছু সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব মহিলার সাথে পুরুষের মুসাফাহা বা করমর্দনের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার প্রমাণস্বরূপ যে হাদিসটি উল্লেখ করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা

যায়। এটা আল-তাবারানি বর্ণনা করেছেন, তোমাদের কারো লোহার সুচ বিদ্ধ হওয়া অননুমোদিত রমনীকে স্পর্শ করার চেয়ে উত্তম[১২২]। আল-আলবানি এই হাদিসটিকে হাসান ঘোষণা করেছেন আমাদের গ্রন্থ আল-হালাল ওয়া আল-হারাম এর সমালোচনায় এবং তার সহিহ আল-জামি আল-সাগীরের মধ্যে। সাহাবায়ে কিরাম ও তাদের শিষ্যদের সময়ে এই হাদিসটি সুপরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও যদি আমরা এর হাসান হওয়া মেনে নিই, তাহলে এর শব্দচয়নে দেখা যায় যে, হাদিসটি করমর্দন নিষিদ্ধকরণে শর্তারোপ করে না, কারণ কুরআন ও সুন্নাহ্র ভাষায় স্পর্শ করা (আল-মাস) কেবল এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্যকে স্পর্শ করা বোঝায় না। এখানে কুরআনের ভাষ্যকার ইবন আব্বাস আল-মাস'র যে অর্থ তুলে ধরেছেন, তা হলো : কুরআনে আল-মাস (স্পর্শ করা), আল-লামস (অনুভব করা, হাতড়ান), আল-মুলামাসাহ (সংস্পর্শ, যৌন সম্ভোগ) হচ্ছে যৌন মিলন কাজের নামকরণের বিভিন্ন উপায়। কারণ নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তায়ালা তার মহান শালীনতায় সেটাই উল্লেখ করেছেন যা তাঁর অভিপ্রায়। এটা এমনকিছু যা এই আয়াতের দৃষ্টান্তে অন্য কোনোভাবে বুঝা যাবে না :

> হে ইমানদারগণ! যদি তোমরা মুমিনা নারীদেরকে বিবাহ করো এবং স্পর্শ করার (তামাসসুহুন্না) পূর্বে তাদেরকে তালাক দাও, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য তোমাদেরকে কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না (সুরা আহযাব, ৩৩ : ৪৯)।

এখন কুরআনের সকল মুফাসসির ও আইনবিদ (যাহিরীগণ বাদে) স্পর্শ করা (আল-মাস) কে অন্তঃপ্রবেশ (আল-দাখুল) হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তারা এটাকে পুরো নির্জন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করেছেন, কারণ এটাই হচ্ছে এ কাজের জন্য সম্ভাব্য অবস্থা। স্পর্শের (আল-মাস) পূর্বে তালাক প্রদান সম্পর্কিত সুরা আল-বাকারার একটি আয়াত এর উদাহরণ, অর্থ হচ্ছে যৌন সম্পর্কের (আল-দাখুল) পূর্বে। মারইয়ামের আ. বাচনিক কুরআনের বক্তব্য এই অর্থকে প্রত্যায়ন করে :

> কিভাবে আমার সন্তান হবে, যখন কোনো মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি (লাম ইয়ামসাসনি) (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৪৭)?

প্রকৃত পক্ষে এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ্তে অনেক প্রমাণ রয়েছে।

সুতরাং এই হাদিসে সামান্য করমর্দন নিষিদ্ধকরণকে বৈধ করার মতো কিছু নেই, যাতে এর পেছনে কোনো কামনা নেই, কোনো ভয় নেই, যাতে ফিতনার কোনো

কারণ দেখা দিতে পারে। এটা বিশেষত সেসব ক্ষেত্রে যখন এর প্রয়োজন রয়েছে, যেমন সফর হতে ফিরে আসার পর, বা অসুস্থতাকালীন চিকিৎসা, বা বন্দীদশা হতে পলায়নের পর এবং এমন যেসব অবস্থা মানুষকে মোকাবেলা করতে হয়। যে কেউ এটা সমর্থন করবে যখন নিকটজনেরা পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, যখন কোনো লোক তার চাচা/মামার স্ত্রী বা কন্যার সাথে করমর্দন করতে চায়, বা অন্য কোনো ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সাথে। বিশেষত এটা এমনই যখন সে তার কাছে অযাচিতভাবে আসে এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সে তার অন্তরে কোনো ভীতি অনুভব করে না বা তার (স্ত্রীলোক) মধ্যে কামনার কোনো গন্ধ থাকে না।

একটি হাদিস এর প্রত্যায়ন করে যা আহমাদ ইবন হাম্বল তার মুসনাদে আনাস রা. হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : মদিনায় ক্রীতদাসীদের মধ্যে একটি ক্রীতদাসী ছিল, আল্লাহর রসুল সা. তাকে হাত দিয়ে উঠালেন এবং তিনি সা. তার থেকে হাত সরালেন না, যতক্ষণ না সে তাঁর সা. সাথে তার ইচ্ছামতো স্থান পর্যন্ত গেল। আল-বুখারি এটিকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন : মদিনার ক্রীতদাসী মহিলাদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী মহিলা ছিল, সে রসুল সা.-এর হাত ধরল; তারপর সে যতদূর ইচ্ছা তাঁর সা. সাথে হেঁটে গেল। এই হাদিসটি তাঁর সা. নম্রতা, সৌজন্যবোধ এবং কোমলতার সীমা প্রদর্শন করে। যদিও সে ছিল একজন ক্রীতদাসী নারী, সে তাঁকে সা. তাঁর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল এবং তাঁর সা. সাথে কথা বলছিল মদিনা শহরের রাস্তা ধরে, যাতে তিনি সা. তার কিছু নির্দিষ্ট অভাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ছিলেন বিনয়ের চূড়ান্ত এবং মহত্তম চরিত্রের, তিনি সা. তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার অনুভূতিতে আঘাত করতে চাননি। বরং তিনি তাকে ছায়া দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় সে তার প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তিপূর্ণভাবে শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর সাথে হেঁটে চলেছেন। আল-বুখারির এই হাদিস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবন হাজার বলেন : এই হাত দিয়ে ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর প্রয়োজনীয় প্রয়োগ এবং ওটা এর প্রদর্শন হচ্ছে ভদ্রতা ও খুশি করার আগ্রহ। এর মধ্যে আরো সংযুক্ত হয়েছে বিনয়ের পরম পর্যায়। কারণ এটার উল্লেখ একজন মহিলার ক্ষেত্রে, পুরুষের নয়; একজন দাসী মহিলার জন্য, আজাদ মহিলার জন্য নয়। অধিকন্তু এই বাক্যাংশ দ্বারা দাসী মহিলাদের মধ্য থেকে যেমন সে যে কোনো দাসী-মহিলা হতে পারত এবং যেখানে সে ইচ্ছা করেছিল অর্থাৎ যেকোনো স্থানে। হাত দিয়ে ধরা এর প্রকাশ মহিলার জন্য অনুমোদিত ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবস্থা নির্দেশ করে, ঐ পর্যন্ত যাতে সে তাঁকে সা. যেকোনো স্থানে চালিত করতে পারে এমনকি যদি তার প্রয়োজন থাকত মদিনার বাইরে যাওয়ার। তাঁর সা. সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল তার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তিনি সা. সাহায্য করেছেন

[যতক্ষণ সে ধরে রাখার প্রয়োজনবোধ করেছিল ততক্ষণ তাঁর সা. হাত ছাড়িয়ে না নিয়ে] এবং এটাই হচ্ছে তাঁর সা. বিনয়ের শিষ্টাচারের বিশেষত্ব এবং সব ধরনের গর্ব অহংকার থেকে তাঁর সা. মুক্তি[১২৭]।

ইবনে হাজার (রহ.) যা বর্ণনা করেছেন, সামগ্রিকভাবে তা মোকাবেলাযোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি করুণা করুন। তবে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার আক্ষরিক অর্থ থেকে এর পরিবর্তন ওই দিকে যা কেবল আরোপিত বুঝায়, যেমন ভদ্রতা এবং সন্তুষ্ট করার আগ্রহ, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এ জন্যই যে, শব্দের আক্ষরিক ও ভাগবগত, উভয় অর্থ এক সাথে বুঝানো হয়। আক্ষরিক অর্থ হতে ঘুরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কিছু প্রমাণ ও সংশ্লিষ্টতাদৃষ্টে আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে, আমি এটার নিরোধক কিছু দেখি না। বাস্তবিকপক্ষে, ইবন হাম্বল'র উক্তি- এবং তিনি সা. তার হাত হতে তাঁর সা. হাত ছাড়িয়ে নেননি, যতক্ষণ না সে তাঁর সা. সাথে তার ইচ্ছামতো গন্তব্যে পৌঁছাল- স্পষ্টতই দেখাচ্ছে আক্ষরিক অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং এটা গ্রহণ না করা মানে, এক ধরনের চাতুর্য।

আলংকারিকের জন্য দরজা বন্ধ করার বিপদ

হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে আলংকারিক প্রকাশের দরজা বন্ধ করা এবং মূল হাদিসের প্রাথমিক (আক্ষরিক) অর্থে এসে থেমে যাওয়া, সুন্নাহ্ বুঝার ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষিত সমসাময়িকের জন্য অন্তরায় হয়েছে, এমনকি ইসলাম বুঝার ব্যাপারেও এবং তাদেরকে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের মুখোমুখি করেছে, যদিও তারা বক্তব্যকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে। এক সময় তারা আলংকারিক অভিব্যক্তিতে এমন কিছু পায় যা তাদের রুচি তৃপ্ত করে না এবং যা তাদের শিক্ষা অসমর্থন করে এবং তারা এই অতৃপ্তি দূর করার জন্য ভাষার যুক্তিবিদ্যা এবং দ্বীনের স্তম্ভ অনুসরণে পথ বের করে না।

একইভাবে, ইসলামের কিছু শত্রু প্রায়ই এসব প্রাথমিক (আক্ষরিক) অর্থ বিকৃত করে, ইসলামের এসংক্রান্ত উপলব্ধিকে হাস্যস্পদ করার উদ্দেশ্যে এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক চিন্তার সাথে এগুলোর (প্রচ্ছন্ন) বিরোধ উসকে দেওয়ার জন্য। অনেক বছর ধরে একজন বৈরী খ্রিস্টান কিছু হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে সংস্কারে বিশ্বাসের ইসলামি চিন্তাধারাকে আক্রমণ করে বসেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত যা আল-বুখারি এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন : জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের উত্তাপ, সুতরাং একে পানি দ্বারা ঠাণ্ডাকরো[১২৮]। বিদ্বিষ্ট সমালোচক বলে : জ্বর জাহান্নামের কোনো উত্তাপ নয়, বরং এটা পৃথিবীর উত্তাপ। এর মধ্যে যা রয়েছে তা হলো কিছু ময়লা আবর্জনা, যা জীবানুর জন্মাতে সাহায্য করে।

এই সমালোচক একজন মূঢ় ব্যক্তি কিংবা মূঢ়তার ভানকারী, মূর্খ কিংবা মূর্খতার ভানকারী এই হাদিসের আলংকারিক অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি আরবির স্বাদ বুঝে, সেই এটা বুঝে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, আমরা খরতাপের দিনের কথা বলি- এই খরতাপ জাহান্নাম থেকে বের হয়-বক্তা ও শ্রোতা এই অভিব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত অর্থ বুঝতে পারে।

কালো পাথর জান্নাত হতে-এর অর্থ

একজন অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তি (মাহসূবীন) এ হাদিস- "কালো পাথর জান্নাত থেকে[১২৯] এর ব্যঙ্গ করে ইসলাম সম্পর্কে লিখেছে এবং আরেকটি হাদিস নিংড়ান খেজুর জান্নাহ থেকে[১৩০] সম্পর্কে। এই লেখক এসব প্রকাশ ও উপমার উদ্দেশ্যগত অর্থ উপেক্ষা করেছে। একই রকম প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় ঐকমত্যভিত্তিক এই হাদিসে : জেনে রেখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে[১৩১]। সে বুঝে যে, কেউ বুঝে না বা কল্পনাও করতে পারে না যে, জান্নাত আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুত করে রেখেছেন পুণ্যবান ও আল্লাহ তায়ালা ভীরু লোকদের জন্য এবং যার বিস্তৃতি তিনি করেছেন আসমান ও জমিনের মাঝে ব্যবধানের সমান, তা সত্যিকারভাবেই তরবারির ছায়ার নিচে। কেউ কেবল এতটুকুই বুঝে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জিহাদ (এবং তরবারি একে প্রতীকীকরণ করে) হচ্ছে জান্নাতের নিকটতম রাস্তা এবং বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন জান্নাতে অবস্থানকে শহীদের পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তাঁর সা. বক্তব্য ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে নিজেকে জিহাদে উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিল এবং তার অভাবী মাকে অন্য একজনের পরিচর্যায় রেখে এসেছিল : তাঁর কাছে যাও, নিশ্চয়ই জান্নাত তার পায়ের তলে[১৩২]। যার বোধ রয়েছে সে বোঝে যে, জান্নাত আক্ষরিক অর্থে মায়ের পায়ের তলে নয়। সে কেবল এটাই বুঝে যে, মায়ের প্রতি আনুগত্য এবং তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে প্রশস্ততম দরজাসমূহের একটি, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। এটা ঐ পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, যে একদিন তার ভাইদেরকে পেছনে ফেলে এসেছিল। তাই তারা তাকে ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল : আমি জান্নাতের একটি চারণভূমিতে আমার এলাকা পরিষ্কার করছিলাম; কারণ আমাদের কাছে এ বাণী পৌছেছে যে, জান্নাত মায়ের পদতলে! তার ভাইয়েরা ওটি ছাড়া ভিন্নতর কিছু বুঝল না যে, সে তার মায়ের সেবা ও তার পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল, যা থেকে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর জান্নাতের নিশ্চয়তার আকাঙ্ক্ষা করা যায়।

হাদিস : নীল ও ফোরাত নদী জান্নাত থেকে

মুস্তাফা আল-যারকা, আমাকে বলেছেন যে, আধুনিক ধনাত্মক আইনের একজন অধ্যাপক যিনি মিসরের অতি শিক্ষিতদের একজন, প্রকৃতপক্ষে আরব জগতের

একজন। তিনি একদিন তাকে বলেন যে, তিনি সহিহ আল-বুখারি গ্রন্থটি কিনেছেন, তারপর একসময় এটা খুলেছেন এবং তার বিস্ময় একটি হাদিসের বিষয়ে যাতে বলা হয়েছে : নীল ও ফোরাত নদী জান্নাতের নদীসমূহের অন্যতম। শিক্ষিত ব্যক্তিটি দেখেছেন বাস্তবতার সাথে এটি মেলে না। কারণ এ দুটি নদীর উৎস সকল ছাত্রের কাছেই সুবিদিত এবং ওদুটি পৃথিবী হতে উৎসারিত, জান্নাত থেকে নয়। এজন্য তিনি আল-বুখারির গ্রন্থের বিরোধিতা করেছেন, এর পুরোটার এবং তারপর থেকে এর পাতা উল্টাবার কথা ভাবেননি। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে সন্দেহ, যা তার মাথায় ঢুকে গেছে। কারণ যদি তিনি কিছুটা হলেও বিনয়ী ব্যবহার করতেন এবং আল-বুখারির কোনো ভাষ্যকারের দ্বারস্থ হতেন, অথবা তার সমসাময়িক প্রখ্যাত আলেমদের কাউকে জিজ্ঞাসা করতেন, তাহলে সত্যতা তার চোখে দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রতিভাত হতো। কিন্তু অহংকার ও ঔদ্ধত্য বাস্তবতা উপলব্ধির পথে সর্ববৃহৎ পর্দা টেনে দেয়।

আমি মনে করি ইসলামি সভ্যতার নেতাদের একজনের মতামত উল্লেখ করা উচিত। যেমন আবু মুহাম্মদ ইবন হাযমের এই হাদিসটির অর্থ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার উপলব্ধি। আমি ইবনে হাযমকে কেবল এজন্য নির্বাচিত করেছি, কারণ তিনি যেমন সুপরিচিত, তেমনি যাহিরী আইনবিদ। তিনি মূল বর্ণনার বর্ণায়নে এবং এগুলোর আক্ষরিক (প্রকাশ্য) অর্থ গ্রহণে বিশ্বাস করতেন। অন্তর্নিহিত কারণ এবং অন্যান্য বর্ণনার সাথে সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আরবি ভাষার আক্ষরিক ও আলংকরিক উভয় অর্থই রয়েছে। এই সহিহ হাদিস সিহান ও জিহান এবং নীল ও ফোরাত হচ্ছে জান্নাতের নদীসমূহের অন্তর্ভুক্ত,[১৩৩] এবং এই হাদিস আমার বাড়ি ও আমার এই মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের আঙিনাসমূহের একটি,[১৩৪] উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেন : এই হাদিসের অর্থ তেমন নয় যা মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, আঙিনা জান্নাত থেকে কেটে আনা কিছু [আক্ষরিকভাবে, এর একটি টুকরা] এবং নদীগুলো জান্নাত হতে উৎসারিত। এটা বাতিল ও মিথ্যা। তারপর ইবন হাযম ব্যাখ্যা করেন যে, ঐ স্থানটির (নবি সা.-এর বাড়ি ও মিম্বারের মধ্যবর্তী) জান্নাতের একটি টুকরা হওয়ার অর্থ হচ্ছে কেবল এর গুণের পরোক্ষ উল্লেখ, এর মধ্যকার দুয়া যা জান্নাতের অভিমুখী। একইভাবে, নদীসমূহ তাদের উপকারিতার হিসেবে আলংকারিকভাবে জান্নাতের সাথে সংযুক্ত। একইভাবে কেউ ভালো দিনগুলো সম্বন্ধে বলে, এটা হচ্ছে জান্নাতের দিনগুলোর মধ্য থেকে এবং একপাল ভেড়া সম্বন্ধে বলা হয়, এগুলো জান্নাতের পশু। তেমনি আরো যা তিনি সা. বলেন, নিশ্চয়ই জান্নাত তরবারির ছায়াতলে; আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই হাদিস, কালো পাথর জান্নাত থেকে। এসব বর্ণনা সম্পর্কে ইবন হাযম বলেন,

এই প্রমাণ কুরআন থেকে স্পষ্ট এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও, তা এই যে এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বুঝলে চলবে না[১৩৫]।

এটাই ছিল ইবন হাযমের অবস্থান, যিনি যাহিরী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ এবং হাদিসের আক্ষরিক উপস্থাপনায় তার নীতি হচ্ছে কঠোরতর। এতদসত্ত্বেও, তার মতে, যথাযথ হবে না এই হাদিসগুলোকে এদের আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করা, ঠিক যেমন তিনি বলেছেন- কেবল মূর্খ লোকেরাই মনে করে, যে ওগুলোকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়!

আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগের সীমানার বিরুদ্ধে

আমি এখানে সতর্ক করব যে, হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিপদ রয়েছে (এগুলো সাধারণভাবে মূল পাঠের) এবং এগুলোর সমালোচনার ক্ষেত্রেও, তাদের আক্ষরিক অর্থ থেকে বিচ্যুতিতে/যুক্তি বা ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ হতে। কোনো শিক্ষিত মুসলিমের জন্য এর ভেতর প্রবেশ করা প্রশংসনীয় নয়, যতক্ষণ না ঐরকম বিষয়ের নেহাৎ প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রায়ই হাদিসকে এদের প্রকাশের থেকে পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়, এগুলোর বিশেষত্ব বা উপলক্ষকে দূরে রেখে। তারপর খুঁতখুঁতে গবেষকের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে এদের আক্ষরিক অর্থে উপস্থাপনই।

আমি দৃষ্টান্তের পথ ধরে উল্লেখ করি এই হাদিস যে কেউ পান্থপাদপ গাছ কর্তন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার মাথা আগুনে রাখবেন[১৩৬]। এটা প্রায়ই ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হয়। কিছু ভাষ্যকার ব্যাখ্যা দেন যে, কর্তনের কাম্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র পান্থপাদপ গাছ (সিদ্‌র আল-হারাম) এই বাস্তবতা সত্ত্বেও। যে বলা যায় এখানকার শব্দ, (সিদরাহ্) প্রসঙ্গের দিক থেকে অনির্দিষ্ট যাতে এটা সকল পান্থপাদপের জন্য প্রযোজ্য। যাহোক তারা হুমকিকে এত ভয়াবহভাবে দেখে যে, তারা শুধু পবিত্র গাছের ক্ষেত্রে এই হুঁশিয়ারি প্রযোজ্য বলে নির্ধারণ করেছে।

তবে, আমি এমতের সামর্থক যে, এই হাদিস আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য প্রদান করে যে, লোকেরা গাছটি সম্পর্কে অমনোযোগী। অথচ [বিশেষত] আরব দেশে উন্মুক্ত মরুভূমিতে পান্থপাদপ গাছ এর ছায়া ও ফলের উপকারিতার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই গাছ কেটে ফেলা- প্রয়োজনের বাইরে- সামগ্রিকভাবে লোকদের অনেক উপকারে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাদের সম্ভাব্য ক্ষতিকে উন্মুক্ত করে। আজকের দিনে, এই বিষয়টি সমসাময়িক আলেমদের ভাষায় বৃক্ষ ও পরিবেশ সংরক্ষণ-এর আওতাধীন। এটা একটা কারণ, যার জন্য বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়েছে, গোষ্ঠী ও কনফারেন্স আহ্বান করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় গড়ে উঠেছে।

সুনান আবু দাউদে এই হাদিসটি সম্বন্ধে আবু দাউদের একটি সন্ধানী জিজ্ঞাসা দেখেছি। তিনি বলেছেন, এই হাদিসটি [মূলপাঠ] সংক্ষেপিকৃত। অর্থাৎ পূর্ণভাবে এটা হলো, যে ব্যক্তি জলশূন্য মরুভূমিতে একটি পান্থপাদপ গাছ কেটে ফেলে যার নিচে একজন পথের সন্তান [অর্থাৎ একজন পথিক] এবং গবাদি পশু ছায়া নিতে পারে এবং সে এটা কাটে ঠিক এর প্রয়োজনে বা বিনা অধিকারে মন্দ কাজের জন্য [সম্পত্তির অধিকার ঐ গাছের ওপর, যার দ্বারা কর্তনকে বিবেচনা করা যায়] আল্লাহ তায়ালা তার মাথা জাহান্নামে রাখবেন।

প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য! এটাই আবু দাউদের সেই ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, হাদিসটি বুঝার ব্যাপারে আমি যেমনভাবে চিন্তা করেছিলাম। এই হাদিস এবং এরকম অন্যগুলো ইসলামকে পরিবেশ, লতাগুল্ম ও বৃক্ষ সংরক্ষণে অগ্রপথিকের মর্যাদা দান করেছে। এটা এখন প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় চেতনায় আসুক, যারা জান্নাতের আশা করে এবং জাহান্নামের ভয়ে ভীত থাকে।

বাতিল ব্যাখ্যাসমূহ

বাতিলযোগ্য ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে মনগড়া ব্যাখ্যা, যেগুলোর পক্ষে মূল বর্ণনার অভিব্যক্তির কোনো সাক্ষ্য নেই, না আছে প্রসঙ্গের মিল। একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির অভিমত, যে এ হাদিস প্রসঙ্গে বলেছে, সাহরি খাও [রোজার পূর্বের খাবার], কারণ নিশ্চয়ই সাহরিতে বরকত রয়েছে,[১৩৭] এখানে সাহূর বলতে ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই যে, দিন শুরুর পূর্ব মুহূর্তে ক্ষমা প্রার্থনা বড় আমলসমূহের একটি, যার সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্তে আহ্বান জানান হয়েছে। তবে এই হাদিসের উদ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে অন্য যেসব হাদিস এসেছে অভিপ্রেত অর্থকে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করতে সেগুলোর আলোকে। তাদের মধ্যে সাহরির জন্য খেজুর কতই না উত্তম[১৩৮] এবং সাহরির সবটাই বরকত। সুতরাং এটা ছেড়ে দিও না, এমন যদি হয় যে, তোমাদের কারো গলাধঃকরণের মতো এক ঢোক পানিও থাকে[১৩৯]।

হাদিসগুলোর ব্যাখ্যার আরেকটি দৃষ্টান্ত এই, যা দেখা গেছে ঈসা-বিরোধীর মাসিহ আল-দাজ্জালের ক্ষেত্রে; কঠোর পরীক্ষার এই শয়তান থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাইবার জন্য প্রত্যেক সালাতের শেষে দোয়া করতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, দাজ্জাল নতুন প্রভাবশালী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক, কারণ এটি এক মনবিশিষ্ট (সেই বৈশিষ্ট্য যা দাজ্জালের এক চক্ষু হওয়ার মধ্যে প্রতিফলিত)। এটি জীবন ও মানবতাকে এক চোখ বা এক দৃষ্টিকোণ হতে (যা

বস্তুবাদী) দেখে এবং এর বেশি কিছু নয়। যা ওর বাইরে তা এটি দেখে না। সুতরাং তা মনে করে, মানুষের কোনো আত্মা নেই; সৃষ্টির কোনো ইলাহ নেই এবং এই নশ্বর জীবনের পর ওপারে কোনো জীবন নেই। এই ব্যাখ্যা অনেক হাদিস দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিরোধী। তা এই যে, দাজ্জাল একটি স্বতন্ত্র সত্তা, যে এখানে সেখানে বিচরণ করে, যে প্রবেশ করে এবং বের হয়ে যায়, যে ডেকে একত্র করে এবং বিপথে চালিত করে এবং ধ্বংস করে ইত্যাদি। এসবই এ বিষয়ক হাদিসসমূহে প্রত্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া এইসব বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ের (অনেকের কাছে হতে অনেকের দ্বারা বর্ণিত)।

আরেকটি দৃষ্টান্ত মুসলিমদের মধ্যকার কিছু আধুনিক ব্যাখ্যা সেসব হাদিসের, যা এসেছে শেষ জামানায় মাসিহ'র অবতরণ সম্পর্কে। এগুলো তাওয়াতুর পর্যায়ের অনুরূপ হাদিস, যেহেতু সকল নেতৃস্থানীয় হাদিসবিশেষজ্ঞ এগুলো ব্যাখ্যা করেছেন[১৪০]। ব্যাখ্যা এরকম যে, মাসিহ'র অবতরণ একটা সময়ের প্রতীক। এটা ব্যাপকভাবে ও জনপ্রিয়ভাবে মনে করা হতো যে, মাসিহ তিনিই হবেন যিনি মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সহিষ্ণুতার আহ্বান জানাবেন। সহিহ হাদিসে মাসিহ'র আগমন সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, এই ব্যাখ্যা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এগুলো তাঁকে ওর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বর্ণনা করেছে : ইবন মারইয়াম নেমে আসবেন একজন ন্যায়বান শাসক হিসেবে, ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযয়া রহিত করবেন,[১৪১] কারো কাছ থেকে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। ওটা এই ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সকল মতভেদ। মাত্র একটি এটা এমন এক ব্যাখ্যা যা বাজে অর্থকারী বা কু-কর্মশীল মিশনারী ও প্রাচ্যবিদদের মতের অনুরূপ, যারা দাবি করে যে, ইসলাম তরবারির ধর্ম, যেখানে খ্রিস্টত্বই একমাত্র শান্তির ধর্ম! এটা ইনজিলে (মথি ১০ : ৩৪) মাসিহর এই বক্তব্য সত্ত্বেও : ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি প্রেরণের জন্য এসেছি, তরবারি ছাড়াই। বস্তুত কিছু পাশ্চাত্যপন্থী বলেন যে, মাসিহ পুরোপুরি সত্য বলেননি তার কোনো ভাববাণীতেই, যেমন এটিতেও। কেন খ্রিস্টিয় জগত এত যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করেছে ও রক্তপাত ঘটিয়েছে, এমনকি নিজের মধ্যেও- সাম্প্রতিক সময়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, যার ফসল ছিল লক্ষ লক্ষ মানবজীবনের অবসান।

ইবনে তাইমিইয়া কর্তৃক আলংকারিকতা বাতিলকরণ

আমি সচেতন যে, শায়খ আল-ইসলাম ইবন তাইমিইয়াহ কুরআন ও হাদিসের আলংকারিকতা বাতিল করেছেন এবং তিনি বাতিলকরণকে বিভিন্নমুখী যুক্তি ও বিবেচনার দ্বারা সমর্থন করেছেন। আমি এই ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যও জানি। তিনি

তাদের বিরুদ্ধে দরজায় খিল লাগাতে চেয়েছিলেন, যারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যায় চরম পর্যায়ে চলে গেছে। ইবন তাইমিইয়াহ তাদেরকে আল-মু'আতিলা বলে অভিহিত করেছেন। তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর সবই কেবল ঋণাত্মক, ধনাত্মক কিছু নেই; সুতরাং (শেষ পর্যন্ত) তারা গুণাবলী প্রত্যায়ন করার স্থলে অস্বীকার করে। ইবন তাইমিইয়াহ সেই অবস্থানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, সাহাবিদের রা. (সালাফ) প্রথম প্রজন্ম যেখানে ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সেটাই বাতিল করেছেন যা কুরআন ও সুন্নাহ্ তাঁর সম্বন্ধে বাতিল করেছে। তবে ওটা করতে গিয়ে তিনি সামগ্রিকভাবে ভাষা থেকে অলংকারকে বাতিলকরণের চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছেন।

এখন ইবন তাইমিইয়াহ হচ্ছেন উম্মাতের সবচেয়ে প্রিয় আলেমদের একজন- এমনকি সম্ভবত অতি প্রিয়তম- আমার অন্তরের কাছে। কিন্তু ওগুলো আমার যুক্তি দ্বারা তুলে ধরি এবং এখানে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করি, ঠিক যেমন তিনি তার পূর্বেকার ইমামদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেনও যে, আমাদের অন্ধভাবে চিন্তা ও অনুসরণ করা সঙ্গত নয় এবং আমাদের উচিত সত্য দ্বারা মানুষকে জানা এবং মানুষ দিয়ে সত্যকে জানা নয়। সুতরাং ইবন তাইমিইয়াহকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি একজন তাইমিইয়াহপন্থী নই। আল-যাহাবী বলেন : শাইখ আল-ইসলাম আমাদের কাছে প্রিয়; কিন্তু সত্য আমাদের কাছে তার চেয়ে প্রিয়তর।

হ্যাঁ, আমি আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাইখ আল-ইসলামের সাথে আছি, অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ক্ষেত্রেও এবং পরকালের অবস্থার ব্যাপারে। সুতরাং উত্তম হচ্ছে এটাই যে, প্রমাণ ছাড়া তাঁর (আল্লাহ তায়ালার) জন্য উল্লেখিত বিষয়ে কল্পনার মধ্যে পতিত হওয়ার জন্য বেপোরোয়াভাবে ঝাঁপ দেওয়া উচিত নয়। আমরা যা জানি না তা জানার ভান না করাই শ্রেয় এবং উচিত যারা জানে তাদের দিকে সোপর্দ করা। আমরা সেটাই বলি যা জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিগণ বলেন : আমরা এতে বিশ্বাস করি; [এর] সবই আমাদের প্রভু প্রতিপালকের কাছে হতে (সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৭)।

এটাই তা যার ওপরে আমি পরবর্তী অংশে আলোকপাত করার ইচ্ছা করেছিলাম।

৭. অদৃশ্য ও দৃশ্যমান পৃথকীকরণ

সুন্নাহ্ অদৃশ্য জগত সম্পর্কিত বিষয় উপস্থাপন করে, ওগুলোর কিছু হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত সংশ্লিষ্ট, আমাদের এই জগত সম্পর্কিত হওয়ার চেয়ে- যেমন, ফেরেশতাগণ, যাদের বাহিনীকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্নমুখী দায়িত্ব প্রদান করেছেন :

> তোমার প্রতিপালকের বাহিনী (কারা এবং কতসংখ্যক) সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না (সুরা মুদ্দাস্সির, ৭৪ : ৩১)।

অথবা জিন জাতি, পৃথিবীর বাসিন্দা, আমাদের মতোই কর্তব্যাধীন, তাদের কেউ কেউ আমাদেরকে দেখে, কিন্তু আমরা তাদের দেখি না এবং তাদের মধ্যে শয়তানেরা, ইবলিশের বাহিনী, যে আল্লাহ তায়ালার সামনে শপথ করেছে আমাদেরকে বিপথগামী করা এবং মিথ্যা ও মন্দকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য। সে বলেছে :

> আপনার ক্ষমতার কসম! আমি ওদের সবাইকে অবশ্যই গুমরাহ করব, তাদের মধ্যে আপনার একিন (মুখলিস) বান্দাদের বাদে (সুরা সাদ, ৩৮ : ৮২-৮৩)।

একই প্রকার আরো দৃষ্টান্ত : আরশ কুরসী, ফলক এবং কলম। অদৃশ্য বিষয়ক এসব উপাদানের কিছু বারযাখের জীবনের সাথে সম্পর্কিত, মৃত্যুর পরবর্তী এবং বিচার দিবসের পূর্ববর্তী জীবনের মাঝখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কবরে জিজ্ঞাসাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট, এর পুরস্কার বা এর শাস্তি। ওগুলোর কিছু খোদ পরকালীন জীবনের সাথেই সম্পর্কিত-কবর হতে বের হওয়া, একত্রিত হওয়া ও দণ্ডায়মান থাকা, কিয়ামতের দিনের অবস্থা এবং চূড়ান্ত সুপারিশ, দাঁড়িপাল্লা এবং হিসাবনিকাশ এবং পথ, সেখানকার লোকদের পদমর্যাদা, জাহান্নাম ও সেখানকার আজাবের শ্রেণিবিভাগ, অনুভূতি ও আত্মাকে স্পর্শ করা এবং সেখানকার লোকদের পতিত হওয়ার মাত্রা। এসব বিষয়, অথবা এসবের অধিকাংশ, কুরআন বিন্যাস করেছে এবং সুন্নাহ্ এর ওপর বিস্তার ঘটিয়েছে এবং কুরআনের সারাংশকে বিশদ করেছে।

আমরা এটাকে উল্লেখ করতে বাধ্য যে, এর ওপরে যেসব হাদিস এসেছে তার কতগুলো সহিহ'র পর্যায়ে পৌছে না, যেমনটা আশা করা হয়। সুতরাং এটা যথাযথ নয় যে, এগুলোকে এই বিষয়ের ওপর একত্রিত করা হবে। নবি সা.-এর কেবল ঐসব হাদিসের ওপরই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যা প্রতিষ্ঠিত ও প্রত্যয়িত। এখানে মুসলিম আলেমদের কর্তব্য হচ্ছে, যা প্রতিষ্ঠিত হিসেবে যাচাইপূর্বক গণ্য করা হয়েছে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নীতিমালা অনুযায়ী এবং উম্মাতের প্রথমযুগের প্রজন্মের মতো করে যারা যারা অনুসৃত হয়েছেন, সেগুলোকে গ্রহণ করা। আমাদের কাছে যা পরিচিত তার বিরোধী- কেবল এই কারণে মূল বর্ণনাকে বাতিল করার অনুমতি নেই; অথবা একারণেও নয় যে, এর ঘটনা আমাদের কাছে সুবিদিত, এমন কিছুর সাথে কষ্টকল্পিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তা যৌক্তিকভাবে সম্ভবের সীমায় থাকে। এমন কিছু এখন নিশ্চয়ই আছে যা আমরা গতানুগতিকভাবে অসম্ভব বিবেচনা করি। তা সত্ত্বেও আমরা এও জানি যে, কেবল মানব সম্প্রদায় সমর্থ হয়েছে (জ্ঞান হতে

প্রাপ্ত শক্তিতে) একদবা অসম্ভব বিবেচিত বস্তুকে তৈরি করতে। বস্তুতপক্ষে, যদি এমন জিনিস পূর্ববর্তীগণের কাছে পৌছাত, যারা ওগুলো বর্ণনা করেছেন, তাহলে তারা পাগল হিসেবে বিবেচিত হতেন। আমরা আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা পরিমাপের সাহস করি কীভাবে কতটা বেপরোয়া যাঁর আসমান ও জমিনে কিছুরই অভাব নেই?

আমাদের আলেমগণ নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যে, দ্বীন তাই নিয়ে আসে যুক্তির দৃষ্টিতে যা অবিশ্বাস্য ধরনের হয়। কিন্তু এটা সম্ভব নয় যে, দ্বীন তাই নিয়ে এসেছে যা যুক্তি হতে বিচ্ছিন্ন। তদনুযায়ী, বিশুদ্ধভাবে পৌছান হাদিস কোনো অবস্থাতেই বিরোধপূর্ণ নয়, তেমনি সহজে ও স্পষ্টভাবে যুক্তিসিদ্ধ যা, তা নিয়েও বিরোধ ঘটে না।

কেউ এ দুটির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ অনুমান করে না। এটা অনিবার্য যে, ভুল বস্তুতই দেখা দিয়েছে, কিন্তু যা পৌছান হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়, অথবা যা যুক্তিসম্মত হয়েছে, তা কিন্তু সহজ ও স্পষ্ট নয়। আমি বুঝাতে চাচ্ছি, যেসব বিষয়কে মানুষ দ্বীনের বলে বিবেচনা করে তা' দ্বীনের সত্যসমুহের অন্তর্ভুক্ত নয়, বা যাকে সে জ্ঞান বা যুক্তি হতে উদ্ভূতভাবে, তা নির্ধারিতভাবেই জ্ঞান বা যুক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়।

কিছুর চিন্তা ঘরানা (School of Thought) এবং ইসলামি মাজহাব নিশ্চয়ই চরমে চলে গিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মু'তাজিলাগণ এটা করেছে, কিছু সহিহ হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে যা তাদের যুক্তিসীমার বাইরে। ঐসব হাদিসের প্রতি তাদের কারো মনোভাবে আমরা এটি দেখেছি, যেগুলো কবরে ফেরেশতাদের সওয়াল-জওয়াবের কথা বলে এবং যার ফলে পুরস্কার বা শাস্তির বিধান হয়। অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে দাঁড়িপাল্লা[১৪২] এবং পথ সংক্রান্ত হাদিসের প্রতি তাদের মনোভাব। বিশ্বাসীদের জান্নাতে আল্লাহ তায়ালাকে দর্শন এবং যেগুলো জিন ও মানুষের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা বলে সে সব হাদিসের প্রতি তাদের মনোভাব একই। তার মূল্যবান গ্রন্থ আল-ই'তিসাম-এর মধ্যে আল-শাতিবী বলেন: বিদ'আত ও বিচ্যুতিপন্থী লোকদের অভ্যাসের প্যাটার্ন এমন যে, তারা সেই হাদিসগুলো প্রত্যাখ্যান করে যেগুলোকে তাদের সংস্কার ও মতবাদের বিরোধী হিসেবে পায় এবং প্রোপাগাণ্ডা করে যে, এই হাদিসগুলো যুক্তির বিরোধী এবং পূর্বাপর তা ছিল না যা যুক্তিসংগত উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ছিল এবং তাই ওগুলো বাতিলকরণ অপরিহার্য ছিল।

সুতরাং তারা অস্বীকারকারী কবরের শাস্তি এবং পথ ও দাঁড়িপাল্লার আল্লাহ তায়ালাকে পরকালে দর্শনকে। একই ভাবে তারা অস্বীকার করে মাছি ও তা ডুবিয়ে

নেয়ার হাদিস এবং যে এর এক পাখায় অপকার ও অন্য পাখায় নিরাময় এবং মাছি প্রথমে যাতে ক্ষতি রয়েছে সেই পাখনা ডোবায় এসব বক্তব্য;[১৪৩] এবং সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদিস যে তার ভাইয়ের পাকস্থলী সম্পর্কে অভিযোগ করলে নবি সা. তাকে মধু[১৪৪] পান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সহিহ হাদিসে এমন যা আছে যেগুলো সম্মানজনক কীর্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ হতে পাওয়া গেছে। সময়ে তারা কিছু সাহাবি ও তাবেয়ি হতে বর্ণনাকে মিথ্যা দ্বারা কলংকিত করেছে, তারা এসব করার যোগ্যতা হতে দূরে, যেখানে নেতৃস্থানীয় হাদিস বিশেষজ্ঞগণ এদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া সম্পর্কে একমত যারা অনুসরনীয়। মুতাজ্জিলারা এর এর সবকিছুই বাতিল করেছে তাদের মতবাদের বিরোধী হওয়ার কারণে। এক সময় তারা [সাহাবিদের] ফতোয়াও বাতিল করেছিল এবং সাধারণ জনগণকে কুনিয়ে তাদেরকে গালাগাল করে। এতে করে তারা উম্মতকে সুন্নাহ্র অনুসরণ এবং সুন্নাহ্র লোক হওয়া সম্পর্কে আতঙ্কিত করে তোলে। তারা পথ, দাঁড়িপাল্লা অথবা পুলসিরাত সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছে যা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত কথা, যাতে মানুষ কোনো বিরোধী ভাব পোষণ করে না। তারপর সত্যিই তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল, অবিশ্বাস কি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে পরকালে বিশ্বাসীদের আল্লাহ তায়ালা দর্শনকে সত্যায়ন করে? তারপর তিনি বলেন : না। সে অবিশ্বাস করেনি সেই পর্যন্ত, যেমনটা সে বলেছে সেটা যা কোনো অর্থ তৈরি করে না এবং সে ব্যক্তি যে বলেছে, অর্থহীন কথা সে একজন অবিশ্বাসী নয়।

একটি গোষ্ঠী হাতের বাইরের একক বর্ণনাকারীর বর্ণনা বাতিল করার অবস্থান পর্যন্ত চলে গিয়েছিল এবং তারা গ্রহণ করতো কুরআন উপলব্ধির ক্ষেত্রে যা তাদের যুক্তিকে খুশি করে, এমনকি ঐ পর্যন্ত যে তারা মদকে মহীয়ান (আল্লাহ তায়ালার) বক্তব্য দ্বারা সিদ্ধ করেছে :

> যারা ইমান আনে আর সৎকাজ করে, তারা পূর্বে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোনো পাপ নেই (সুরা মায়েদা, ৫ : ৯৩)।

তাদের ও তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহর নবি সা. বলেছেন : তোমাদের ঐ ব্যক্তি তার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসবে, তার কাছে আমার নির্দেশ আসবে যার আমল করার নির্দেশ তার ওপর বর্তায় অথবা আমল নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সে বলে, আমি ওটা সম্বন্ধে সচেতন নই। আল্লাহ তায়ালার কিতাবে এটা আমাদের অনুসরণ করতে হবে এমন নির্দেশ আমরা দেখিনি[১৪৫]। এটা বড় ধরনের হুঁশিয়ারি, এর মধ্যে রয়েছে সুন্নাহ্ অস্বীকার করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। এটা ঐ ব্যক্তি সমর্থন করে না, যে সুন্নাহ্কে বাতিল করার মতো রুচি বহির্ভূত অপরাধ

করে[১৪৬]। দূর সীমার একই প্রকার (কিছু সমসাময়িক হতে) আহ্বান রয়েছে এই সহিহ হাদিসটির পুনকার্যকারিতার জন্য : জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ এমন রয়েছে যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর চলেও একে অতিক্রম করতে পারবে না। এই হাদিসটি সর্বসম্মত। শাইখাইন সাহল ইবন সাদ হতে, আবু হুরায়রাহ হতে এবং আবু সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন[১৪৭]। আল-বুখারি আব্বাস হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। এই ক্ষেত্রে ইবন কাসির তার তাফসিরে এই আয়াতের : এবং বিস্তৃত ছায়া (সুরা ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৩০)-এর ব্যাখ্যায় বলেন আল্লাহর রসুল সা. হতে এই হাদিস সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিতই মুতাওয়াতির সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে। হাদিসবেত্তা প্রধানগণ এইরূপ অভিমত দিয়েছেন।

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, একশ' বছর এই পৃথিবীর সময় কাল। এ কারণে, আবু সা'ঈদের ভাষ্যে বলা হয়েছে : আরোহী গতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়ায় ভ্রমণ করতে পারে। এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, যে এটা এই জগতে, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এই জগতের এবং আল্লাহর সাথে-থাকা জগতের সময়ের মধ্যকার কোনো প্রকৃত রূপ।

> এবং তোমরা যা গণনা করো তার এক হাজার বছর তোমার রবের একদিনের সমান (সুরা হাজ, ২২ : ৪৭)।

একটি হাদিস যখন বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে, তখন আমাদের জন্য এতে সন্তুষ্ট থাকার বিকল্প নেই; এর সত্যতায় আমরা বিশ্বাস করি ও একে নিশ্চিত করি, এটা নিশ্চিত যে পরকালের স্বরূপ এই জগতের স্বরূপ হতে ভিন্ন। এটা এইরূপ যাতে ইবন আব্বাস বলেছেন, 'জান্নাতে নাম ব্যতীত এই পৃথিবীর কিছুই নেই।

এর একটি দৃষ্টান্ত জাহান্নামে অবিশ্বাসীদের শাস্তি সম্পর্কে দেখা যায় : অবিশ্বাসীর মাড়ির দাঁতের বিশালত্ব, তার দুই কাঁধের মধ্যকার দূরত্ব, তার চামড়ার পুরুত্ব, ইত্যাদি। যেভাবে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ করাই অধিকতর সুফলদায়ক। এর বিশদ অনুসন্ধানে কোনো প্রাপ্তি নেই। এ ধরনের হাদিস দ্বারা প্রচারক তার পাঠক বা শ্রোতার মন আকৃষ্ট করবে না, যার বিষয়বস্তু মনে দ্ব্যর্থতার জন্ম দেবে, যার জ্ঞানের ওপর দ্বীনের বাস্তবতা বা এই জগতে তৃপ্তি নির্ভরশীল নয়। যা যথার্থ, কেবল তাই প্রয়োজন অনুযায়ী উল্লেখ করা উত্তম। যে সকল বিষয় নিয়ে মুসলিমের হৃদয় ব্যস্ত থাকবে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : আল্লাহ তায়ালার কাছে জান্নাতের জন্য দোয়া করা এবং সেই সব কথা বলা ও কাজ করা যা তাকে এর নিকটবর্তী করতে পারে এবং জান্নাতের লোকদের আচরণের মতো তার আচরণ

হওয়া এবং জাহান্নামের অধিবাসীদের মতো আচরণ হতে আত্মাকে দূরে রাখা। যে পরিপূর্ণ মনোভাব তার জন্য বাধ্যতামূলক তা হচ্ছে ইমানের যৌক্তিকতা; তার জন্য নিমিত্তের যুক্তি বাধ্যতামূলক নয়। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত, তার সম্বন্ধে আমাদের বাধ্যতামূলক উক্তি হবে : আমরা এতে এবং এর সত্যতায় ইমান রাখি; ইবাদতের আমল সম্বন্ধে আমাদের কাছে যা এসেছে তার ব্যাপারে যেমন আমরা বলি : আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম।

নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করি তাতে, যা নিয়ে কুরআন আমাদের কাছে এসেছে এবং আমরা এর নির্যাস বা প্রণালী নিয়ে প্রশ্ন করি না; না আমরা এর বিশদ নিয়ে অনুসন্ধান চালাই। কারণ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রায়ই অসহায় অদৃশ্য এসব বিষয় উপলব্ধি করতে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই ধারণা উপলব্ধির যোগ্যতা দেননি, কারণ তিনি এই পৃথিবীর পরিচালনক্ষেত্রে (খিলাফত) তার কর্তব্য পালনের জন্য এর প্রয়োজন বোধ করেননি এবং তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের ক্ষেত্রেও।

এখন যদি যৌক্তিক ধর্মতত্ত্ব গোষ্ঠী, যা মুতাজিলাগণ প্রত্যয়িত করে, এই সত্যের ধারণা এবং এর গ্রহণীয়তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের প্রয়োজন হবে না সহিহ হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করা, যা পরকালে ইমানদারদের আল্লাহ তায়ালাকে দেখা এবং তাদের চোখে তাদের প্রভুকে পূর্ণিমার রাত্রে চাঁদ দেখার মতো দেখা'কে প্রতিষ্ঠিত করে। উপমাটি হচ্ছে পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য, যা দৃষ্ট তার জন্য নয়, কুরআনের বাহ্যিক অর্থের ব্যাখ্যা নিয়ে তারা উপহাস করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আয়াত :

> ঐদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে চেয়ে থাকবে (সুরা কিয়ামা, ৭৫ : ২২ - ২৩)।

এতে যে মৌলিক প্রমাদ ঘটেছে তা হচ্ছে : অদৃশ্যকে দৃশ্যমানের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করা, যার আগমন ঘটবে পরকালে, তাকে তার পূর্বগামী এই জগতের বিষয়ের সাথে মেলান। এটা সদৃশকরণের একটি ভ্রান্থ পন্থা-অমিলের সদৃশতা- কারণ প্রত্যেক প্রক্রিয়ারই নিজস্ব নিয়ম ও প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্ন রয়েছে। এই কারণেই সুন্নাহ্র অনুসারীগণ দেখাকে প্রত্যয়িত করেন, তাদের ঐ ঐকমত্যের সাথে, যা পরিচিত দেখার প্যাটার্নের সাথে আমাদের দর্শন-ক্ষমতার সদৃশ নয়। বরং, এটা- যেমন মুহাম্মদ আবদুহু বলেছেন-এক রকমের দেখা যা পদ্ধতিহীন এবং সীমানাহীন এবং এর সদৃশ অন্যকিছু আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত দর্শন-ক্ষমতা ছাড়া সম্ভব নয় পরকালে অনুগত লোকদের ক্ষেত্রে। অথবা তিনি (আল্লাহ তায়ালা) দর্শন-ক্ষমতায় নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটাবেন, যাতে তখন এটা এই পৃথিবীর জীবনের পরিচিত দর্শন

পদ্ধতির চেয়ে ভিন্ন হয়। এটা এমন কিছু যার জ্ঞান রাখা আমাদের জন্য সম্ভব নয়; তা সত্ত্বেও আমরা এই বাস্তবতার নিশ্চয়তা বিধান করি যখন এর বর্ণনা প্রত্যয়িত করা হয়েছে[১৪৮]।

রশীদ রিযা পরকালে দেখার উপকরণ সংক্রান্ত তার শিক্ষকের (আবদুহ্) আলোচনার অনুষঙ্গ হিসেবে বলেন :

> বাস্তবতার বোধ [উপলব্ধিকরণ] আত্মার সাথে সম্পৃক্ত এবং অনুভূতি [দেখা, শোনা, ইত্যাদি] এর উপকরণ। অধিকন্তু এই যুগের পূর্ব ও পশ্চিমের বিজ্ঞানীদের সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত যে, লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি দেখেন এবং পড়েন যখন তার চক্ষুদ্বয় বাঁধা অবস্থায় (বন্ধ) থাকে, এমন কিছুর মধ্যে যাকে তারা বলেন ধারণায় পঠন এবং তিনি কিছু জিনিস দেখেন [যদিও] অন্যরা স্বপ্নকর্মেও দেখে না এবং যাদের মধ্যে আরেকজন আছেন যিনি অনেক পর্দা থাকা সত্ত্বেও দেখেন; ও যা প্রত্যন্ত এবং অতি দূরে তিনি সেটাও দেখেন সেই ব্যক্তির মতো, যে সরাসরি উপস্থিত থেকে দেখতে থাকে ...। সুতরাং অতঃপর এটা এই পৃথিবীর সব লোকের দেখা সম্পর্কে প্রত্যায়ন করে, যা দেখার পরিচিত পদ্ধতির বিপরীত। সুতরাং এটা কি সেই ব্যক্তির জন্য শোভন যার এমর্মে অনুভূতি রয়েছে, সে জান্নাতে ওর চেয়ে আশ্চর্যজনক যা রয়েছে সে সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হবে এবং যা পরিচিত মতের বাইরে? এবং জান্নাত হচ্ছে অদৃশ্য জগত। দৃশ্যমান জগতের চেয়ে সাথে এর প্যাটার্ন ও ঐতিহ্য ভিন্নতর।

এবং দেখা সম্বন্ধে সংশয় ও দেখাকে প্রত্যাখ্যান কি অদৃশ্যগত ও এই জগতের দেখা ও দৃষ্টি বিষয়ের মধ্যকার সাদৃশ্যমূলক অনুমানের কারণের বিপরীত? এটা ভিত্তিহীন, মিথ্যা সাদৃশ্য। দৃষ্ট'র ভিত্তিতে এর প্রতারণা অধিকতর প্রমাণিত দেখার ভিত্তির চেয়ে[১৪৯]।

৮. শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ

সুন্নাহ্কে ঠিকমতো বুঝতে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : যে শব্দে সুন্নাহ্ এসেছে তার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা। কারণ শব্দাবলী অবশ্যই তাদের এক যুগ হতে অন্য যুগে গুঢ়ার্থে পরিবর্তন আনতে পারে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে। এটি এমন এক বিষয় যা ভাষা ও শব্দকোষের বিবর্তন এবং ঐ বিবর্তনের সময় ও স্থানের বিষয়ের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত।

পুরাতন মূলপাঠে সাম্প্রতিক পরিভাষা পাঠের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

লোকেরা নির্দিষ্ট কিছু শব্দের বিশেষায়িত অর্থ চিহ্নিতকরণের প্রথা সম্বন্ধে একমত, সুতরাং তাদের মধ্যে পরিভাষা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে, এখানে উদ্বেগের উৎস হচ্ছে সুন্নাতে যা এসেছে তার ব্যাখ্যা-এবং ওর অন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুরআন- শব্দ সম্ভারের দিক থেকে চলমান পরিভাষাসমৃদ্ধ এবং এখানেই ত্রুটি ও প্রমাদ দেখা দেয়।

আল গাজ্জালী আমাদেরকে পরিভাষা পরিবর্তনের সংবাদ দিয়েছেন, বিজ্ঞানের কিছু নামের অপসারণের ক্ষেত্রে, ঐসব অর্থের, যা সালাফিদের প্রজন্মে উদ্ধৃত হতো। তিনি এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং এর ভ্রান্ত পরিচালনার ঐসব লোক দায়ী, যা বুঝা হয়েছিল সেই সংজ্ঞার গভীরে প্রবেশ করেনি যারা। আল-জাহ্‌রা তার কিতাব আল-ইলম গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন :

জেনে রাখুন যে, আইনের বিজ্ঞানের নিন্দিত বিষয়াদিতে সন্দেহের সূত্র হচ্ছে অনুমোদিত নাম সমূহের অঙ্গহানি ও তাদের পরিবর্তন। সেগুলোকে পৌছান হয়েছে দূরভিসন্ধিমূলক লক্ষ্যে সেসব অর্থ [পরিচিত] করতে, যা পুণ্যাত্মা সালাফিগণের অভিপ্রায়ের বিপরীত। প্রথম শতাব্দীতে ছিল পাঁচটি শব্দ। ফিক্‌হ (আইনশাস্ত্র), ইলম (জ্ঞানবিজ্ঞান), তাওহিদ (আল্লাহ তায়ালার একত্ব), তাজ্‌কির (স্মরণ), হিকমাহ (বিজ্ঞ বিচক্ষণতা)। এখন এগুলো হচ্ছে অনুমোদিত নাম, [উৎসগতভাবে] যা দ্বারা দ্বীনের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কর্মসম্পাদনকারীগণকে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এগুলো ব্যাবহৃত হচ্ছে অননুমোদিত অর্থে। অতঃপর অধিক জ্ঞাত লোকদের হৃদয় ঐসব লোককে অননুমোদন করতে অনিচ্ছুক করে তোলে, যারা এসবের অর্থ সম্বন্ধে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল, যাতে এসব নামের ব্যবহার তাদের কাছে ছড়িয়ে যায়[১৫০]।

আল-গাজ্জালী (রহ.) এক গুচ্ছ পৃষ্ঠাব্যাপী এটা বিশদ লেখেন। বিজ্ঞানের যে সব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিষয় গাজ্জালী লক্ষ্য করেছিলেন, সেখানে এখন অসংখ্য শব্দ বিচিত্র ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

সময়ের প্রবাহে এই পরিবর্তন ম্লান হয়নি। বরং এটি সময়, স্থান ও মানব উন্নয়নের পরিবর্তনের সাথে বিস্তৃত হয়েছে। এখন প্রকৃত শব্দের আইনগত ব্যঞ্জনার সাথে দূরগম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীতে জ্ঞাত অথবা বর্তমান বাগ্‌বিধি অনুযায়ী ব্যবহৃত শব্দের। সেখানেই রয়ে গেছে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল ও মিথ্যা বুঝ, সেই সাথে স্বেচ্ছাকৃত বিচ্যুতি ও ঘষামাজা। এটাই তা, যার বিরুদ্ধে উম্মাতের মেধাবী ও

সত্যানুসন্ধানী বিদ্বানগণ সতর্ক করেছিলেন, যেমন আইনকে সময়ের প্রবাহের সাথে চলমান বাগধারায় সংকুচিত করা হয়েছে।

দুটি শব্দ : তাসবির এবং নাহ্‌ত

যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র সম্পর্কে যথাযথ দৃষ্টি না রাখবে, সে অনেক ভ্রমে পতিত হবে- যা আমরা আমাদের সময় দেখি। উদাহরণ হিসেবে তাসবির (প্রতিকল্প) শব্দটি নিন যে সম্পর্কে সহিহ হাদিসে সর্বসম্মত বর্ণনা রয়েছে। এর উদ্দিষ্ট অর্থ কি রয়েছে সহিহ হাদিসে যা প্রতিচ্ছবি (ইমেজ) প্রস্তুতকারীদের ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখায়?

অনেকেই যারা হাদিস ও ফিকহ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞ, তারা তাদেরকেই এই হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত করেন যাদেরকে আমাদের সময় মুসাব্‌বির বলা হয় মুসাব্‌বির একটি পরিভাষা যা ক্যামেরা নামক যন্ত্র ব্যবহারকারীদের বলা হয় এবং তারা এটাকে স্থাপন করে একটি আকৃতি নকল করার (শেক্‌ল) জন্য, এর সাথে রাখা হয় যেটা, সেটাকে অধিকতর সঠিকভাবে প্রতিকৃতি (সুরত) বলা হয়। কিন্তু ক্যামেরার অপারেটরকে প্রতিকৃতি তৈরিকারক (মুসাববির) এবং তার কাজকে ছবি তৈরি (তাসবিরান) বলা কি ভাষাগতভাবে বিশুদ্ধ নামকরণ? কেউ তা দাবি করে না, যখন আরবরা এই বিষয়ে তাদের অন্তরে সংঘটিত বিষয়কে একটি পরিভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করে, তখন এটা আভিধানিকভাবে একটা বিশুদ্ধ নামকরণ ছিল না। কিন্তু একই সাথে, কেউ এমন দাবি করে না যে, এই নামকরণ নিয়ে আইনের কিছু করার রয়েছে, কারণ এ বিধান প্রণীত হওয়ার সময় এ ধরনের কলা বা কৌশল জানা ছিল না। কেউ কল্পনাও করেনি যে, মুসাব্‌বির শব্দটি ক্যামেরার অপারেটরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হবে, কারণ এই যন্ত্র (ডিভাইস) তখন অস্তিত্বহীন ছিল।

সুতরাং কে তাকে মুসাববির এবং তার কাজকে তাসবিরান বলে সম্বোধন করে? এটা বর্তমান প্রথা বিধায় এমনটা করা হয়, আমরা আরবরা এটা করি, অথবা আমরা ঐ ব্যক্তিদের দেখি যারা এই কলা বা কৌশলকে তাদের সময় প্রদর্শন করে এবং আমরা এটি তাসবির এর নামের সাথে প্রয়োগ করি এবং এটা দ্বারা আমরা ফটোগ্রাফি বুঝাই।

এটা সম্ভব যে, লোকেরা এটাকে অন্য কিছু বলে এবং এটাকে তাদের প্রয়োগ প্রথায় গ্রহণ করেছে। এটাকে তাদের নামকরণে একটা- সম্ভাবনা হচ্ছে 'আকস (প্রতিচ্ছবি, ওল্টানো, তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য -reflection, reverse, contrast) এবং যে এর ব্যবহার করে তাকে 'আক্কাস বলা, যেমন কাতার ও গালফ-এর লোকেরা করে। সুতরাং তাদের একজন মুসাববির (অথবা আক্কাস) এর কাছে যায় এবং তাকে বলে,

আমি আমার একটি ছবি নিতে চাই (তা আকিসু-ম) এবং অপর ব্যক্তি তাকে বলে, কোন সময় আমি আপনার ছবি নেব (উকুস)?

তাদের বাক্যালাপ কাজের বাস্তবতার কাছাকাছি। কারণ এটা একটা বিশেষ ডিভাইস দ্বারা গৃহীত প্রতিফলন (Reflection)-এর বেশি কিছু নয়, ঠিক যেমন আকৃতি একটি আয়নার ডিভাইসে প্রতিফলিত হয়েছে। এটাই তা, যা তার সময়ের মিসর দেশের বিদ্বান মুফতি শায়খ মুহাম্মদ বাখীত আল-মুতি'ই বলেছেন তার 'আল-ফটোগ্রাফি' নামক প্রবন্ধে।

ঠিক যেমন, আমাদের যুগে (ফটোগ্রাফিক) ইমেজকে আক্স পরিভাষায় ডাকা হয়, একটি শরীরী ইমেজ সচরাচর যাকে নাহত (এমনকিছু যা কাঠ বা পাথরে করা হয়) বলা হতো। এটা এমন কিছু যা সালাফ আলেমতগণ বিবেচনা করেছেন ঐ বস্তু যার ছায়া আছে এমনভাবে। তারা কেবল শিশুদের খেলা ছাড়া এর নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে একমত। এটাকে (ফটোগ্রাফিক) ইমেজ নাহত বলা কি সেই সীমার বাইরে নিয়ে যাবে যার বিরুদ্ধে মূলপাঠে হুমকি দেওয়া হয়েছে, ইমেজ ও ইমেজ-প্রস্তুতকারী উভয় ক্ষেত্রে? এর উত্তর জোরের সাথে-না-বাচক। কারণ যা এটাকে ঐ হুঁশিয়ারি ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে আসে, তা এটা বা অন্য নাম নয়, বরং তা এর প্রকৃতি ও কাজ।

এই (ফটোগ্রাফিক) ইমেজ হচ্ছে তা যার দ্বারা আইনে ইমেজ শব্দটির যে ভাব বুঝা যায়, এটা প্রয়োগ হয় না। কারণ, ইমেজ শব্দটি ঐ অর্থে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, হচ্ছে যা সদৃশ এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সদৃশ করে তৈরি করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি এবং এর ইমেজ একটি শরীরী সৃষ্টি, যেমনটা সহিহ হাদিস কুদসিতে রয়েছে : চরম কুকর্মকারীদের মধ্য হতে যারা জাহান্নামি হবে তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি রয়েছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করে।

একক শব্দ বা বাক্য সম্পর্কে মন্তব্যে সতর্কতা

যে ব্যক্তি কোনো মহান বিদ্বানের কোনো অলংকারপূর্ণ মূলপাঠ বা কোনো মহান কবি সম্পর্কে মন্তব্য করে, তাকে অবশ্যই তা নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং তার মন্তব্যে সুন্দর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পার্থক্য করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মূলপাঠের উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা না করেন। গবেষণা মূল বইয়ের প্রণেতার উদ্দেশ্যের প্রকাশ ঘটায় এবং লেখকের বাগ্মিতা-সংক্রান্ত রীতির সাথে অর্থকে সমপরিমাণে টেকসই করে। এটি বেশি করে বাধ্যতামূলক হয়, যখন মূলপাঠ কোনো ধর্মীয় বা পবিত্র কিছু হয়, যেমন কুরআনের মূলপাঠ, কিংবা রসুল সা.-এর মূল বাণী, যা মানবিয়

বাক্পটুতার চূড়ায় পৌঁছেছে এবং যা কুরআনের দিগন্তের মধ্যে অবস্থিত, রসুল সা. হতে স্পষ্টিকৃত ও বিশদকৃত এবং যা কিতাবে তাঁর সা. প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সা. ভারী বাকপটুতা দিয়েছিলেন; আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সা. কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তিনি জানতেন না এবং এটা ছিল তাঁর ওপর আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব মেহেরবাণী। এটা কয়েক শব্দেই যথেষ্ট যে, মানুষ তার ব্যাখ্যার জন্য ভাষার অভিধানের প্রতি সোপর্দ করে এবং হাদিসে অদ্ভূত বিষয়াদি সংক্রান্ত পুস্তকে, যদিও অস্পষ্টতা পরিমার্জনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসব সম্পদ ব্যবহারে। আমরা কিছু শব্দের ক্ষেত্রে দেখি, সেগুলো আক্ষরিক হতে আলংকারিকে পরিবর্তিত হয়, সহজ প্রমাণিত রূপ হতে গোপনীয় বা গুপ্ত রূপে। কিছু শব্দ হতো ভাষার আক্ষরিক অর্থে আইন উদ্ভূত এবং এগুলো এক নতুন ব্যবহৃত অর্থ তৈরি করেছে যা আইনের আবির্ভাবের পূর্বে বিদিত ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শরীর পরিচ্ছন্নকরণ সংক্রান্ত শব্দাবলী (অজু, তায়াম্মুম) এবং প্রার্থনার অনুষ্ঠান এবং এধরনের কতকগুলো শব্দ তাদের প্রাসঙ্গিকতা, উদ্দেশ্য এবং তাদের স্থানীয় ও ঐতিহাসিক অবস্থার প্রেক্ষাপট ছাড়া বুঝা যায় না, যেমনটা আমরা উপরে চতুর্থ অংশে ব্যাখ্যা করেছি।

আমরা দেখেছি, কিভাবে সমসাময়িকগণ, যারা আইনের বিজ্ঞানে যা কিছু বিদেশী তার অনধিকার প্রবেশ করিয়েছেন, কুরআন ও হাদিসের ভাষ্য প্রদান করেন। জ্ঞানের মর্মস্থল হতে সবার জন্য এটা পরিতাপের বিষয় এবং বিবেকবুদ্ধিসহ ঐসবের জন্য যা ভাষ্য ও যে দ্বীনের যুক্তিবিদ্যা বা ভাষা বা বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তিশীল নয়। তারা কেবল খেয়ালের অনুসরণ করছে, যেমন ইবন আব্বাস এটা বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার মধ্যে খেয়াল খুশি নিকৃষ্টতম।

> তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে তার খেয়াল খুশিকে তার ইলাহ বানিয়েছে? আল্লাহ তায়ালা জেনেশুনেই তাকে গুমরাহ করেছেন, আর তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের ওপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার পর আর কে আছে তাকে সঠিক পথ দেখাবে (সুরা জাছিয়া, ৪৫ : ২৩)?

উপসংহার

এই অনুসন্ধানের সমাপ্তি টানতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, রসুল সা.-এর সুন্নাহ্ হিদায়াতের দ্বিতীয় উৎস, বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সাহচর্যসহ সূত্র আইনী বিচার ও ফিকহ'র ক্ষেত্রে এবং প্রচারের কার্যে, পরামর্শ প্রদান ও শিক্ষাদানের কাজে। আমরা অবশ্যই আরো প্রত্যয়িত করব

যে, সুন্নাহ্‌র প্রতি সেবার প্রয়োজন রয়েছে ইসলামে এর মর্যাদা ও অবস্থানকে যথাযথ করতে এবং হিজরি পনের শতকের (খ্রিস্টিয় একবিংশ শতাব্দীতে) শুরুতে উম্মতকে দাঁড় করিয়ে দিতে। এই সেবা অবশ্যই ইসলামি জ্ঞানের বুনিয়াদের সমর্থন চাইবে, যাতে এটি পৃথিবীকে এমন খোরাক উপহার দিতে পারে যা স্বাস্থ্যকর ও উন্নতির সাধক, যে ফল দেবে তা পরিপক্ক, যে ছায়া দেবে তা এর প্রশস্ততায় আনন্দদায়ক।

হাদিসের বর্ণনাকারীগণের জন্য সুন্নাহ্ একটি বিশ্বকোষের প্রয়োজন বোধ করে, তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণে তাদের সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও দুর্বলতা এবং এমনকি তাদের মধ্যে জালিয়াত ও ধোঁকাবাজ থাকলেও। হাদিসের মূল বর্ণনাসমূহের একটি বিশ্বকোষও প্রয়োজন এগুলোর সনদ ও তাদের সকল গতিপথ, খোদ নবি সা.-এর ব্যক্তিসত্তা হতে সুন্নাহ্ হিসেবে যাকিছু পৌঁছান হয়েছে তার সমুদয় সহ, প্রত্যেক সম্ভাব্য উৎস হতে, সকল পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত উৎসকে বেষ্টন করে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম হিজফর শতকের শেষ পর্যন্ত।

এ দুটি প্রশস্ত্র ক্ষেত্র তৃতীয়টির পথ তৈরি করে এবং এটাই হচ্ছে সমগ্র কাজের পেছনে সুপ্ত লক্ষ্য : নির্বাচন, সমগ্র অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রের মধ্য হতে, সহিহ্ ও হাসান-এর ক্ষেত্র হতে। এই নির্বাচন অবশ্যই হতে হবে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞানের মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার ভিত্তি স্থাপন করেছেন উম্মতের মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী বিদ্বানগণ। তাদের প্রয়াস ও অর্জন যা একে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, প্রথম ও সর্বাগ্রে স্মরণীয় ঐসব ব্যক্তি, যাদের ছিল এক বিশেষ যোগ্যতা, আর তা পঠিত হয় যে কোনো সমসাময়িক আলেমের সম্মুখে।

এর পাশাপাশি, এটা প্রয়োজন যে, এই প্রশস্ত ক্ষেত্র নির্বাচিত (সহিহ্ ও হাসান) হাদিসের, একটি নতুন ও সর্বার্থসাধক বিন্যাসে বিন্যস্ত, হালনাগাদ সর্বান্তর্ভুক্ত পরিশিষ্টে সজ্জিত। এটাও প্রয়োজন যে, ভাবগত বিন্যাস সংগঠিত করা হয়েছে সকল ধর্মীয়, মানবিয় ও সামাজিক বিজ্ঞানের চাহিদা পূরণার্থে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের জন্যও যার সাথে সুন্নাহ্ সংশ্লিষ্ট এবং যেসব ক্ষেত্রের অনুসন্ধান উপকৃত করতে পারে। এসবের বিশেষ উপকারিতার মধ্যে যা কিছু আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে শিখিয়েছেন এই যুগে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য অর্জনে সমর্থ করেছেন, যেমন ঔষধ ও উন্নত যন্ত্রপাতি, যেমন কম্পিউটার। একজন মুসলিম এটিকে আমাদের যুগের হাফিজ আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এটি হাফিজের চেয়েও বেশি, যার রয়েছে স্মৃতির বিশালতর সামর্থ্য। আমরা যদি এর থেকে উপকার পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি,

এটি আমাদেরকে জ্ঞানের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রগতি অর্জনের সামর্থ্য দেবে, আকৃতি (volume)। সংক্ষিপ্ততা (precision) ও বৈচিত্র্যের (diversity) ক্ষেত্রে যেসব ধরনের তথ্য আমরা আয়ত্ত করতে পারি, সুন্নাহ্র এই সেবার অগ্রপথিকগণ এসব জিনিষের স্বপ্ন দেখেননি, না তারা ওগুলোর দ্বারস্থ হয়েছেন। আমি আশাবাদী যে, কাতারস্থ সেন্টার ফর রিসার্চ ইন দি সুন্নাহ্ ও সিরাহ উন্নতি সাধন করবে, একই ধরনের কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউটের সহায়তায়, এই ক্ষেত্রে এর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকায়।

অতঃপর সুন্নাহ্র প্রয়োজন রয়েছে নতুন ভাষ্যের, এর সত্যতাকে স্পষ্ট করে, এর মধ্যকার দুর্বোধ্যতাকে সহজ করে একে বুঝার পথ পরিশুদ্ধ করতে এবং যা কিছু অনিশ্চিত অথবা নিষ্ফল বা মিথ্যা, তা বাতিল করতে। এই সব ভাষা লিখতে হবে এই যুগের জনমানুষের ভাষা ও বাগ্বিধি অনুযায়ী, যাতে আমরা তাদেরকে কার্যকরভাবে সুন্নাহ্ বুঝাতে পারি।

নিশ্চয়ই কুরআন আমাদের সময়ের কিছু মহান আলেমের অনুমোদন জয় করেছে এবং এটা এর অধিকার। এর ভাষা, এর উপকারিতা ও এর মনিমুক্তা আবিষ্কারে তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক যুক্তির প্রস্তাবগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। এটা তাদের সমর্থ করেছে হৃদয় ও মনের মধ্যে বিস্তৃত-পরিধির বিষয়বস্তু স্থাপন করতে। আমরা দেখেছি রশীদ রিযা, জামাল আল-দীন আল-কাসিমী, আল-তাহির ইবন আশুর, আবু আ'লা আল-মাওদূদী, সাইয়িদ কুতব, মুহাম্মদ শালতুত, মুহাম্মদ গাজ্জালী এবং অন্যদের কুরআনের ভাষ্যাদি।

সুন্নাহ্ সম্পর্কিত গ্রন্থাদি-বিশেষকরে দু'সহিহ কিতাব-এখনও পর্যন্ত এতটা সৌভাগ্যশীল হয়নি ঐসব অসাধারণ ব্যক্তিবর্গের ভাষ্যের ক্ষেত্রে, যারা কুরআনের ভাষ্য রচনায় পুরাতন ও নতুনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আমাদেরকে এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে প্রশংসনীয় প্রয়াসসমৃদ্ধ সুনানের চারটি গ্রন্থের ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে ঐসব সহকর্মীদের ও সহ-মুসলিমগণের, ভারত ও পাকিস্তানের আলেমদের মধ্য হতে। কিন্তু এসব ভাষ্য নকল ও অনুকরণ করা প্রাধান্য পায়, তারা আধুনিক ভাবধারা ও সংস্কৃতির সাথে তার মিথস্ক্রিয়া করেন না। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো মহান প্রচারককে শাইখানের দুই সহিহ গ্রন্থের ভাষ্য রচনার সামর্থ্য দেবেন। আল-বুখারি ও মুসলিম-এর যা কিছু একইসাথে বিজ্ঞান ও আধুনিক, তার দ্বারা ইসলামী সংস্কৃতি লাভ করবে এক নজরকাড়া সেবা।

এবং আমদের শেষ প্রার্থনা :

প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য, সকল কিছুর প্রভু, প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা।

টীকা

১. দেখুন, পৌরাণিক গারানিক- এ, সুগভীর গ্রন্থটি লিখেছেন মুহাম্মদ আল-সাদিক আরজুন। আল্লাহ তাকে দয়া করুন। তাঁর গ্রন্থ মুহাম্মদ রসুল আল্লাহ, শিরোনাম হচ্ছে 'কিসাত আল-গারানিক উকযূবাহ বালহা মুতাযিনদিকাহ', খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩০ - ১৫৫।

২. দেখুন ইবন আল-আরাবি, আহকাম আল-কুরআন (ইসা আল-হালাবি), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৪৯-৫২।

৩. দেখুন আল তিরমিজি, কিতাব আল-জাকাহ, বাব : মা-জা আ ফি জাকাত আল-খাদরাওয়াত এবং ইবন আল-আবারীর ভাষ্যসহ সহিহ আল-তিরমিজি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৩।

৪. আবু দাউদ, নম্বর ৪৭১৭ ইবন মাসউদ হতে। ইবন হিব্বান এবং আল-তাবারানি একই বর্ণনা এনেছেন আল-হাসিম ইবন কালিব হতে। আল-হায়সামি বলেন এর [বর্ণনাকারীগণ] হচ্ছেন সহিহ'র [বর্ণনাকারী] (আল-ফাইয আল-কাদীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩১)।

৫. ইবন হাম্বল ও আল-তিরমিজি এটি বর্ণনা করেছেন সালমাহ ইবন ইয়াযীদ আল-জু'ফি হতে। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল-সাগির গ্রন্থে।

৬. তিনি এটা কিতাব আল-ইমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, নম্বর ৩৪৭।

৭. কাসবা-হু : অর্থাৎ তার অন্ত্রাদি।

৮. সর্বসম্মত, আবু হুরায়রাহ হতে, উদ্ধৃত হয়েছে আল-লু লু' ওয়া আল-মারজান মধ্যে নম্বর ১৮১৬। হাদিসের অবশিষ্টাংশ হচ্ছে : প্রকৃতপক্ষে সেই প্রথম ব্যক্তি যে একটি পশুকে পবিত্র করে [স্পর্শ অযোগ্য করে] দেবতা বা দেবীর নামে।

৯. উদাহরণস্বরূপ, কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করা বা ঐ রকম কাজ, যা শব্দ হওয়া সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই জানা এবং সব ধর্মের অনুসারীদের কাছেও।

১০. দেখুন সহিহ মুসলিম'র ওপর আল-আব্বী এবং আল-সানূসীর শারহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৩-৭৩।

১১. ইবন হাম্বল, আল-বুখারি এবং আবু দাউদ এটা ইমরান ইবন হুসায়ন হতে বর্ণনা করেছেন। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল-সাহির গ্রন্থে, নম্বর ৮০৫৫।

১২. সম্মত, জাবির হতে। প্রাগুক্ত, নম্বর ৭০৫৮।

১৩. আল-তিরমিজি এবং আল-হাকিম 'আবদ আল্লাহ ইবন আবী আল-জার্দা হতে। প্রাগুক্ত নম্বর ৮০৬৯।

১৪. আল-তিরমিজি এবং আল-দারদা হতে। প্রাগুক্ত নম্বর ৮০৯৩।

১৫. আল-বুখারি আবু হুরায়রাহ হতে। প্রাগুক্ত নম্বর ৯৬৭।

১৬. সর্বসম্মত, আবু হুরায়রাহ হতে : আল-লু' লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ১২১।

১৭. সম্মত, আনাস হতে। প্রাগুক্ত নম্বর ১২২।

১৮. সম্মত, আবু সাঈদ হতে। প্রাগুক্ত নম্বর ১১৫।

১৯. মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-তিরমিজি ও ইবন মাজাহ, আবু হুরায়রাহ হতে : সহিহ আল-জামি আল-সাগির, নম্বর ৫১৭৬।

২০. আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করে এক রচনায় ইতিমধ্যেই এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছি এবং নির্ভরযোগ্যভাবে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমরা এটাকে অভিহিত করেছি, পরকালে সুপারিশ যুক্তি ও ঐতিহ্যের মধ্যে (কায়রো : দার নাহদা)। এতে আমরা পরামর্শ দিয়েছি কিয়ামতের দিন সুপারিশের কাজটিকে 'অসাধারণ নমনীয়তা প্রদর্শন সংক্রান্ত কমিটি সমূহের' কাজের সাথে তুলনা করা যায় সাধারণ পরীক্ষাক্ষেত্রে। এভাবে, একজন ছাত্রের সাফল্য সম্পর্কে কোনো সঠিক প্রত্যাশা থাকবে না যদি আমরা তার ওপর কঠিন ন্যায়ের পরিমাপ আরোপ করি; কিন্তু যদি আমরা তাকে নমনীয়তার যুক্তিবিদ্যা দ্বারা দেখি, যা বিভিন্ন গুরুত্বহ্রাসকারী পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনে এবং যদি সে পারে ওই সবের আলোকে নিজেকে সাফল্যের মাপকাঠির কাছে আনয়ন করতে, তাহলে তার আশা করার অধিকার আছে যে, কৃতকার্য হবে।

২১. আল-মুনাফিক (ফা এবং কাসরাহ এর দ্বৈততাসহ) : আল-মুরাববিজ, যেমন ঐব্যক্তি যে তার পণ্য বাজারজাতকরণ দ্রুত করার জন্য তাড়াহুড়ো করে।

২২. মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থে কিতাব আল-ইমান পর্বে এটি বর্ণনা করেছেন।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. আল-বুখারি এটি কিতাব আল-লিবাস অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, অনুচ্ছেদ : 'মা আসফালা মিন আল-কাইবাইন ফা-হুয়া ফি আল-নার', নম্বর ৫৭৮৭।

২৫. আল-নাসায়ি এটা কিতাব আল-জিনাত এ বর্ণনা করেছেন, অনুচ্ছেদ; 'মা তাহত আল-কাইবাইন মিন আল-ইজার', খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২০৭।

২৬. ফাতহ আল-বারি (দার আল-ফিকর; আল-সালাফিইয়্যাহ'র এক কপি), খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৫৭

২৭. প্রাগুক্ত।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪, নম্বর ৫৭৮৪।

২৯. প্রাগুক্ত, নম্বর ৫৭৮৫।

৩০. প্রাগুক্ত, নম্বর ৫৭৮৮ এবং আল-বাতার। আত্ম-অতিরঞ্জন এবং ঔদ্ধত্য।

৩১. প্রাগুক্ত, নম্বর ৫৭৮৯। সে নাড়াতে ও ডুবতে থাকবে-এর অর্থ-সে মাটিতে দেবে যাবে একটা জোর ধাক্কায় এবং সে এক ফাটল হতে অন্য ফাটলে পতিত হতে থাকবে।

৩২. প্রাগুক্ত, নম্বর ৫৭৯০।

৩৩. সহিহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ : তাহরিম জার আল-সাওবি খুইয়ালা, আল-নববি'র শারহ সহ (আল-শুআব) খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৯০।

৩৪. প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৫।

৩৫. ফাতহ আল-বারি, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৬৩।

৩৬. দেখুন আমাদের গ্রন্থ আল-হালাল ওয়া আল-হারাম, পোশাক ও অলংকার অংশ।

৩৭. আল-বুখারি ইসনাদ ছাড়াই এটা উল্লেখ করেছেন (এমন ইঙ্গিত দিয়ে যে, এর জন্য তার একটি ইসনাদ ছিল, যা অন্যত্র উপস্থাপন করা হয়েছে)। কিন্তু ইবন হাজার বলেন যে এটার জন্য কোথাও কোনো ইসনাদ নেই। আল-তাইলিসি এবং আল-হারিস ইবন আবি উসামাহ তাদের মুসনাদসমূহের ইসনাদ উপস্থাপন করেছেন। আমর ইবন শুআইব কর্তৃক তার পিতা এবং তার পিতা তার পিতামহ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আল-তায়লিসির বর্ণনায় অপব্যয় বাদে ইত্যাদি শব্দগুলো দেখা যায় না; আল-হারিস'র বর্ণনাতেও এই বাক্যাংশ এবং দান হিসেবে দাও-এর অভাব রয়েছে। ইবন আবী আল-দুনইয়া তার আল-শুকর গ্রন্থে এই ইসনাদ পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। ফাতহ আল-বারি, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৫৩।

৩৮. ইবন হাজার বলেন : ইবন আবী শায়বাহ তার মুসান্নাফ গ্রন্থে একটি ইসনাদ প্রদান করেছেন। প্রাগুক্ত।

৩৯. প্রাগুক্ত, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২৬২।

৪০. আল-বুখারি কিতাব আল-মুযারাতে এটা বর্ণনা করেছেন।

৪১. সর্বসম্মত, আনাস এর হাদিস আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান হতে, নম্বর ১০০১।

৪২. মুসলিম কিতাব আল-মুসাকাত ফাজল আল-জিরাই ওয়া আল-গারিস।

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. আনাস শিরোনামে ইবন হাম্বল মুসনাদে বর্ণনা করেছেন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮৩-৮৪, ১৯১; আল-বুখারি আল-আদাব আল-মুফিরাদ এ এবং আল-আলবানি (আল-সহিহাহ, নম্বর ৯) তিনি এটিকে সহিহ বলেছেন মুসলিমের মানদণ্ডের ভিত্তিতে (এমনকি যদিও মুসলিম এটি তার সহিহতে অন্তর্ভুক্ত করেননি)। আল-মাজমুতে আল-হায়সামি এটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৩) : আল-বাজ্জার বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনাকারীগণ সুভিত্তিশীল ও বিশ্বাসযোগ্য।

৪৫. আল-সুয়ূতী, আল-জামি' আল-কবীর : দেখুন আল-আলবানি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১২।

৪৬. আল-হায়সামি এটা আল-মাজমা'য় উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন (খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮); আহমদ ইবন হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন আল-তাবারানি আল-কবির গ্রন্থে এবং এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বাসযোগ্য। তাদের মধ্যে [বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু সে আলোচনা বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করে না।

৪৭. দেখুন ফাতহ আল-বারি (আল-হালাবি), খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০২।

৪৮. নমুনা দ্বারা-এটা নিম্নোক্তভাবে একটি বাণিজ্যিক বিনিময় : একজন আরেকজনের কাছে বাকিতে একটি জিনিস বিক্রি করল। সে এটা ক্রেতার কাছে সমর্পণ করল, তারপর পুনরায় তার কাছ থেকে কিনে নিল, প্রথম বিক্রি মূল্যের রসিদ নেওয়ার পূর্বেই, সে দাম দিল নগদে। বাস্তবে, এটা এমন বিক্রয় যা কাঙ্ক্ষিত নয়। উদ্দেশ্য কেবল নগদ হস্তান্তর এবং এটা সুদ খাওয়ার একটি ছলনা মাত্র।

৪৯. আল-আলবানি এটাকে সহিহ বলেছেন এবং এর সব সূত্রই নির্ভরযোগ্য। এর ওপর আলোচনা দেখুন, আমাদের বই বাই আল-মুরাবাহা লি আল-আমির বি আল-শিরাতে।

৫০. যেসব হাদিসের কোনো সূত্র ও সনদ নেই এবং জাল ও মিথ্যা হাদিস, সেগুলো ধরে রাখা মানসম্মত নয়। ওগুলো মিথ্যাময়তা ও বাতিলত্ব প্রকাশ করায় ওগুলোর সাথে কিতাবের ও সুন্নাতের বিরোধ। এ ব্যাপারে ধর্মের সম্মত উপাদান কিংবা আইনের উদ্দেশ্যের বৈরী হওয়ার বিষয় তুলে ধরতে হবে।

৫১. আবু দাউদ, নম্বর ৪১১২ এবং আল-তিরমিজি, নম্বর ১৭৭৯।

৫২. হাদিসটি সর্বসম্মত। দুই শায়খ এটা বর্ণনা করেছেন এবং অন্যরা শব্দের পার্থক্য সহকারে; তবে সাধারণ অর্থ একটিই। দেখুন আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ৫১৩ এবং আল-বুখারির শরাহ আল-ফাতাহ আল-বারি, হাদিস নম্বর ৯৫০।

৫৩. আল-ফাতহ আল-বারি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

৫৪. আল-কুরতুবি, তাফসির দার আল-কুতুব আল-মিসরিইয়াহ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২২৮।

৫৫. আল-তিরমিজি আল-জানায়িজ অধ্যায়ে, নম্বর ১০৫৬ এবং ইবন মাজাহ নম্বর ১৫৭৬; আহমদ ইবন হাম্বল ২ খণ্ড, ৩৩৭ পৃষ্ঠা এবং তিনি এটা নির্দেশ করেছেন, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৭৮।

৫৬. হাদিস নম্বর ৭৬১ এবং ৭৭৪ এর উৎস বিচার আল-আলবানির 'ইরওয়া আল-গালীল' -এর মধ্যে।

৫৭. আনাস হতে ইবন হাম্বল ও আল-হাকিম এটা বর্ণনা করেছেন। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল-সাহিরে, নম্বর ৪৫৮৪।

৫৮. মুসলিম নম্বর ৯৭৬, ৯৭৭।

৫৯. মুসলিম আল-জানায়িয-এ এটা বর্ণনা করেছেন, নম্বর ৭৯৪ এবং আল-নাসারি খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৩ এবং ইবন হাম্বল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২২১।

৬০. সর্বসম্মত। উদ্ধৃত হয়েছে আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান এ, নম্বর ৫৩৩।

৬১. তিনি এটার উল্লেখ করেছেন নায়ল আল-আওতারে, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬৬।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. আল-দারাকুতনি (আল-তাহযিব আল-তাহযিব, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৮০৫-০৬) বলেন : [তার নাম] বানান করা হয়েছে একটি জিম দ্বারা এবং দাল-এ নোক্তা নেই। যে-ই তার নাম যাল দ্বারা উল্লেখ করুক না কেন, সে ভুল উচ্চারণ করেছে [এটার]। আল-হাফিয ইবনে হাজার বলেন : ওটা তেমন যা আল-'আসকারি [এটা] বলেছেন এবং এটা জালসহ বর্ণনা করেছেন একদল রাবি হতে। আল-তাবারী বলেন : জুমাদাহ বিনত জানদাল। হাদিস বিশেষজ্ঞগণ বলেন : বিনত ওয়াহব। অগ্রাধিকারমূলক অভিমত হচ্ছে তিনি জান্দাল আল-আসদিইয়্যাহ'র কন্যা। তিনি প্রথমদিকে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন, তারপর তিনি বাইআত গ্রহণ করেন এবং তার গোত্রসহ মদিনায় হিজরত করেন।

৬৪. আল-মুনতাকা বৈরুত : দার আল-মারিফাহ), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬১-৬৪।

৬৫. নায়ল আল-আওতার (দার আল-জীল), খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৪৬।

৬৬. আল-সুনান আল-কুবরা, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৮২-৩৩২।

৬৭. আল-বায়হাকি, মারিফাত আল-সুনান ওয়া আল-আসার (সম্পাদনা-আল-সাইয়্যিদ আহ্‌মাদ সাকার; কায়রো : আল-মাজলিস আল-আলা লি-ল-শুউন আল-ইসলামিইয়্যাহ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০১-০৩।

৬৮. দেখুন, আল-শাতিবি আল-মুওয়াফাখাত গ্রন্থে যা বলেছেন।

৬৯. মুসলিম সহিহ্ গ্রন্থে কিতাব আল-মানাকিব এ ২৩৬৩ নম্বর হাদিসে এটা বর্ণনা করেছেন আয়িশা ও আনাসের হাদিস হতে।

৭০. সুন্নাহ্‌র আইন প্রণয়নগত দিক অংশে আমাদের গ্রহ আল-সুন্নাহ্ মাসদারান লি আল-মা'রিফাহ ওয়া আল-হাজরাহ এর মধ্যে এই অনুসন্ধান সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পাঠক বিশ্লেষণ করতে পারেন (কায়রো : দায়-আল-শুরাক)।

৭১. আবু দাউদ আল-জিহাদ মধ্যে ১৬৪৫ নম্বর হাদিসে এটা বর্ণনা করেছেন ও আল-তিরমিজি আল-সিয়ার মধ্যে, নম্বর ১৬০৪।

৭২. রক্তপণ অর্ধেক করার কারণ সম্বন্ধে আল-খাত্তাবী বলেন : "যেহেতু তারা অবিশ্বাসীদের মধ্যে বসবাস করে নিজেদের উপর যন্ত্রণা গ্রহণ করেছিল এবং তারা ছিল ঐ ব্যক্তিদের মতো যারা নিজের অপরাধে ধ্বংস হয়েছিল বা অন্যদের অপরাধে, সেহেতু তাদের অপরাধের অংশ রক্তপণ হতে কাটা হয়।

৭৩. যেহেতু হিজরত বাধ্যতামূলক ছিল ইসলামের সূচনালগ্নে তাদের জন্য যারা ইমান এনেছিলেন, যাতে তারা মদিনায় রসুল সা. ও তাঁর সাহাবিদের সাথে যোগ দিতে পারেন, যাতে তারা তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন এবং তারা ইসলামি সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেন। তারপর যখন মক্কা বিজিত হলো তখন মদিনায় হিজরত উঠিয়ে নেওয়া হলো। আল্লাহর রসুল সা. বলেন : বিজয়ের পর হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত (নিয়্যাহ) থাকবে। সর্বসম্মত হাদিস।

৭৪. সর্বসম্মত। দেখুন, আল-লু'ল' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ৮৫০ এবং এর পূর্ববর্তী তিনটি হাদিস।

৭৫. আল-বুখারি ঐটা বর্ণনা করেছেন (কিতাব আল-মানাকিব) এ অনুচ্ছেদ : আলামাত আল-নুবুওয়্যাহ ফি আল-ইসলাম।

৭৬. দেখুন, ফাতহ আল-বারি (কায়রো : আল-হালাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭।

৭৭. ইবন হাম্বল কর্তৃক আনাস হতে বর্ণিত হাদিস হতে। এর রাবিগণ বিশ্বাসযোগ্য, যেমনটা আল-হায়সামি বলেছেন মাজমা আল-যাওয়া'য়িদ-এর মধ্যে, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২। আল-তারগিব ওয়া আল-তারহিব গ্রন্থে আল-মুনযিরী বলেন : এর ইসনাদ অপূর্ব। আমাদের বই আল-মুনতাকা হাদিস নম্বর ১২৯৯ দেখুন। ইবন হাম্বল এই ভাষায় অন্য হাদিসে এটা বর্ণনা করেছেন : "নেতৃবৃন্দ হবে কুরাইশদের মধ্য হতে। আল-হায়সামি (খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৯৩) বলেন : এর রাবিগণ সহিহ রাবি ইবন'আবদ আল-আযীয'র বিষয় ছাড়া এবং তিনি বিশ্বাসযোগ্য"। আল-মুরযিরী বলেন : এর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য। দেখুন আল-মুনতাকা, পৃষ্ঠা ১৩০০।

৭৮. দেখুন ইবন খালদুন, মুকাদ্দিমাহ (সম্পাদনা- 'আবদ আল-ওয়াহিদ ওয়াফী; লাজানাত আল-বাইয়ান আল-আরাবি, ২য় সংস্করণ), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৯৫-৯৬।

৭৯. বিজয়ীদের মধ্যে ভূমি ভাগ-বাটোয়ারা না করার বিষয়ে ওমর রা.-এর মনোভাব সম্পর্কে দেখুন আমাদের বই 'আল-সিয়াসা আল-শারি'ইয়্যাহ বাইনা নুসূস আল-শারিয়াহ ওয়া-মাকাসিদি-হা (মাকতাব ওয়াহবা)', পৃষ্ঠা ১৮৮-২০১।

৮০. ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী (কায়রো : মাতবা'আহ নাশর আল-তাকাফাহ আল-ইসলামিইয়্যাহ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৮।

৮১. আল-শারাত্তানি, নায়ল আল-আওতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৩৮। এটা একটা সম্মত হাদিস।

৮২. আল-মুয়াত্তা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৯। উটদের উট থাকা : অর্থাৎ অনেকগুলো মালিকানায় নেওয়া যাবে।

৮৩. মুহম্মদ ইউসুফ মুসা, আল-তারিখ আল-ফিকহ আল-ইসলাম : ফিকহ আল-সাহাবাহ ওয়া আল-তাবি'ঈন, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৫।

৮৪. একই মুসলিম প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন নিসাব যার মধ্যে চূড়ান্ত বৈষম্য রয়েছে তা উল্লেখ করার কোনো অর্থ হয় না। এটা তাই যাকে আমরা ফিকহ আল-জাকাহ নামক আমাদের প্রবন্ধের আলোচনায় অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমরা টাকায় নিসাব একীভূত করে নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। যদি নিসাব একটা করা হয়, তাহলে কি এটা রৌপ্য বা স্বর্ণের নিসাব হবে? আমরা সোনার দামে টাকার নিসাবকে পছন্দ করি, রৌপ্য নয়।

৮৫. দেখুন ফিকহ আল-জাকাত, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ২৬০-৬১।

৮৬. ইবন তাইমিইয়াহ মাজমু'আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ২৫৫-৫৬।

৮৭. ইবন হাম্বল আল-তাবারানি ও আল-হাকিম এটা বর্ণনা করেছেন। আল-হাকিম সামুরাহ হতে এটাকে সহিহ বলেছেন। উদ্বৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল- সাগির -এ।

৮৮. ইবন হাম্বল ও আল-নাসায়ি আনাস হতে বর্ণনা করেছেন। প্রাগুক্ত উদ্ধৃত।

৮৯. উম্ম কায়স হতে আল-বুখারি এটা বর্ণনা করেছেন। প্রাগুক্ত।

৯০. ইবন 'ওমর হতে ইবন মাজাহ এটা বর্ণনা করেছেন; আল-তিরমিজি ও ইবন হিব্বান আবু হুরায়রাহ হতে এবং ইবন হাম্বল আয়িশা হতে। প্রাগুক্ত উদ্ধৃত।

৯১. সর্বসম্মত। আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজানে উদ্ধৃত, নম্বর ১৪৩০।

৯২. আল-তিরমিজি ইবনে আব্বাস হতে এটা বর্ণনা করে বলেছেন এটা হাসান, নম্বর ১৭৫৭।

৯৩. ইবন হাম্বল, শায়খাইন, আল-তিরমিজি এবং আল-নাসায়ি এটা উরওয়াহ আল-বারিকি হতে বর্ণনা করেছেন। ইবন হাম্বল, মুসলিম এবং আল-নাসায়িও এটা বর্ণনা করেছেন জাবির হতে। সহিহ আল-জামি, আল-সাগির, নম্বর ৩৩৫৩।

৯৪. দেখুন আমর ইবন আনসাবাহ হতে ইবন হাম্বল, আল-নাসায়ি ইবন মাজাহ, আল-তাবারানি ও আল-হাকিম'র বর্ণনা এবং অপর হাদিস আল-তিরমিজি, আল-নাসায়ি ও আল-হাকিম'র বর্ণনা এবং অপর হাদিস আল-তিরমিজি, আল-নাসায়ি ও আল হাকিম কর্তৃক আবু নাজাহ হতে বর্ণনা। প্রাগুক্ত, নম্বর ৬২৬৭, ৬২৬৮।

৯৫. ইবন হাম্বল এটা আবু বাকর হতে বর্ণনা করেছেন; আল-শাফিঈ ইবন হাম্বল, আল-নাসায়ি, আল-দারিমী, ইবন খুযায়মাহ, ইবন হিব্বান, আল-হাকিম এবং আল-বায়হাকি আয়িশাহ হতে; ইবন মাজাহ আবু উমামাহ হতে এবং আল-বুখারি আল-তারিখ মধ্যে এবং আল-তাবারানি আল-আওসাতে ইবন আব্বাস হতে। প্রাগুক্ত নম্বর ৩৬৯৫।

৯৬. দেখুন শায়খ 'আবদ আল্লাহ আল-বাস্সাম, নায়ল আল-মারিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০।

৯৭. সর্বসম্মত হাদিস, যেমন উদ্ধৃত হয়েছে আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান-এ, হাদিস নম্বর ১৩২০।

৯৮. মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন, নম্বর ২০৩২।

৯৯. প্রাগুক্ত, নম্বর ২০৩৩।

১০০. প্রাগুক্ত, নম্বর ২০৩৪।

১০১. কিতাব আল-বুয়ূ (নম্বর ৩৩৪০) তে আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন, আল-নাসায়ি (খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৮১) ও ইবন হিব্বান, আল-মাওয়ারিদ (নম্বর ১১০৫)-এ আল তাহাবী মুশকিল আল-আসার (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯)-এ এবং আল-বায়হাকি আল-সুনান (খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা-৩১)-এ ইবন উমার'র হাদিস হতে। ইবন হিব্বান এটাকে সহিহ বলেছেন; আল-দারাকুতনীও, আল-নবভী এবং আবু আল-ফাতহ আল-কুশায়িরীও। ইবন হাজার

আল-তালখিস (কায়রো), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৫ এ এটা উল্লেখ করেছেন। আল-আলবানি তার সহিহতে এটা এনেছেন, খণ্ড ১, হাদিস নম্বর ১৬৫।

১০২. মুসলিম এবং অন্যরা এটা বর্ণনা করেছেন।

১০৩. এক দেশ হতে অন্যদেশের দূরত্ব সর্বাধিক তিনদিনের : ১৪০৯ হিজরির রমজানের এই মাসের বৃহস্পতিবার (৬ এপ্রিল ১৯৮৯) সূচনা হয় সৌদি রাজতন্ত্রে, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, তিউনিসিয়া এবং অন্যান্য দেশে -এদের সকলেই সৌদি আরবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে এটা করে। মাসটা শুরু হয় মিসর, জর্দান, ইরাক, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং অন্যান্য দেশে শুক্রবার দিনে। পাকিস্তান, ভারত, ওমান, ইরান ও অন্যান্য দেশ সাওম শুরু করে শনিবারে।

১০৪. আল-বুখারি কিতাব আল-সাওম -এ এটা বর্ণনা করেছেন।

১০৫. আল-মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯।

১০৬. ফাতহ আল-বারি, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৮-০৯।

১০৭. আমরা জানি না [এখানে] আল-রাফিযি বলে আল-হাফিজ কাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন। যদি তিনি ইমামী শি'আকে বুঝিয়ে থাকেন, তবে আমরা তাদের মতবাদ হতে জানি যে, তাদের মতে গণনা গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। যদি তিনি অন্য [কোনো] লোকদের বুঝিয়ে থাকেন, আমরা জানি না তারা কারা। -শাকির। আমার মনে হয়, ঐ লোকেরা ইসমা'ঈলীরা, যেমন এমনটা, এসেছে যে বর্ণনায় তারা ঐ অবস্থান ধারণ করে। -আল-কারজাবি।

১০৮. ওজন বিষয়ে মতামত হচ্ছে যে, সূর্যাস্তের পর একটা সময় থাকে যখন চাঁদ দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব, যেখানে এটা খালিচোখে দেখাও সম্ভব এবং সেটা হচ্ছে প্রায় ১৫ হতে ২০ মিনিট, যেমনটা বিশেষজ্ঞগণ বলে থাকেন। - আল-কারাজাবি।

১০৯. সিন'সহ সুরাইজ একটা যমা ও জিম বহন করে এর শেষে। অনেক মুদ্রিত পুস্তকে এটা অশুদ্ধভাবে লেখা হয়েছে শুরাইহ শিন ও হা সহ এবং এটা ভুল বানান। এই আবু আল-আব্বাস ৩০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি ছিলেন আবু দাউদের শাগরিদ, যিনি সুনান'র গ্রন্থকার। আবু ইসহাক বলেছে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে (তাবাকাত আল-ফুকাহা, পৃষ্ঠা ৮৯)। তিনি শাফিঈদের এবং মুসলিম ইমামগণের মধ্যে মহত্তম ছিলেন। এমনকি 'আলী আল-মুজানিসহ সব শাফিঈ হতে তাকে পৃথক করা যায়, সর্বোত্তম জীবনীমূলক পরিচিতি আল-খাতিব'র তারিখ বাগদাদ (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮-৯০) পর্যন্ত তার সম্পর্কে বর্ণনা এবং ইবন আল-আল-সুবকির তাবাকাত আল-শাফিঈয়াহ (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭-৯৬) মধ্যে। কেউ কেউ তাকে তৃতীয় শতকের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলে অভিহিত করেছেন।

১১০. আল-কাযী আবু বকর ইবন আল-আরাবি'র শারহ আল-তিরমিজি'র ওপর (৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭-০৮); তারহ আল-তাছরিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১-১৩ এবং ফাতহ আল-বারি, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪।

১১১. প্রবন্ধ : আল-আওয়া'ইল আল-শুহ্র আল-'আরাবিইয়াহ (মাকতাবাহ ইবন তাইমিয়্যাহ) পৃষ্ঠা ৭-১৭। (আমি এখানে উল্লেখ করছি যে আধুনিক কালের যিনি এই মত পোষণ করতেন তিনি ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ্ 'মুস্তাফা আল-যারকা'। তিনি একাডেমি ফর ইসলামিক ফিকহ্-এ এটা প্রস্তাব ও সমর্থন করেন কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য অন্যান্য সদস্যদের যথেষ্ট সমর্থন সংগ্রহে ব্যর্থ হন)।

১১২. তিনি প্রসিদ্ধ শায়খ সালিহ্ ইবন মুহাম্মদ আল-লাহয়াদান, সাউদি রাজতন্ত্রের উচ্চ পরিষদের প্রধান। তার অভিমত রাজতন্ত্র কর্তৃক উকায নামক দৈনিক সংবাদপত্রে ২১ রমজান ১৪০৯ হিজরিতে প্রকাশিত হয়।

১১৩. কাদারা- দাম্মা বা কাসরা, ইয়াকদুরু বা ইউকদিরুসহ - কাদ্দারা-র অর্থসহ। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে এই আয়াত : ফা-কাদদারনা ফানিমা আল-কাদিরুন (মুরসালাত, ৭৭ : ২৩)।

১১৪. দেখুন আল সুবকি, ফাতাওয়া (কায়রো : মাকতাবাত আল-কুদস), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৯-২০।

১১৫. প্রবন্ধ, আল-আওআল আল-শুহুর আল-আরাবিইয়াহ্, পৃষ্ঠা ১৫।

১১৬. মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিস ফাযাইল আল-সাহাবাহ অধ্যায়ে, নম্বর ২৪৫৩। আল-বুখারির মতে একটা সন্দেহ দেখা দেয় যে, তাঁদের মধ্যে হাতের দিক থেকে সবচেয়ে লম্বা এবং তাঁর সা. দ্রুততম যোগদানকারীনি ছিলেন সাওদাহ। এটা একটা ভুল যা ইবন জাওযী কিছু উদঘাটন করেছেন। দেখুন আল-যাহাবি, সিয়ার আলাম আল-নুবুলা (বৈরুত : আল-রিসালা) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৩।

১১৭. দেখুন তাফসির ইবন কাসির, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১।

১১৮. সর্বসম্মত। দেখুন আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ১৭৪৬, ১৭২১।

১১৯. তা'বিল মুখতালাফ আল-হাদিস (বৈরুত : দার আল-জিল, পৃষ্ঠা ২২৪)।

১২০. দেখুন আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, যে ব্যাপারে দুই শাইখ একমত, মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদ আল-বাকী'র মতে, নম্বর ৩৫৯।

১২১. আল-বুখারি তার সহিহ্ গ্রন্থে কিতাব আল-আদাব এবং কিতাব আল-তাফসির অধ্যায়ে এবং মুসলিম আল-বিরর ওয়া আল-সিলাহ্ অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ১৬৫৫।

১২২. সহিহ আল-বুখারির হাদিস নম্বর ৬৫৪৮, আল-ফাতহ সহ। এটা রয়েছে আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, ১৮১২ নম্বরে।

১২৩. প্রাগুক্ত, ১৮১১।

১২৪. এসব বক্তব্যের ওপর দেখুন : ফাতহ আল-বারি (দার আল-ফিকর), ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১।

১২৫. দেখুন, আল-মুসনাদ (সম্পাদনা : শায়খ শাকির; দার আল-মাআরিফ), খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৪০-৪১।

১২৬. আল-মাজমু '(খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৬) তে আল-হায়সামি এটা উপস্থাপন করেছেন এবং বলেছেন : আল-তাবারানি এটা মাকিল আল-ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন এবং তার [বর্ণনাকারীগণ] নির্ভরযোগ্য।

১২৭. ফাতহ আল-বারি, ১৩শ খণ্ড।

১২৮. সর্বসম্মত, ইবন উমার এর হাদিস হতে আয়িশাহ রাফি ইবন খাদিজ এবং আসমা বিনত আবী বকর হতে। আল-বুখারি ইবন আব্বাস হতেও এটা বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সহিহ আল-জামি 'আল-সাগির, নম্বর ৩১৯১ এবং আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ১৪২৪, ১৪২৬।

১২৯. ইবন হাম্বল আনাস হতে এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-নাসায়ি ইবন আব্বাস হতে। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল-সাগীরে, নম্বর ৩১৭৪।

১৩০. ইবন হাম্বল, আল-তিরমিজি এবং ইবন মাজাহ এটা বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রাহ হতে; ইবন হাম্বল, আল-নাসায়ি এবং ইবন মাজাহ আবু সাইদ এবং জাবির হতে। সহিহ আল-জামি আল-সাগির, নম্বর ৪১২৬।

১৩১. সর্বসম্মত। 'আবদ আল্লাহ ইবন আবী আল-আওফার হাদিস হতে। আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ১১৩৭।

১৩২. ইবন হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন এবং আল-নাসারি জাহিমাহ হতে। সহিহ আল-জামি আল-সাগির, নম্বর ১২৪৯।

১৩৩. মুসলিম এটা আবু হুরায়রাহ হতে বর্ণনা করেছেন, মুখতাছার মুসলিম, ১৮৬৮।

১৩৪. সর্বসম্মত 'আবদ আল্লাহ ইবন জায়দ আল-মাযিনী এবং আবু হুরায়রাহ হতে। দেখুন সহিহ আল-জামি আল-সাগির, নম্বর ৫৫৮৬, ৫৫৮৭।

১৩৫. ইবন হাযম, আল-মাহাল্লা, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৩০-৩১, মাসাইল ৯১৯।

১৩৬. আবু দাউদ তার সুনানে কিতাব আল-আদাবে কাত 'আল সিদর' অনুচ্ছেদে ৫২৩৯ নম্বর হাদিসে এটা বর্ণনা করেছেন। আল-বায়হাকিও তার সুনানে বর্ণনা করেছেন এবং এটা উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল-সাগির গ্রন্থে।

১৩৭. সর্বসম্মত, আনাসের হাদিস। উদ্ধৃত হয়েছে আল-লু' লু' ওয়া আল-মারজান এ, নম্বর ৬৬৫।

১৩৮. ইবন হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন, আবু নুআইম আল-হিলয়ার মধ্যে এবং আল-বায়হাকি আল-সুনানে, আবু হুরায়রাহ হতে। উদ্ধৃত হয়েছে সহিহ আল-জামি আল সাগির গ্রন্থে।

১৩৯. ইবন হাম্বল এটা বর্ণনা করেছেন এবং এর ইসনাদ সবল। এটা আল-মুনযিরীতে উদ্ধৃত হয়েছে, আল-তারগিব।

১৪০. ওর ওপর দেখুন : আনোয়ার আল-কাশ্মিরীর গ্রন্থ আল-তাসরিব বি-মা তাওয়াতুর ফি নুজুল আল-মাসীহ (সম্পাদনা 'আবদ আল-ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ)। অধিকন্তু, তিনি এটা সংগ্রহ করেছেন চল্লিশ সহিহ ও হাসান হাদিসের মধ্যে, ওর বাইরে অন্যদের উল্লেখ না করে।

১৪১. সর্বসম্মত, আবু হুরায়রাহর হাদিস হতে, আনুমানিক শব্দাবলীসহ। দেখুন সহিহ আল-জামি আল-সাগির, নম্বর ৭০৭৭ এবং আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, নম্বর ৯৫।

১৪২. বিভিন্ন ধরনের ওজন ও মাপের উদ্ভাবন আমাদের সময়ে সম্ভব হয়েছে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ পরিমাপ করা অথবা একজন ব্যক্তির দেহের তাপ এবং পরিমাপ করা অতি সূক্ষ্ম জিনিস, এতদূর পর্যন্ত যাতে নির্দিষ্ট ধরনের কম্পিউটার মিলিয়নের এক অংশ এক সেকেন্ডে গণনা করতে পারে। তারপর দাঁড়িপাল্লা (আমাদের পরকালে যার সম্মুখীন হতেই হবে) ঐ রকম নয় যার দুটো পাল্লা রয়েছে- যেমনটা এর হওয়া সম্বন্ধে মুতাযিলাগণ কল্পনা করে ছিল।

১৪৩. আমাদের বই ফাতাওয়া মু'আসিরাহ, ১ম খণ্ডে এই হাদিসের ওপর আমাদের মন্তব্য দেখুন।

১৪৪. আমাদের নবি সা. যেমন নির্দেশ দিয়েছেন তাই পরামর্শ দেওয়া হয় বর্তমান সময়ের ঔষধে। পাকস্থলীকে খালি রাখা এর মধ্যে যা আছে তা থেকে (এবং অতঃপর বিশ্রাম এবং যেমন আগের দিনের অভ্যাস ছিল) এর ভেতর পাকস্থলীতে বাঁধা রেখে রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

১৪৫. আবু দাউদ এটা বর্ণনা করেছেন, নম্বর ৪৬০৫, এর আল-তিরমিজি নম্বর ২৬৬৫। ইবন রাফি'র হাদিস হতে। ইবন হাম্বল এটা আল-মুসনাদ, খণ্ড ৬, ৮ম পৃষ্ঠায় সংক্ষেপিত বর্ণনা করেছেন।

১৪৬. আল-ইতিসাম (শারিকাত আল-আলানাত আল-শারকিইয়াহ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩১-৩২।

১৪৭. দেখুন আল-লু'লু' ওয়া আল-মারজান, হাদিস নম্বর ১৭৯৯, ১৮০০, ১৮০১।

১৪৮. শাইখ মুহাম্মদ আবদুহ, রিসালা আল-তাওহিদ, পৃষ্ঠা ১৮৭-৮৮।

১৪৯. প্রাগুক্ত।

১৫০. ইহিয়া 'উলুম আল-দীন (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

গ্রন্থ পরিচিতি

সুন্নাহ্‌র সান্নিধ্যে শীর্ষক এ গ্রন্থে লেখক একজন শিক্ষক হিসেবে সুন্নাহ্ উপস্থাপন, এর ঐক্যবদ্ধ ও সংহতিপূর্ণ প্রকৃতি, এর ভারসাম্য ও আধুনিকতার প্রতি গুরুত্ব প্রদানে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাদিসের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাকে নিয়ে সৃষ্ট মতপার্থক্য তিনি আলোচনা করেছেন, সন্দেহযুক্ত ও প্রায়শ ভুল তথ্যসম্পন্ন যুক্তি সমূহ যা এসবের মধ্যে অন্তর্নিহিত (দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাপক বিস্তৃত) রয়েছে। তিনি দুর্বল (যয়িফ) হাদিসসমূহের সমস্যা পরীক্ষা করেছেন, আইনগত বাধ্যবাধকতার সাথে এগুলো স্পষ্ট করেছেন এবং নৈতিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এসবের প্রাসঙ্গিকতা ও কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ্‌র ব্যবহারকে সহজ করার যুক্তি দেখিয়েছেন।

লেখক পরিচিতি

বিখ্যাত মিশরীয় পণ্ডিত, ইসলামি চিন্তাবিদ ও কুশলী প্রফেসর ড. ইউসুফ আল-কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তিনি আল আজহারেই লেখাপড়া করেন। ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উসূল আল দ্বীন অনুষদ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. কারযাভী আল আজহার ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশুনার সময়ই তার প্রতিভার স্বাক্ষর হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে আল্লামা বা মহান পণ্ডিত খেতাবে ভূষিত হন।

বর্তমানে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমী, মক্কাভিত্তিক রাবেতা আল আলম আল ইসলামির ফিকাহ একাডেমী, রয়াল একাডেমী ফর ইসলামিক কালচার এন্ড রিসার্চ জর্ডান, ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার অক্সফোর্ড-এর সদস্য, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্স-এর প্রেসিডেন্ট এবং কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন। তিনি বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এর ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য।

তাঁর এ পর্যন্ত ৪২ টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, তুর্কি, ফার্সি, উর্দু, ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অনেক ভাষায় তার বই অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে- ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, ইসলামের জাকাত বিধান, ইসলামি শরিয়াতের বাস্তবায়ন, ইসলামি পুনর্জাগরণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ্ বইগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. কারযাভী পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, আরব ও মুসলিম দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশেও বেশ কয়েকবার এসেছেন।

ISBN : 978-984-8471-35-7